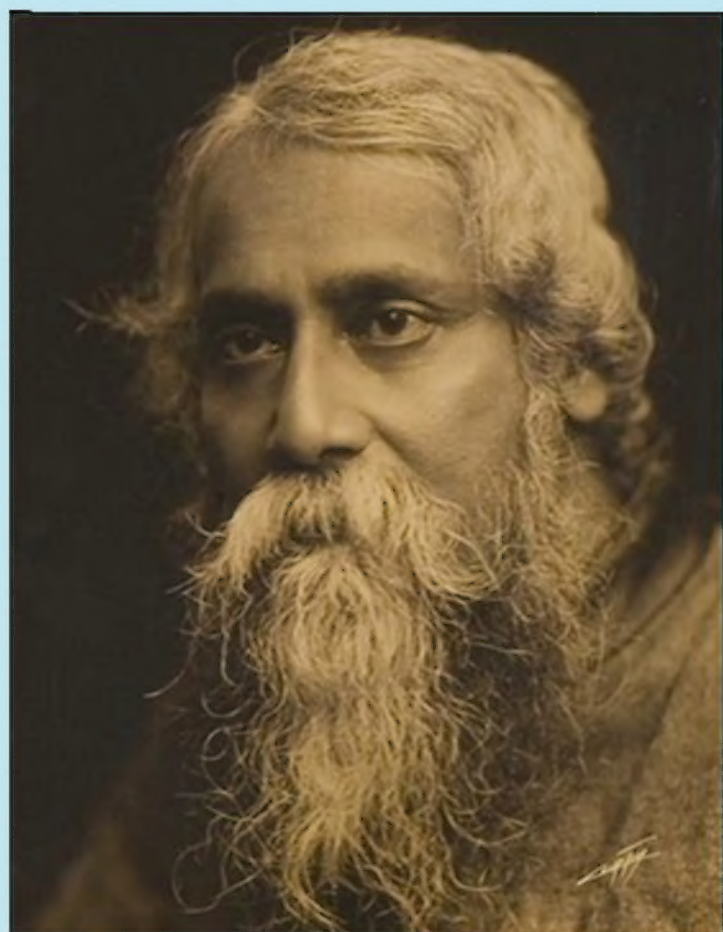


রবীন্দ্র রচনাবলী

দশম খণ্ড

শ্রী ব্রজেন চন্দ্র



রবীন্দ্র-রচনাবলী

দশম খণ্ড

ঐয্যস্যস্ব



50,378

বিশ্বভারতী

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬১৩ হারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৪৮

মূল্য ৪১০, ৫৫০, ৬৫০ ও ৮১০

মুদ্রাকর—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাণসী প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী	১৭০
কবিতা ও গান	
উৎসর্গ	৩
খেয়া	৯৩
নাটক ও প্রহসন	
রাজা	১৯১
উপন্যাস ও গল্প	
শেষের কবিতা	২৬৯
প্রবন্ধ	
রাজা ও প্রজা	৩৭৭
সমূহ .	৪৮৫
পরিশিষ্ট	৫৩৩
গ্রন্থ-পরিচয়	৬৪৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী	৬৬৭

চিত্রসূচী

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ

৭

‘খেয়া’র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

১২৪

কবিতা ও গান

উৎসর্গ

রেভারেন্ড সি. এফ. এণ্ডরুজ
প্রিয়বন্ধুবরেন্দ্র

শাস্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ
১৩২১



উৎসর্গ

১

ভোরের পাখি ডাকে কোথায়

ভোরের পাখি ডাকে ।

ভোর না হতে ভোরের পবন

কেমন করে রাগে :

এখনো যে আঁধার নিশি

জড়িয়ে আছে সকল দিশি

কালিবরন পুচ্ছ-ডোরের

হাজার লক্ষ পাকে ।

ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে

পাখি কোথায় ডাকে :

ওগো তুমি ভোরের পাখি,

ভোরের ছোটো পাখি ।

কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে

মেল তোমার আঁখি ।

কোমল তোমার পাখার 'পরে

সোনার রেখা স্তরে স্তরে,

বাঁধা আছে ডানায় তোমার

উষার রাঙা রাখি

ওগো তুমি ভোরের পাখি ।

ভোরের ছোটো পাখি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রয়েছে বট, শতেক জটা
 ঝুলছে মাটি বোপে,
 পাতার উপর পাতার ঘটা
 উঠছে ফুলে ফোপে।
 তাহারি কোন্ কোণের শাপে
 নিদ্রাহারা ঝাঁঝির ডাকে
 ঝাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
 পাশাতে মুখ ঝোঁপে,
 যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
 জটায় মাটি বোপে।

ওগো ভোরের সরল পাপি
 কহ আমায় কহ—
 ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
 ঘুমিয়ে যখন রহ,
 হঠাৎ তোমার কুলায় পরে
 কেমন ক'রে প্রবেশ করে
 আকাশ হতে আশ্রয় পথে
 আলোর বার্তাবহ ?
 ওগো ভোরের সরল পাপি
 কহ আমায় কহ !

কোমল তোমার বুকের তলে
 রক্ত নেচে উঠে
 উড়বে ব'লে পুলক জাগে
 তোমার পক্ষপুটে।
 চক্ষু মেলি পূবের পানে
 নিদ্রা-ভাঙা নবীন গানে

অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
 উৎস-সমান ছুটে ।
 কোমল তোমার বুকের ভেতরে
 রক্ত নেচে উঠে ।

এত আধারমাঝে তোমার
 এতই অসংশয় ।
 বিশ্বজনে কেহই তোরে
 করে না প্রত্যয় ।
 তুমি ডাক, “দাড়াও পথে,
 সূর্য আসেন স্বর্গরথে,
 রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
 রাত্রি নয় নয় ।”
 এত আধারমাঝে তোমার
 এতই অসংশয় !

আনন্দেতে জাগো আজি
 আনন্দেতে জাগো ।
 ভোরের পাখি ডাকে যে ঐ
 তব্বা এখন না গো ।
 প্রথম আলো পড়ুক মাথায়,
 নিদ্রা-ভাঙা আখির পাতায়,
 জ্যোতির্ময়ী উদয়-দেবীর
 আশীর্বচন মাগো ।
 ভোরের পাখি গাহিছে ঐ,
 আনন্দেতে জাগো ।

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হই তিমির রাতে
তরগীখানি বাহিয়া ।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া ।

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে ।
হৃদয় মোর নিমেষমাত্রে
উঠেছে ভরি গরবে ।
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল,
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে ।

কথাটি আমি শুধাব নাকে।
তোমাতে ।

দাঁড়াব নাকে। ক্ষণেক তরে
স্থিতির ভরে দুয়ারে ।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরগী যদি না লাগে কুলে,
শুধাব নাকে। তোমাতে ।



মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
 বাকি সব ধন স্বপনে,
 নিভৃত স্বপনে ।
 ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
 ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
 কোথা গো স্বপনবিহারী ।
 তুমি এস এস গভীর গোপনে,
 এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
 বসনে প্রদীপ নিবায়ি,
 এস গো গোপনে ।
 মোর কিছু ধন আছে সংসারে
 বাকি সব আছে স্বপনে
 নিভৃত স্বপনে ।

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি
 পথ ভরিয়াছে আলোকে,
 প্রথর আলোকে ।
 সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
 তোমাতে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
 হে মোর স্বপনবিহারী ।
 তোমাতে চিনিব প্রাণের পুলকে,
 চিনিব সজ্জল আঁখির পলকে,
 চিনিব বিরলে নেহারি
 পরম পুলকে ।
 এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
 এসো না পথের আলোকে
 প্রথর আলোকে ।

৪

তোমাতে পাছে সহজে বুঝি
 তাই কি এত লীলার ছল,
 বাহিরে যবে হাসির ছটা
 ভিতরে থাকে আঁশির জল।
 বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
 ছলনা,
 যে-কথা তুমি বলিতে চাও
 সে-কথা তুমি বল না।

তোমাতে পাছে সহজে ধরি
 কিছুরি তব কিনারা নাই,
 দশের দলে টানি গো পাছে
 বিরূপ তুমি, বিমুগ্ধ তাই।
 বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
 ছলনা,
 যে-পথে তুমি চলিতে চাও
 সে-পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ
 তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও ?
 হেলার ভরে খেলার মতো
 ভিক্ষাবুলি ভাসায়ে দাও ?
 বুকেছি আমি বুকেছি তব
 ছলনা,
 সবার যাহে তৃপ্তি হল
 তোমার তাহে হল না !

৫

আপনারে তুমি করিবে গোপন
 কী করি ?
 হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
 থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি' ।
 আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,
 মানিকের হার পরি এলোকেশে,
 নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
 এসেছ হৃদয়-পুলিনে ।
 ভুলি নে তোমার বাক্য কটাক্ষে,
 ভুলি নে চতুর নিষ্ঠুর বাক্যে
 ভুলি নে ।
 কর-পল্লবে দিলে যে আঘাত
 করিব কি তাহে আশঙ্কনপাত ?
 এমন অবোধ নহি গো ।
 হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
 সহি গো ।

আজ এই বেশে এসেছ আমায়
 ভূলাতে ।
 কত কি আস নি দীপ্ত ললাটে
 স্নিগ্ধ পরশ বূলাতে ?
 দেখেছি তোমার মুখ কথাহারী
 জলে ছলছল স্নান আঁখিতারা,
 দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা
 করুণ পেলব মুরতি ।
 দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
 পলক-বিহীন নয়নে মধুর
 মিনতি ।

আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
 তরাস আমি যে পাব মনে মনে
 এমন অবোধ নহি গো ।
 হাসে তুমি, আমি হাসিমুখে সব
 সহি গো ।

৬

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
 লোকের মাঝে ;
 মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
 অনেক অনেক সাজে ।
 কত জন এসে মোরে ভেঁকে কয়—
 “কে গো সে”—শুধায় তব পরিচয়,
 “কে গো সে ?”
 তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
 আমি শুধু বলি, “কী জানি কী জানি ।”
 তুমি শুনে হাস, তারা হুসে মোরে
 দাঁড়োয়ে ।

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
 অনেক গানে ।
 গোপন ব্যর্থতা লুকায়ে রাপিতে
 পারি নি আপন প্রাণে ।
 কত জন মোরে ডাকিয়া করেছে,
 “যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
 কিছু কি ?”
 তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
 আমি শুধু বলি, “অর্থ কী জানি ।”
 তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
 মৃচুকি ।

তোমায় জানি না চিনি না এ-কথা বলো তো
 কেমনে বলি ?
 খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাপ,
 খনে খনে ঘাও ছলি ।
 জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
 দেখেছি তোমার ঘোমটা পসিতে,
 ঝাঁপির পলকে পেয়েছি তোমায়
 লপিতে ।
 বক্ষ সহসা উঠিয়াছে ছলি,
 অকারণে ঝাঁপি উঠেছে আকুলি,
 বুঝেছি হৃদয়ে কেলেছ চরণ
 চকিতে ।

তোমায় খনে খনে আমি বাধিতে চেয়েছি
 কথার ভোরে ।
 চিরকাল তবে গানের সুরেতে
 রাখিতে চেয়েছি ধরে ।
 সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
 বাধিতে ভরেছি কোমল নিপাদ,
 তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
 দিলে কি ?
 কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো
 ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
 চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
 পুলকি ।

৭

পাগল হইয়া বনে বনে কিরি
 আপন গন্ধে মম
 কস্তুরীমৃগসম ।
 কাস্তুন-রাতে দক্ষিণ-বায়ে
 কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
 যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
 যাহা পাই তাহা চাই না ।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
 আপন বাসনা মম
 ফিরে মরীচিকাসম ।
 বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
 বক্ষে কিরিয়া পাই না ।
 যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
 যাহা পাই তাহা চাই না ।

নিজেই গানের বাঁধিয়া ধরিতে
 চাহে যেন বাঁধি মম,
 উত্তলা পাগলসম ।
 যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
 রাগিণী খুঁজিয়া পাই না ।
 যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
 যাহা পাই তাহা চাই না ।

৮

আমি চঞ্চল হে,
আমি স্নদূরের পিয়াসি।

দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি স্নদূরের পিয়াসি।

ওগো স্নদূর, বিপুল স্নদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে-কথা যে বাই পাসরি।

আমি উৎসুক হে,
হে স্নদূর, আমি প্রবাসী।

তুমি দুলভ দূর্য্যাক্ষার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সত্যত।
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জ্বেনেছে তাহার স্বভাবী।
হে স্নদূর, আমি প্রবাসী।

ওগো স্নদূর, বিপুল স্নদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে-কথা যে যাই পাসরি।

আমি উন্মনা হে,
হে স্নদূর, আমি উদাসী।

রৌত্র-মাখানো অলস বেলায়
শুষ্ক-মর্ম্মরে, ছায়ায় বেলায়

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি ।
হে সুদূর, আমি উদাসী ।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর । তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাশরি ।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে-কথা যে যাই পাসরি ।

৯

কুঁড়ির ভিতরে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—

কাদিছে আপন মনে,—

কুশুমের দলে বদ্ধ হয়ে

করুণ কাতর স্বনে

কহিছে সে—হায় হায়,

বেলা যায় বেলা যায় গো!

ফাগুনের বেলা যায় ।

ভয় নাই তোরে, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,

কিছু নাই তোরে ভাবনা ।

কুশুম ফুটিবে, বাধন টুটিবে,

পুরিবে সকল কামনা ।

নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই

ফাগুন তখনো যাবে না ।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে

ফিরিছে আপনমাঝে,

বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে

কী জানি কিসের কাজে ।

কহিছে সে—হায় হায়,
 কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
 না জানিয়া দিন যায় ।
 ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
 কিছু নাই তোর ভাবনা ।
 দখিন-পবন ধারে দিয়া কান
 জেনেছে যে তোর কামনা ।
 আপনারে তোর না করিয়া ভোর
 দিন তোর চলে যাবে না ।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
 ভাবিছে উদাসপারা,—
 জীবন আমার কাহার দোষে
 এমন অর্থহারা ।
 কহিছে সে—হায় হায় ।
 কেন আমি কাদি, কেন আছি গো
 অর্থ না বুঝা যায় ।
 ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
 কিছু নাই তোর ভাবনা ।
 যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
 মিলিবি, পুরাবি কামনা,
 আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি ।
 জনম ব্যর্থ যাবে না ।

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
 কোন্ বিরহিণী নারী ?
 আপন করিতে চাহিছ তাহারে,
 কিছুতেই নাহি পারি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রমণীরে কে বা জানে—

মন তার কোন্‌খানে ।

সেবা করিলাম দিবানিশি তার,

গাধি দিহু গলে কত ফুলহার,

মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে

চাহিল সে মোর পানে ।

কিছু দিন যায়, একদিন হায়

ফেলিল নয়নবারি—

“তোমাতে আমার কোনো স্পৃহ নাই”

কহে বিরহিণী নারী ।

রতনে অঁড়িত নূপুর তাহারে

পরায়ে দিলাম পায়ে,

রঞ্জনী জাগিয়া ব্যঞ্জন করিহু

চন্দন-ভিজ্জা বায়ে ।

রমণীরে কে বা জানে—

মন তার কোন্‌খানে ।

কনক-খচিত্ত পালঙ্ক পরে

বসাহু তাহারে বহু সমাদরে,

মনে হল হেন হাসিমুখে যেন

চাহিল সে মোর পানে ।

কিছু দিন যায়, লুটায়ে ধুলায়

ফেলিল নয়নবারি—

“এ-সবে আমার কোনো স্পৃহ নাই”

কহে বিরহিণী নারী ।

বাহিরে আনিহু তাহারে, করিতে

হৃদয়-দিগ্‌বিজয় ।

সারথি হইয়া রথবানি তার

চালাহু ধরণীময় ।

রমণীরে কে বা জানে—

মন তার কোন্‌খানে ।

দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,

দিকে দিকে তার উঠে চাটুগান,

মনে হল তবে দীপ্ত গরবে

চাহিল সে মোর পানে ।

কিছু দিন যায় মুখ সে ফিরায়

ফেলে সে নয়নবারি ।

“হৃদয় কুড়ায় কোনো স্তম্ভ নাই”

কহে বিরহিণী নারী ।

আমি কহিলাম, “কারে তুমি চাও

ওগো বিরহিণী নারী ।”

সে কহিল, “আমি যারে চাই, তার

নাম না কহিতে পারি ।”

রমণীরে কে বা জানে—

মন তার কোন্‌খানে ।

সে কহিল, “আমি যারে চাই তারে

পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,

পুলকে তখনি লব তারে চিনি,

চাহি তার মুখপানে ।”

দিন চলে যায়, সে কেবল হায়

ফেলে নয়নের বারি ।

“অজানারে কবে আপন করিব”

কহে বিরহিণী নারী ॥

১১

না জানি কারে দেখিয়াছি,
 দেখেছি কার মুখ ।
 প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি ।
 পেয়েছি তাই স্মৃতি আছে,
 পেয়েছি এই স্মৃতি
 কারেও আমি দেখাব নাকো সেটি ।
 লিখন আমি নাহিকো জানি
 বুঝি না কী যে রয়েছে বাণী,
 যা আছে থাক আমার থাক তাহা ।
 পেয়েছি এই স্মৃতি আজি
 পবনে উঠে বাশরি বাজি,
 পেয়েছি স্মৃতি পরান গাহে আহা ।

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
 শুনেছি নাকি তিনি
 পড়িয়া দেন লিখন নানামতো ।
 যাব না আমি তাঁর কাছে,
 তাঁহারে নাহি চিনি,
 থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যত ।
 শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
 বুঝেন কিনা বুঝিব কিসে ।
 ধন্দ লয়ে পড়িব মহাগোলে ।
 তাহার চেয়ে এ লিপিস্থানি
 মাথায় কল্প রাখিব আমি
 যতনে কল্প তুলিব ধরি কোলে ।

রজনী যবে আধারিয়া
 আসিবে চারিদ্বারে,
 গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা ;

ধরিব লিপি প্রসারিয়া
 বসিয়া গৃহদ্বারে
 পুলকে রব হয়ে পলকহারা ।
 তখন নদী চলিবে বাহি
 যা আছে লেখা তাহাই গাহি,
 লিপির গান গাবে বনের পাতা ।
 আকাশ হতে সপ্তর্ষি
 গাহিবে ভেদি গহন নিশি
 গভীর তানে গোপন এই গাথা ।

বৃষ্টি না বৃষ্টি ক্ষতি কিবা,
 রব অবোধসম ।
 পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি ।
 রয়েছে যাহা নিশিদিবা
 রহিবে তাহা মম,
 বৃকের ধন যাবে না বৃক ছাড়ি ।
 খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
 বৃক্ষিতে গিয়া ভুল যে বৃষ্টি,
 ঘুরিতে গিয়া কাছেই করি দূর ।
 না বোঝা মোর লিখনপানি
 প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,
 সকল গানে লাগায়ে দিল সুর ।

১২

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা ।
 ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা ।
 শিশির কহিল কাঁদিয়া,
 “তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
 হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল ।
 তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল ।”

“আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
 তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
 বাসিতে পারি যে ভালো।”
 শিশিরের বৃকে আসিয়া
 কহিল তপন হাসিয়া,
 “ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
 তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
 হাসির মতন করি।”

১৩

আজ মনে হয় সকলের মাঝে
 তোমারেই ভালোবেসেছি।
 জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
 শুধু তুমি আমি এসেছি।
 দেখি চারিদিক পানে,
 কী যে জেগে ওঠে প্রাণে।
 তোমার আমার অসীম মিলন
 যেন গেছে সকল পানে।
 কত যুগ এই আকাশে যাপিত
 সে-কথা অনেক ভুলেছি।
 তারায় তারায় যে-আলো কাপিছে
 সে-আলোকে দোহে দুঃখেছি।

ভূগ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
 আধিনে নব আলোকে
 চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
 প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
 মনে হয় যেন জানি
 এই অকণ্ঠিত নাগী,

যুক ঘেঁষিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবধানি ।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা জেগেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তুণে দোহে কেঁপেছি ।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
স্বপ্নের দুপের কাহিনী ;
পরিচি তসম বেজে ওঠে সেই
অষ্টীতের যত রাগিণী ।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি ।
কোন্ ভাঙার সঙ্কর তার
গোপনে রয়েছে নিতি ।
প্রাণে তাহা কত মূদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে খেলিয়া—
পিতামহের জীবনে আমরা
দু-জনে এসেছি খেলিয়া ;

লক্ষ বরষ আগে যে-প্রভাত
উঠছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাথ নি কি মোর জীবনে ?
সে-প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিলাম কেবা জানে ।
কী মুরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে ।

‘হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া ।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া ।

১৪

সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া ।
পরবাসী আমি যে-দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সম্মান লব বুঝিয়া ।
ঘরে ঘরে আছে পরমাস্বীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া ।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্ত
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কৈদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের গুণে লগনে ।
আপনার ষারা আছে চারিভিতে
পারি নি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশিদিদি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে ।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে ।

তুণে পুলকিত যে মাটির ধরা
 লুটায় আমার সামনে—
 সে আমার ডাকে এমন করিয়া
 কেন যে, কব তা কেমনে ।
 মনে হয় যেন সে ধুলির তলে
 যুগে যুগে আমি ছিঁত তুণে জলে,
 সে-দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
 বাহির হয়েছি ভ্রমণে ।
 সেই মুক মাটি মোর মূণ চেয়ে
 লুটায় আমার সামনে ।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
 তাকায় আমার পানে সে ।
 লক্ষ্যযোজন দূরের তারকা
 মোর নাম যেন জানে সে ।
 যে-ভাষায় তারা করে কানাকানি
 সাধ্য কাঁ আর মনে তাহা আনি ;
 চিরদিবসের ভূলে-গাওয়া বাণী
 কোন্ কণা মনে আনে সে ।
 অনাদি উষার বন্ধু আমার
 তাকায় আমার পানে সে ।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
 চির-জনমের ভিটাতে
 স্থলে জলে আমি হাজার বীধনে
 বীধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে ।
 তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
 দূরে এসে ঘর চাই বীধিবারে,

আপনার বাধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে ?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে ।

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা ।
ছোটো-বড়ো হীন সবায় মাঝারে
করি চিন্তের স্থাপনা ।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফলফল,
জীব সাপে যদি ফিরি ধরা তল
কিছুতেই নাহি ভাবনা ।
সেথা যাব সেথা অসীম বাধনে
অন্তবিহীন আপনা ।

নিশাল নিশে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে ।
আমার দুয়ারে নিপিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে ।
ওরে মাটি, তুই আমারে কী চাস ?
মোর তরে জল দু-হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুক পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে ।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে ।

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিপিলে ।

মিথ্যায় ঘেরে, ছোটোটা কণাটিরে

তুচ্ছ করিয়া দেখিলে ।

জগতের যত অণু রেণু সব

আপনার মাঝে অচল নীরব

বহিছে একটি চির-গৌরব---

এ-কথা না যদি শিখিলে,

জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে

প্রবাসী কিরবে নিশিলে ।

ধূলা সাপে আমি ধূলা হয়ে রব

সে গৌরবের চরণে ।

ফুলমাঝে আমি হব ফুলচল

তার পূজারতি বরণে ।

যেথা যাই আর যেথায় চাই রে

ছিল ঠাই নাই তাহার বাহিরে,

প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে

জনমে জনমে মরণে ।

গাফা হই আমি তাই হয়ে রব ।

সে গৌরবের চরণে ।

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,

ধন্য আমার ধরণী ।

ধন্য এ মাটি, ধন্য স্বদ্র

তারকা হিরণ-বরনী ।

যেথা আছি আমি আছি তারি দ্বারে,

নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে ।

আছে তারি পারে তারি পারাবারে

বিপুল ভুবন-ভরণী ।

যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি

ধন্য এ মোর ধরণী ॥

১৫

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাই
 কিসের বাতাস লেগেছে,—
 জগৎ ঘূর্ণি জেগেছে ।
 বলকি উঠছে রবিশশাক
 বলকি ছুটেছে তারা,
 অমৃত চক্র ঘুরিয়া উঠছে
 অবিরাম মাতোয়ারা ।
 স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
 ঘূর্ণির মাঝখানে—
 সেইগান হতে স্বর্ণকমল
 উঠছে শূন্যপানে ।
 স্তম্ভরী, ওগো স্তম্ভরী,
 শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
 দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি ।
 জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
 অচল তোমার রূপরশ্মি ।
 নানাদিক হতে নানা দিন দেখি,—
 পাই দেখিবারে ওই হাসি ।

জননে মরণে আলোকে আধারে
 চলেছি হরণে পূরণে,
 ঘুরিয়া চলেছি ঘুরনে ।
 কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
 চলে বায় সেই দূরে,
 হাতে পাই যারে, পলক কেলিতে
 তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে ।
 কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
 রাখিতে পারি নে কিছু,

মস্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
 কেনপুঞ্জের পিছু ।
 হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
 স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
 ঘূর্ণার পাকে খরতর ।
 দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
 করে নির্ঝর কলভাষে,
 অসীমের চির-চরম শাস্তি
 নিমেষের মাঝে মনে আসে ।

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
 দেখা দিলে আজ কী বেশে ।
 দেখিছু তোমারে পূর্বগগনে,
 দেখিছু তোমারে স্বদেশে ।
 ললাট তোমার নীল নভতল,
 বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
 নীরব আশিস-সম হিমাচল
 তব বরাভয় কর,—
 সাগর তোমার পরশি চরণ
 পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
 জাহ্নবী তব হার-আভরণ
 হুলিছে বক্ষ'পর ।
 হৃদয় খুলিয়া চাহিছু বাহিরে,
 হেরিছু আজিকে নিমেষে—
 মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
 মোর সনাতন স্বদেশে ।

শুনিহু তোমার স্তবের মন্ত
 অতীতের তপোবনেতে,—
 অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
 ধ্বনিতোছে ত্রিভুবনেতে ।
 প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
 দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
 মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
 হিরণ-কিরণে গাথা,—
 তখন ভারতে শুনি চারিভিত্তে
 মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
 প্রাচীন নীরব বগু হইতে
 উঠে গায়ত্ৰীগাথা ।
 হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ায় বাহিরে
 শুনিহু আজিকে নিমেষে,
 অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
 তব গান মোর স্বদেশে ।

নয়ন মৃদয়ি শুনিহু, জানি না
 কেন্ অনাগত বরষে
 তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
 বাজায় ভারত হরষে ।
 ডুবায় ধরার রণতংকার
 ভেদি বণিকের ধনব্যংকার
 মহাকাশতলে উঠে ওংকার
 কোনো বাধা নাহি মানি ।
 ভারতের শ্বেত হৃদিশ তদলে,
 দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
 সংগীত-তানে শূন্যে উথলে
 অপূর্ব মহাবাণী ।

নয়ন মুদিয়া ভাবীকালপানে
 চাহিছ, শুনিছ নিমেষে
 তব মঙ্গলবিজয়শব্দ
 বাজিছে আমার স্বদেশে ।

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
 গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে ।
 সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
 ছন্দ কিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে ।
 ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
 রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া ।
 অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
 সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা ।
 প্রলয়ে স্বজনে না জানি এ কার যুক্তি,
 ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
 বন্ধ কিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
 মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে বাসা ।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
 কত না সুরে, -
 আমি তার সাথে আমার তারটি
 দিব গো জুড়ে ।
 তার পর হতে প্রভাতে গাঁঝে
 তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
 আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
 বাজিবে অব ।
 তোমার সুরেতে আমার পরান
 জড়ায়ে রবে ।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি ।

তোমার কুশুম্বে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি ।

তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
ভুলিবে স্মৃতি ।

মোর পরানের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে ।

১৯

হে রাজন, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ-দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হতে যায় কোথা রে ।

কেহ নাহি চায় ধামিতে ।
শিরে লগ্নে বোঝা ঢলে যায় সোজা
না চাহে দখিনে বামেতে ।
বকুলের শাপে পাখি গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না স্তনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে ।

বাঁশি লই আমি তুলিয়া ।
তার সঙ্গতরে পথের উপরে
বোঝা কেল বসে তুলিয়া ।

আছে যাহা চিরপুরাতন
তারে পায় যেন হারাধন,
বলে, “ফুল এ কী ফুটিয়াছে দেখি ।
পাখি গায় প্রাণ খুলিয়া ।”

হে রাজন, তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহ-দুয়ারে ।
যারা কিছু নাহি কহে যায়,
সুখদুঃখভার বহে যায়,
তার। ক্ষণতরে বিশ্বয়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহ-দুয়ারে ।

২০

দুয়ারে তোমার ভিড় ক’রে যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে ।
মোর নিবেদন নিভৃত্তে তোমার কাছে,
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে ।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র ।

দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি,
কেহ আসিয়াছে ধাচিতে নামের ঘটা,—
ভরি নিতে চাহে কেহ বিজ্ঞার কুলি,
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা ।

আমি আনিয়াছি এ বীণায়,
 তব কাছে লব গানের মন্ত্র,
 তুমি নিজ-হাতে বাঁধো এ বীণায়
 তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র ।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
 লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে,
 পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
 অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে ।
 তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
 ঝংকার দিব কত কী ছন্দ,
 যত গান গাব, তব বাঁধা-তারে
 বাজিবে তোমার উদার মন্ত্র ।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
 আমায় দেখো না বাহিরে ।
 আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
 আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
 আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
 কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে ।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
 মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
 নীরব মস্ত্রে নিশীথ-আকাশে রাজে

আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,—
 আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
 বাজিয়া উঠিছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
 গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
 বিপুল ছন্দে উদার মস্ত্রে মাতিয়া ।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধাঞ্জে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে কেলেছে ছায়া ;—

আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?

নব-অরণ্যে মর্মর-তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুশুমধূলি,
চিত্ত-শুভায় স্তম্ভ রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া ।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ-কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া ।

তোমাদের চোখে আপিজল করে যবে
আমি তাহাদের গঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে-কথাটি নাহি কবে
শূরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে ।
নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
পেলাই ভুলাই ছুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সজ্জান তার বলিতে পারি না কাহারে ।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নাহি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে ।

মালুষ-আকারে বন্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাপায় স্তুতি-নিন্দার জরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে ।

২২

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে । “আছি আমি”
এ-কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিশ্বয়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে । “আছি আর আছে,”
অস্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
গুধাইব অর্থ এর ? তব্বিদ্ তাই
কহিতেছে, “এ নিখিলে আর কিছু নাই,
গুধু এক আছে ।” করে তারা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার ।
একমাত্র তুমি জ্ঞান এ ভব সংসারে ।
যে আদি গোপন তব্ব,—আমি কবি তায়ে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিশ্বয়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া ।

২৩

শূণ্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন ।
নানা জনতায় ফাকা,
কর্ষে অচেতন
শূণ্য ছিল মন ।

জানি না কখন এল নূপুর-বিহীন

নিঃশব্দ গোধূলি ।

দেখি নাই স্বর্ণ-রেখা,

কী লিখিল শেষ লেখা

দিনাস্তের তুলি ।

আমি যে ছিলাম একা

তাও ছিছু তুলি ।

আইল গোধূলি ।

হেনকালে আকাশের বিশ্বয়ের মতো

কোন স্বর্গ হতে

চাঁদখানি লয়ে হেসে

শুভ্র-সন্ধ্যা এল ভেসে

আধারের শ্রোতে ।

বুঝি সে আপনি মেশে

আপন আলোতে ।

এল কোথা হতে ।

অকস্মাৎ বিকশিত পুষ্পের পুলকে

তুলিলাম আপনি ।

আর কেহ কোথা নাই

সে শুধু আমারি ঠাই

এসেছে একাকী ।

সম্মুখে দাঁড়াল তাই

মোর মুখে রাপি

অনিমেঘ আঁধি ।

রাজহংস এসেছিল কোন যুগান্তরে

তুনেছি পুরাণে ।

দময়ন্তী আলবালে
 স্বর্ণঘটে জল ঢালে
 নিকুঞ্জ-বিতানে,—
 কার কথা হেনকালে
 কহি গেল কানে
 শুনেছি পুরাণে ।

জ্যোৎস্নাসঙ্ক্কা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
 এল মোর বৃকে ।
 কোন্ দূর প্রবাসের
 লিপিখানি আছে এর
 ভাষাহীন মুখে ।
 সে যে কোন্ উন্মত্তের
 মিলনকৌতুকে
 এল মোর বৃকে ।

দুইগানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
 সবাক্ষে হৃদয়ে ।
 স্নেহে মোর রাগি শির
 নিম্পন্দ রহিল স্থির,
 কথাটি না কয়ে ।
 কোন্ পদ্ম-বনানীর
 কোমলতা লয়ে
 পশিল হৃদয়ে ?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
 আছি আমি একা ।
 এই শুধু জানিলাম
 জানি নাই তার নাম
 লিপি যার লেখা ।

এই শুধু বৃষ্টিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা ।

বার্ষ হয়, বার্ষ হয় এ দিনরজনী,
এ মোর জীবন ।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন ।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
বার্ষ এ জীবন ।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর ।
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কাঁ দিব উত্তর ?
অশ্রু আসে হৃ-নয়নে,
নির্বাক অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর ।

২৪

হে নিস্তরঙ্গ গিরিরাজ, অপ্রভেলী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অমৃদান্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের ঝর হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
হৃগম হৃক্লহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে ।
হৃঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারিয়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ক্লিয়া গিয়াছে সব স্বর,—সামগীত শব্দহার
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নিকরিশীধারা ।

হে গিরি, ঘোঁষন তব যে দুর্গম অগ্নিতাপবেগে
 আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
 সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
 নিকুন্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষণ ।
 পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শাস্ত হিয়া
 সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া ।

২৫

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি
 তোমার সর্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্রাম শম্পরাজি
 প্রস্তুত পুষ্পজালে ; বনস্পতি শত বরষার
 আনন্দবর্ষণকাব্য লিপিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
 বঙ্কলে শৈবালে জটে ; শুভুর্গম তোমার শিপর
 নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোন্মাসে করিছে মুগ্ধর ।
 আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
 নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে ।
 যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ,
 কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য করিবারে গ্রাস,—
 সেদিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয় ;
 যখনি ধেমেছ তুমি বলিয়াছ, “আর নয়, নয়,”
 চারিদিক হতে এল তোমা’পরে আনন্দ-নিবাস,
 তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস ।

২৬

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাত্রি, গভীর নির্জনে
 পাঠকের মতো তুমি বসে আছ অচল আসনে,
 সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অন্ধ’পরে ।
 পাষণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে ধরে ধরে,
 পড়িতেছ একমনে । ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
 গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ ।

আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র ধোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা ?
নিরাসক্ত নিরাকাক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল স্তন্য
বাহর করণ আকর্ষণে ? কিছু নাহি চাহি ষাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা ।

২৭

তুমি আছ হিমালয় ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্তার মতো । শুক ভূমানন্দ যেন রোমান্থিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পঞ্চশত তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অপ্রভেদী আত্মবিসর্জনে ।
তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—“শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি ।” যে ওংকার আনন্দ-আলোতে
উঠছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
আদিঅন্তবিহীন অশ্রু অমৃত লোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে ।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমায়ি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মহা উজ্জ্বলিছে মেঘধ্বস্তরূপে ।

২৮

হে হিমাদ্রি, দেবতাস্রা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি ।
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল শুক পদ্মপতি,

দুর্গম দুঃসহ মৌন,—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
 নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
 পূজাশ্রণপদ্মদল । কঠিন প্রস্তরকলেবর
 মহান্-দরিত্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর ।
 হেরো তাঁরে অন্ধে অন্ধে এ কী লীলা করেছে বেটন—
 মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধের করেছে আলিঙ্গন
 সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুম্বে
 কোমল শ্রামলশোভা নিতানব পল্লবে কুসুম্বে
 ছায়াবোঁদ্রে মেঘের খেলায় । গিরিশেরে রয়েছে ঘিরি
 পাবতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি ।

২৯

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিখসে গগনে
 আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ-সমীরণে,
 অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অবাক্ত আবেগ ।
 উর্ধ্ববাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
 শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
 রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনবার উন্মুক্ত ধারায়
 নূতন আনন্দ-স্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
 অসীম-জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে ।
 সেইমতো ভারতের হৃদয়সমুদ্র এককাল
 করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,—
 অনন্তের জ্যোতিষ্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
 রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি তরুণিরে ।
 তব মৌন শৃঙ্গমাঙ্কে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
 ভারতের পরিচয় শাস্ত-শিল-অষ্টৈতের সনে ।

৩০

ভারতের কোন্ বৃক্ষ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
 হে আর্ষ আচার্য জগদীশ ? কী অদৃশ্য অপোভূমি
 বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুক ধূলিতলে ?
 কোথা পেলো সেই শান্তি এ উন্নত জনকোলাহলে
 যার তলে ময় হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
 দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
 সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পদ্মপঙ্কী-ধূলায়-প্রভরে,—
 এক তম্রাহীন প্রাণ নিতা যেথা নিজ অত'পরে
 ঢুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে । মোরা যবে
 মস্ত ছিন্ন অতীতের অতিদূর নিফল গৌরবে,
 পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
 কলোলা করিতেছিছ ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অঙ্কুরে—
 তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনার তরুণ ধ্যানাসন
 কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংঘত গম্ভীর করি মন
 ছিলে রত তপস্রায় অরুপরশ্মির অদ্বৈতবে
 লোকলোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব ঋষিগণে
 বগ্নত্বের সিংহদ্বার উদঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
 দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিন্মিত জোড়হাতে ।
 হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমস্ত্রে জলদগর্জনে
 “উত্তীর্ণত নিবোধত ।” ডাকো শাস্ত্র-অভিমানী জনে
 পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে । সূর্যহং বিশ্বতলে
 ডাকো মৃঢ় দান্তিকারে । ডাক দাও তব শিষ্যদলে
 একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হত্যাগ্নি ঘিরিয়া ।
 আরবার এ ভারত আপনাতে আশ্রুক ফিরিয়া
 নিষ্ঠায়, প্রজ্ঞায়, ধ্যানে,—বশুক সে অগ্রমস্ত চিতে
 লোভহীন ক্রোধহীন শুদ্ধ শাস্ত গুরুর বেদীতে ॥

৩১

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,

দিঙ্-দিগন্ত ঢাকি ।—

আজিকে আমরা কাদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,

আমরা থাচার পাণি,—

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,

আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?

চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?

চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?

দেবতার রূপা আকাশের তলে

কোথা কিছু নাহি বাকি ?—

তোমাপানে চাই, কাদিয়া শুধাই

আমরা থাচার পাণি ।

ফাঙ্কন এলে সহসা দপিন পবন হতে

মাঝে মাঝে রহি রহি

‘আসিত সুবাস স্নদূর কুঞ্জভবন হতে

অপূর্ব আশা বহি ।

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,

মাঝে মাঝে যবে রঞ্জনী হইত ভোর,

কী মায়ায়ন্তে বন্ধনদুগ্ধ নাশিয়া

থাচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া

ধনমসি-ঐক্য লোহার শলাকা

সোনার সুধায় মাণি ।

নিপিল বিধ পাইতাম প্রাণে

আমরা থাচার পাণি ।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা

কিছুই না যায় দেখা,—

আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রাস্ত দাহিয়া, হোণা

পড়ে নি সোনার রেখা ।

হৃদয়বদ্ধ, শুন গো বন্ধ মোর,

আজি শৃঙ্খল বাজে অতি শ্রুতোর ।

আজি পিঞ্জর ভূলাবারে কিছু নাহি রে,

কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে ।

মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন

আপনারে দিব ফাঁকি

সে আলোটুকুও হারিয়েছি আজি

আমরা খাচার পাশি ।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন

তোমারে না দেয় ব্যথা ।

পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেন্দো না ঘেন

লয়ে বুধা আকুলতা ।

হৃদয়বদ্ধ, শুন গো বন্ধ মোর,

তোমার চরণে নাহি তো লৌহদোর ।

সকল মেঘের ঊর্ধ্বে বাও গো উড়িয়া,

সেখা ঢালো তান বিমল শৃঙ্গ জুড়িয়া,—

“নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি”

কহ আমাদের ডাকি,

মুদ্রিয়া নয়ান শুনি সেই গান

আমরা খাচার পাশি ।

৩২

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী,

কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি

আপন চরণপ্রান্তে ; তুমি মুক্ত চিতে

যন্ন আছে আপনার গৃহের সংগীতে ।

স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
 তাই আমি ভকু তব, অনিন্দ্যসুন্দরী,
 ভুবন তোমারে পূজে, জ্ঞেনেও জ্ঞান না :
 ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
 খ্যাতিহীন প্রিয়জনে । রাজমহিমারে
 যে কর-পরশে তব পার করিবারে
 দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
 ধূলি কাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে ।
 সেই তো মহিমা তব সেই তো গরিমা,
 সকল মাধুর্ষ চেয়ে তারি মধুরিমা ।

৩৩

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
 মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
 আর ক'রো না দেবি ।
 ওগো আমার মনোহরণ,
 ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরন,
 দাঁড়াও তোমায় হেরি ।
 দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
 দাঁড়াও আমার হৃদয়-দোলে,
 দাঁড়াও গো ঐ জামলতুল 'পরে,
 আকুল চোপের বারি বেয়ে
 দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
 জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে ।
 অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
 অমনি করে তড়িৎ হাসি হেসো,
 অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ ।
 অমনি করে নিবিড় ধারাঙ্কলে
 অমনি করে ঘন তিমির তলে
 আমার তুমি করো নিরুদ্দেশ ।

ওগো তোমার দরশ লাগি,
 ওগো তোমার পরশ মাগি,
 গুমরে মোর হিয়া ।
 রহি রহি পরান বোলে
 আশ্রনরেখা কেঁপে কেঁপে
 যায় যে বলকিয়া ।
 আমার চিত্র-আকাশ জুড়ে
 বলাকা-বল যাচ্ছে উড়ে
 জানি নে কোন দূর সমুদ্রপারে ।
 সঞ্জন বায়ু উদাস ছুটে,
 কোথায় গিয়ে কৈদ উঠে
 পথবিহীন গহন অন্ধকারে ।
 ওগো তোমার আনো পেয়ার তরী,
 তোমার সাপে যাব অকূল 'পরি,
 যাব সকল বাধন-বাধা-পোলা ।
 ঝড়ের বেলা তোমার শ্বিতহাসি
 লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
 তরাস-সাপে হরস দিবে দোলা ।

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
 তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
 বিজ্ঞান উপকূলে,
 ভট্টের পায়ে মাথা কুটে
 তরঙ্গমল ফেনিয়ে উঠে
 গিরির পদমূলে ;
 ঐ যেখানে মেঘের বেণী
 জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
 মর্ম্মরিছে নারিকেলের শাখা,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কত আষাঢ় মাসে

ভিজে মাটির বাসে

বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে ।

সে-সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে ।

এই দিঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,

এই আড়িনা ডাক-নামে তার জানে পরিচয় ।

এই পুকুরে তারি

গীতার-কাটা বারি :

ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময় ।

এই গায়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয় ।

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি

এরা সবাই দেখেছিল তারি মুণের হাসি ।

কুশল পুছি তারে

দাঁড়াত তার ঘারে

লাঙল কাঁধে চলছে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষি ।

সে ছিল এই গায়ে আমি যারে ভালোবাসি !

পালের তরী কত যে যায় বহি দখিন বায়ে,

দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে :

পারের যাত্রিদলে

খেয়াল ঘাটে চল,

কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙা ঘাটের কায়ে ।

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গায়ে ॥

৩৫

ওরে আমার কর্মহার

ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া

ওরে আমার মন রে আমার মন ।

জানি নে তুই কিসের লাগি

কোন্ জগতে আছিল আগি,

কোন্ সকালের বিলুপ্ত ভুবন ।

কোন পুরানো যুগের বাণী অর্থ বাহার নাহি জানি,
 তোমার মুখে উঠছে আজি ফুটে ।
 অনন্ত তোর প্রাচীন স্বতি কোন ভাষাতে গাঁধছে গীতি
 শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে ।
 আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে
 তোমার সাথে চলতে আমি নারি ।
 তুমি যাদের চিনি ব'লে টানছ বৃকে নিচ্ছ কোলে
 আমি তাদের চিনতে নাহি পারি ।

আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
 খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু ।
 মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব বাধা
 এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু ।
 গভীর চিন্তে গোপন শালা সেখা ঘুমায় যে রাজবালা
 জানি নে সে কোন জনমের পাওয়া ।
 দেখে নিলেম ক্রণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
 যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া ।
 ফুলের গন্ধ চূপে চূপে আজি সোনার কাঠিরূপে
 ভাঙল তার চিরযুগের ঘুম ।
 দেখছে লয়ে মুহূর করে আঁকা তাহার ললাট 'পরে
 কোন জনমের চন্দন-কুসুম ।

আজকে হৃদয় বাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে,
 কেবল তাহা অরূপ অপরূপ ।
 খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে
 মর্চে-পড়া পুরানো কুলুপ ।
 সেখায় মারামারির মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
 কেনিবে উঠে নীল সাগরের ডেউ,
 মর্মবিশ্ত-ভয়াল-ছায়ে ভিজ-চিকুর শুকায় বায়ে
 তাদের চেনে চেনে না বা কেউ ।

শৈলতলে চরায় ধেমু রাখালশিশু বাজায় বেণু,
 চুড়ায় তারা সোনার মালা পরে ।
 সোনার তুলি দিয়া লিখা চৈত্রমাসের মরীচিকা
 কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে ।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন-বায়ে মধুর তাপে,
 তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ ।
 কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
 মর্মরিয়া উঠছে কলতান ।
 কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনি নে গো
 মোর ঘারে কে করছে আনাগোনা ।
 ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
 ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
 দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি মৌমাছির মন-হারানি
 ছুই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
 জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
 চোপের পাতে ঘুম-বোলানো তান ।

শুনাস নে গো ক্লান্ত বৃকের বেদনা যত স্ত্রের দুঃপের
 প্রেমের কথা, আশার নিরাশার ।
 শুনাও শুধু মৃদুমন অর্থবিহীন কথার ছন্দ
 শুধু স্ত্রের আকুল ব্যংগ ।
 ধারায়সে সিনান করি যত্নে তুমি এস পরি'
 চাঁপাবরন লঘু বসনবানি ।
 ভালে আঁকে ফুলের রেখা চন্দনেরি পঙ্কলেখা,
 কোলের 'পরে সেতার লহ টানি ।
 দূর দিগন্তে মাঠের পারে স্তনীলছায়া গাছের সারে
 নয়ন দুটি মগন করি চাও ।
 ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
 শুজরিয়া শুজরিয়া গাও ।

৩৬

আমার খোলা জানালাতে

শব্দবিহীন চরণপাতে

কে এলে গো, কে গো ভূমি এলে।

একলা আমি বসে আছি

অন্তলোকের কাছাকাছি

পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।

অতি সুদূর দীর্ঘপথে

আকুল তব আঁচল হতে

আধারতলে গঙ্করেণা রাপি'

জোনাক-জালা বনের শেষে

কখন এলে দুয়ারদেশে

শিথিল কেশে ললাটপানি ঢাকি।

তোমার সাপে আমার পাশে

কত গ্রামের নিদ্রা আসে,

পাশ্ববিহীন পথের বিজ্ঞানতা,

ধূসর আলো কত মাঠের,

বধূশূন্য কত ঘাটের

আধার কোণে জলের কলকথা।

শৈলতটের পায়ের 'পরে

তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে

স্বপ্ন তারি আনলে বহন করি,

কত বনের শাখে শাখে

পাণির যে গান সুপ্ত থাকে

এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি।

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত

এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত,

এনে দেয় গো কাজের অবসান,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্য'পরি,
চক্ষু তব যত্নাসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।

যেমনি তব দ পুন-পাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে।
গৃহ আমার একনিমেবে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কারা আসে
অন্ধ তাদের নীলাঙ্ঘরে ঢাকি।
আজি আমার ঘরের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

এই মুহূর্তে আধেক ধরা
লয়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়াল আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জনিত গীতি।

চক্ষে তব পলক নাহি,
 ঋবতারার দিকে চাহি
 তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশের পানে ।
 নীরব দুটি চরণ ফেলে
 আঁধার হতে কে গো এলে
 আমার ঘরে আমার গীতে গানে ।
 কত মাঠের শূন্যপথে,
 কত পুরীর প্রান্ত হতে
 কত সিঁদুবালুর তাঁরে তাঁরে,
 কত শান্ত নদীর পারে,
 কত শুক গ্রামের ধারে,
 কত স্তম্ভ গৃহদুয়ার ফিরে
 কত বনের বাঘুর 'পরে
 এলোচুলের আঘাত ক'রে
 আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে ।
 বহু দেশের বহু সুরের
 বহু দিনের বহু সুরের
 আনিলে গান আমার বাতায়নে ।

৩৭

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
 আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে ।
 ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
 অর্থ কিছুই এর নাহি রে ।
 কেন আসি, কেন হাসি,
 কেন আঁধারেরে ভাসি,
 কার কথা বলে যাই,
 কার গান গাহি রে—
 অর্থ কিছুই তার নাহি রে ।

ওরে মন আয় তুই সাজ কেলে আয়,
 মিছে কী করিস নাট-বেদীতে ?
 বুঝিতে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়
 খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে ।
 ওই দেখ্ নাটশালা
 পরিয়াছে দীপমালা,
 সকল রহস্য তুই
 চাস যদি ভেদিতে
 নিজে না করিস নাট-বেদীতে ।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
 দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
 এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
 অর্থ তখন কিছু বুঝিবি ।
 একের সহিত একে
 মিলাইয়া নিবি দেগে,
 বুঝে নিবি,—বিধাতার
 সাথে নাহি যুঝিবি,—
 দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি ।

৩৮

চিরকাল এ কী লীলা গো—
 অনন্ত কলরোল ।
 অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
 অদ্ভুত এই দোল ।
 তুলিছ গো, দোলা দিতেছ ।
 পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
 আধারে টানিয়া নিতেছ ।

সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যান্ন দৌলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি ।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল ।
চিরকাল এ কী লীলা গো
অনন্ত কলারোল ।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে ।
নিজধন তুমি নিজেরই হরিয়া
কী খে কর কে বা জানে ।
কোথা বসে আছ একেলা ।
সব রবিশশী কুড়িয়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা ।
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেন্দ্রে ভাবি আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হ'রে ?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে-কথাটি কে বা জানে ।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে ।

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা ।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আছে তো যেমন যা ছিল ।
 হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
 যে মরিল যে বা ঝাটিল ।
 বহি সব স্মৃতিদুখ
 এ ভুবন হাসিমুখ,
 তোমারি খেলার আনন্দে তার
 ভরিয়া উঠেছে বুক ।
 আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
 আছে সেই ভালোবাসা ।
 এইমতো চলে চিরকাল গো
 শুধু যাওয়া, শুধু আসা ।

৩৯

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
 সে কি তুমি, মোর সভাতে ?
 হাতে ছিল তব বাঁশি,
 অধরে অবাক হাসি,
 সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
 মদবিহ্বল শোভাতে ।
 সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
 সেদিন নবীন প্রভাতে—
 নবযৌবন-সভাতে ?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
 সব কাজ তুমি ভুলালে ।
 গেলিলে সে কোন্ পেল্লা,
 কোথা কেটে গেল বেলা ।
 ঢেউ দিয়ে দিয়ে জন্মে আমার
 রক্তকমল তুলালে ।

পুলকিত মোর পরানে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাঙ্ক্ষ মোর ভুলালে ।

তার পরে হায় জানি নে কখন
ঘুম এল মোর নয়নে ।
উঠিত যখন জেগে,
ডেকেছে গগন মেঘে,—
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয়নে ।
তোমাতে আমাতে রত দ্বিষ্ট যবে
কাননে কুশুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে ।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে ।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ কৃতলে শয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে ।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে,
তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে ?

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস-মুরতি ধরিয়া ।
গুমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাঙ্কুট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া ।

বাহির হইতে ঝড়ের আধার
 আনিয়াছ সাধে করিয়া
 তাপস-মুরতি ধরিয়া ।

নমি হে ভীষণ, মৌন, ব্রিহৎ,
 এস মোর ভাঙা আলয়ে ।
 ললাটে তিলকরেখা,
 যেন সে বহিলেখা,
 হস্ত তোমার লৌহদণ্ড
 বাজিছে লৌহবলয়ে ।
 শূন্য কিরিয়া যেয়ো না, অতিথি,
 সব ধন মোর না লয়ে ।
 এস এস ভাঙা আলয়ে ।

৪০

মস্ত্রে সে যে পুত
 রাখির রাঙা স্ত্রীতো,
 বাধন দিয়েছিহু হাতে
 আজ কি আছে সেটি হাতে ?
 বিলায়-বেলা এল মেঘের মতো বোপে,
 গ্রস্থি বেঁধে দিতে দু-হাত গেল কেঁপে,
 সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
 ভরে যে এল জলধারা ।
 আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
 আমার ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
 তুচ্ছ কপাটুকু কেবল মনে আসে
 ভ্রমর যেন পথহারা ;—
 সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাপি
 আধেক রাঙা, সোনা আধা
 আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
 কিছুই নাহি জানি,
 মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
 চৈত্র কসলের দেশে ।
 যখন গেলো চলে তোমার গ্রীবামূলে
 দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে,
 মালাপানি গাধা সাজের কোন্ ফুলে
 লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে ।
 একটুপানি ভূমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে ।
 নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে মেতে,
 দিতেম হারা করে নবীন মালা গেঁথে
 কনকচাঁপা-বনছায়ে ।
 মাঠের পথে যেতে তোমার মালাপানি
 প'ল কি বেণী হতে বসে ?
 আজকে ভাবি তাই বসে ।

নৃপুং ছিল ঘরে
 গিয়েছ পায়ে পরে,
 নিয়েছ হেথা হতে তাই,
 অন্ধে আর কিছু নাই ।
 আকুল কলতানে শতক রসনায়
 চরণ ঘেরি তব কাঁদিয়ে কঙ্কণায়,
 তাহার হেঁধাকার বিরহবেদনায়
 মূগুর করে তব পথ ।
 জানি না কী এত যে তোমার ছিল হারা,
 কিছুতে হল না যে মাথার ভূষা পরা,
 দিতেম খুঁজে এনে সিঁপিটি মনোহরা
 রছিল মনে মনোরথ ।

হেলায় বাধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে-কথা ভাবি তরুণুলে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাজে
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ স্তম্ভর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুনগুন স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে।
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
আলিয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
ঘাটে বাধা ছিল পেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি ?
সীতারিণী পার হব বহি ভার,
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

ঝড়ের মুখে যে কেলেছ আমার
 সেই ভালো, ওগো সেই ভালো ।
 সব লুপ্তজালে বহু জ্বালালে
 সেই আলো মোর সেই আলো ।
 সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
 কী ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি ।
 একাকীর পথে চলিব জগতে
 সেই ভালো মোর সেই ভালো ।

কোনো মান তুমি রাখ নি আমার
 সেই ভালো, ওগো সেই ভালো ।
 হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
 সেই আলো মোর সেই আলো ।
 পাথের যে-কটি ছিল কড়ি
 পথে পসি কবে গেছে পড়ি,
 শুধু নিজবল আছে সম্বল
 সেই ভালো মোর সেই ভালো ।

৪২

আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে
 পাখ, বিদেশী পাখ ।
 ঘণ্টা বাজিল দূরে,
 ওপারের রাজপুরে,
 এমনো যে পথে চলেছিল তুই
 হায় রে পথশ্রান্ত
 পাখ, বিদেশী পাখ ।

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে
 পাখ, বিদেশী পাখ ।

পূজা সারি দেবালয়ে
 প্রসাদী কুসুম লয়ে,
 এখন ঘূমের করু আয়োজন
 হায় রে পথশ্রান্ত
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ।

রজনী আধার হয়ে আসে, ওরে
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ।
 ওই যে গ্রামের 'পরে
 দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
 দীপহীন পথে কী করিবি একা
 হায় রে পথশ্রান্ত
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ।

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস, ওরে
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ।
 নামাযি এমন ঠাই
 পাড়ায় কোথা কি নাই ?
 কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
 হায় রে পথশ্রান্ত
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ।

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ।
 কোন্ প্রান্তরশেষে
 কোন্ বহুদূরদেশে,
 কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
 হায় রে পথশ্রান্ত
 পাস্থ, বিদেশী পাস্থ ॥

৪৩

সাক্ষ হযেছে রণ ।

অনেক যুকিয়া অনেক খুঁজিয়া

শেষ হল আয়োজন ।

তুমি এস, এস নারী,

আনো তব হেমবারি ।

ধুয়ে-মুছে দাও ধুলির চিহ্ন,

জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,

সুন্দর করো, সার্থক করো

পুঞ্জিত আয়োজন ।

এস সুন্দরী নারী

শিরে লয়ে হেমবারি ।

হাটে আর নাহি কেহ ।

শেষ করে গেলা ছেড়ে এত মেলা,

গ্রামে গাড়িলাম গেহ ।

তুমি এস, এস নারী,

আনো গো তীর্থবারি ।

বিন্দু-হসিত বদন-ইন্দু

সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু,

মঙ্গল করো, সার্থক করো

শুক্ল এ মোর গেহ ।

এস কলাগী নারী

নহিয়া তীর্থবারি ।

বেলা কত যায় বেড়ে ।

কেহ নাহি চাহে পর-রবি-দাহে

পরবাসী পথিকেরে ।

তুমি এস, এস নারী,

আনো তব সুধাবারি ।

বাজাও তোমার নিম্নলঙ্ঘ
 শত-চাঁদে-গড়া শোভন শম্ম,
 বরণ করিয়া সার্থক করো
 পরবাসী পথিকেরে ।
 আনন্দময়ী নারী,
 আনো তব সুধাবারি ।

স্রোতে যে ভাসিল ডেলা ।
 এবারের মতো দিন হল গত
 এল বিদায়ের বেলা ।
 ভূমি এস, এস নারী,
 আনো গো অশ্রুবারি ।
 তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
 পথে করে দিক করুণারুষ্টি,
 ব্যাকুল বাহুর পরশে ধনু
 হ'ক বিদায়ের বেলা ।
 অগ্নি বিষাদিনী নারী
 আনো গো অশ্রুবারি ।

অঁধার নিশীথরাতি ।
 গৃহ নির্জন শূন্য শয়ন
 জ্বলিছে পূজার বাতি ।
 ভূমি এস, এস নারী,
 আনো তর্পণবারি ।
 অব্যাহত করি ব্যপিত বক্ষ
 খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
 এলো-কেশপাশে স্তম্ভ-বসনে
 জ্বালাও পূজার বাতি ।
 এস তাপসিনী নারী,
 আনো তর্পণবারি ॥

৪৪

আমাদের এই পল্লিপানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদাকুর কুঞ্জে দেখে চরায় রাখালেরা ।

কোণা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অজ্ঞানেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোণা
আমরা কিছুই জানি নেকো সেই স্মৃতির কথা ।
আমরা জানি গ্রাম কপানি, চিনি দশটি গিরি,
মা পরগী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি ।

সে ছিল ঐ বনের ধারে ভুট্টাপোতের পাশে
যেখানে ঐ ছায়ায় তলে জলটি ঝরে আসে ।
ঝরনা হতে আনতে বারি ছুটত হোথা অনেক নারী,
উঠত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের ধারে,
সকাল-সন্ধ্যা আনাগোনা তারি পথের ধারে ।
মিশ্রিত ফুলফুলধ্বনি তারি দিনের কাণ্ডে,
ঐ রাগিণী পথ দ্বারা ত তারি ঘুমের মাঝে ।

সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিপার হতে নেমে এলেন ধীরে ।
বিস্ময়েতে আমরা সব শুধাই, “তুমি কে গো হবে ?”
বসল যোগী নিরুস্তরে নির্ঝরিতীর কুলে
নাওবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে ।
অজানা কোন্ অমরলে বক্ষ কাঁপে ভরে,
রাত্রি হল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে ।

পরদিনে প্রভাত হল দেবদাকুর বনে,
ঝরনাতলায় আনতে বারি জুটল নারীগণে ।
দুয়ার শোলা দেখে আসি, নাই সে শুলি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জলে ।

কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই
শূন্য ঘরের ঘরের কাছে সম্মাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে পড়ে,—

ঝরনাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।

আজিকে এই তুষার দিনে কোথায় ফিরে নিব্বর বিনে

শুষ্ক কলস ভরে নিতে কোথায় পাবে ধারা।

কে জানে সে নিরুদ্ধেশে কোথায় হল হারা।

কোথাও কিছু আছে কি গো—শুধাই যারে তারে,—

আমাদের এই আকাশ-ঢাক! দশপাহাড়ের পারে ?

গ্রীষ্মরাত্রে বাতাসনে বাতাস হু হু করে,

বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।

তুনি বসে ঘরের কাছে ঝরনা যেন তারেই যাচে

বলে, “ওগো আজকে তোমার নাই কি কোনে! তুনা,

জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা ?”

আমিও কঁদে কঁদে বলি, “হে অজ্ঞাতচারী,

তুনা যদি হারাও তবু তুলো না এই বারি।”

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগল চোখে ধাঁধা,

চারিদিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।

ঐ যে আসে, কারে দেখি ? আমাদের যে ছিল সে কি ?

ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের স্তূপে ?

পোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে ?

নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝরনা নাহি ঝরে,

তুষ্ণা পোলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে ?

সে কছিল, “যে ঝরনা সেথা মোদের ঘরে,

নদী হয়ে সে-ই চলেছে হেথা উদার-ধারে।

সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে অসীম পানে গেছে বেড়ে
 সেই ধরারই নাইকো হেথা পাষাণ-বাধা বেঁধে ।”
 “সবই আছে, আমরা তো নেই” কইল তারে কেঁদে ।
 সে কহিল করুণ হেসে, “আছ হৃদয়মলে ।”
 স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরনাকূলে ॥

৪৫

অতি চুপি চুপি কেন কথা কও
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
 ওগো এ কি প্রণয়ের মরণ ?
 যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
 পড়ে ক্রান্ত বৃন্তে নমিয়া,
 যবে ফিরে আসে গোষ্ঠে গাভীদল
 সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
 তুমি পাশে আসি বস অচপল
 ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ ।
 আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 চোপে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
 করি হৃদিতলে অবতরণ ।
 তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
 মোর অবশ বক্ষশোণিতে ?
 কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
 তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে ?

শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
 মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
 আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 তার সমারোহভার কিছু নেই
 নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
 তব পিঙ্গলছবি মহাজট
 সে কি চূড়া করি বাধা হবে না ?
 তব বিজয়োদ্ধত দ্বজপট
 সে কি আগে-পিছে কেহ ববে না ?
 তব মশাল-আলোকে নদীতট
 স্থাপি মেলিবে না রাঙাবরন ?
 ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
 ছিল কতশত উপকরণ ।
 তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
 তাঁর ব্যব রহি রহি গরজে,
 তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
 যত ভুজঙ্গদল তরজে ।
 তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
 দোলে গলায় কপালাভরণ,
 তাঁর বিষণ্ণে ফুকারি উঠে তান
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

তুমি অশানবাসীর কলকল
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 সুখে গৌরীর আঁশি ছলছল
 তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ ।
 তাঁর বাম আঁশি ফুরে ধর ধর
 তাঁর হিয়া দুক্কহু দুলিছে,
 তাঁর পুলকিত তলু জরজর
 তাঁর মন আপনারে তুলিছে ।
 তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
 পেপা বরেরে করিতে বরণ,
 তাঁর পিতা মনে মানে পরমান্দ
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

তুমি চুরি করি কেন এস চোর
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 শুধু নীরবে কপন নিশি ভোর,
 শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরন ।
 তুমি উৎসব করো সারারাত
 তব বিজয়-শব্দ বাজায়ে ।
 মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
 নব রক্তবসনে সাজায়ে ।
 তুমি কারে করিয়ো না দৃকপাত
 আমি নিজে লব তব শরণ,
 যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাক
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
 তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
 ক'রো সব লাজ অপহরণ ।

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
 আমি ভুয়ে থাকি সুখশয়নে,
 যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
 থাকি আশজাগরুক নয়নে,—
 তবে শঙ্কে তোমার তুলো নাদ
 করি প্রলয়শ্বাস তরণ,
 আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
 যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
 করি আঁধারের অহুসরণ।
 যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
 দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
 যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
 তার উত্ত কণা বিকাশে,
 আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
 আমি করিব নীরবে তরণ
 সেই মহাবরবার রাড়া জল
 ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

৪৬

সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
 এসেছি প্রবাসীর মতো এই ভবে
 বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূণ্য হাতে,
 একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।
 আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
 কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি।

এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
 নিয়েছ, ভুবননাথ । সমস্ত এ প্রাণ
 সংসারে করেছ পূর্ণ । পানপ্রাণ্ডে তব
 প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
 দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজাশেষে
 লবে সবে তোমা সাপে মোরে ভালোবেসে
 এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে ।
 যে প্রবাসে রাগ সেখা প্রেমে রাপো বেঁধে ॥

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
 বাঁদিলে এমনি প্রেমে । প্রেমের আলোকে
 বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
 নব নব পুষ্পদলে ; প্রেম-আকর্ষণে
 যত গুঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
 উঠিলে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে
 বাহিরে আসিলে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
 নিপিল জগতে তব প্রেমের আচ্ছাদনে
 নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
 নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে ।
 কে চাহে সংকীর্ণ অঙ্ক অমরতা-কূপে
 এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
 বাঁচিয়া থাকিতে ? নব নব যুতুপথে
 তোমারে পুঞ্জিতে যাব জগতে জগতে ॥

সংযোজন

১

“হে পণ্ডিক, কোন্‌খানে
চলেছ কাহার পানে?”

“গিয়েছে রঞ্জনী উঠে দিনমানি
চলেছি সাগরমানে ।
উষার আভাসে তুষার বাতাসে
পানির উদ্ধার গানে
শয়ন তেয়াগি উঠিয়াছি ঞ্জাগি
চলেছি সাগরমানে ।”

‘শুধাই তোমার কাছে
সে সাগর কোথা আছে?”

“যেথা এই নদী বহি নিরবধি
নীল জলে মিশিয়াছে ।
সেথা হতে রনি উঠে অবহুবি
লুকায় তাহারি পাছে,
তপ্ত প্রাণের তীর্থ-মানের
সাগর সেথায় আছে ।”

“পণ্ডিক তোমার দলে
যাত্রী কজন চলে?”

“গনি তাহা, ভাই, শেষ নাহি পাই,
চলেছে জলে স্থলে ।
তাহাদের ব্যতি জলে সারারাত্তি
তিমির আকাশতলে ।
তাহাদের গান সারা দিনমান
ধ্বনিছে জলে স্থলে ।”

রবীন্দ্র-রচনাবলী

“সে সাগর কহ তবে
আর কত দূরে হবে?”

“আর কত দূরে আর কত দূরে
সেই তো শুধাই সবে ।
ধ্বনি তার আসে দখিন বাতাসে
ঘন ভৈরব রবে ।
কতু ভাবি কাছে, কতু দূরে আছে,
আর কত দূরে হবে?”

“পথিক, গগনে চাহ,
বাড়িছে দিনের দাহ।”

“বাড়ে যদি দুখ হব না বিমুখ,
নিবাব না উৎসাহ ।
ওরে ওরে ভীত তুষিত তাপিত
জয়সংগীত গাহ ।
মাথার উপরে পর রবিকরে
বাড়ুক দিনের দাহ।”

“কাঁ করিবে চলে চলে
পথেই সন্ধ্যা হলে।”

“প্রভাতের আশে শিথিল বাতাসে
ঘুমাব পথের কোলে ।
উদিকে অরুণ নবান করণ
বিহঙ্গ-কলরোলে ।
সাগরের নান হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হলে।”

২

কী কথা বলিব বলে
বাহিরে এলেম চলে
দাড়ায়ে দুয়ারে তোমার,
উর্ধ্বমুখে উচ্চরবে
বলিতে গেলেম যবে
কথা নাহি আর ।

যে-কথা বলিতে চাহে প্রাণ
সে শুধু হইয়া উঠে গান ।
নিজে না বুঝিতে পারি
তোমারে বুঝাতে নারি
চেয়ে থাকি উৎসুক-নয়ান ।

তবে কিছু শুনায়ে না
শুনে যাও আনমনা
যাহা বোঝ, যাহা নাই বোঝ ।
সম্ভার আধার 'পরে
মুখে আর কণ্ঠস্বরে
বাকিটুকু খোজো ।

কথায় কিছু না যায় বলা
গান সেও উন্নত উতলা ।
তুমি যদি মোর সুরে
নিজ কথা দাও পুরে
গীতি মোর হবে না বিফলা ।

৩

কত দিবা কত বিভাবরী
 কত নদী নদে লক্ষ শ্রোতের
 মাঝখানে এক পথ ধরি,
 কত ঘাটে ঘাটে লাগায়,
 কত সারিগান জাগায়,
 কত অজ্ঞানে নব নব ধানে
 কতবার কত বোঝা ভরি',
 কর্ণধার হে কর্ণধার,
 বেচে কিনে কত স্বর্ণভার,
 কোন্ গ্রামে আজ সাধিতে কী কাজ
 ঐধিয়া ধরিলে তব তরী।

হেথা বিকিকিনি কার হাটে ?
 কেন এত ত্বর লইয়া পসরা,
 ছুটে চলে এরা কোন্ বাটে ?
 শুন গো থাকিয়া থাকিয়া
 বোঝা লয়ে যায় ঠাকিয়া,
 সে করুণ স্বরে মন কী যে করে
 কী ভেবে আমার দিন কাটে।
 কর্ণধার হে কর্ণধার,
 বেচে কিনে লও স্বর্ণভার,
 হেথা কারা রয় লহ পরিচয়
 কারা আসে যায় এই ঘাটে।

যেথা হতে যাই, যাই কেঁদে।
 এমনটি আর পাব কি আবার
 সরে না যে মন সেই পেদে।
 সে-সব কাদন ভুলালে,
 কী দোলায় প্রাণ দুলালে ?

হোখা বারা তীরে আনমনে ফিরে
আমি তাহাদের মরি সেধে ।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার ।
এই হাটে নামি দেখে লব আমি
এক বেলা তরী রাখো কৈধে ।

গান ধর তুমি কোন্‌ সুরে ।
মনে পড়ে যায় দূর হতে এত,
যেত হবে পুন কোন্‌ দূরে ।
তুনে মনে পড়ে দুজনে
পেলেছি সজনে বিজনে,
সে যে কত দেশ নাহি তার শেষ
সে যে কত কাল এত ঘুরে ।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার ।
বাজিয়াছে শাপ, পড়িয়াছে ডাক
সে কোন্‌ অচেনা রাজপুরে ।

৭

দিরেছ প্রশ্নর মোরে, কল্পণানিলয়,
হে প্রভু, প্রতাহ মোরে দিরেছ প্রশ্নর ।
ফিরেছি আপন-মনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে,—তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর, প্রভু,
আজ তাহা জানি । যে অলস চিন্তা-লতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ বন জটিলতা

হৃদয়ে বেষ্টিয়াছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিস্তার ফুল আপনি ফুটালে,
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুখা
গোপনে সঞ্চন করি'। দিয়ে তৃষ্ণা স্ফূৰ্ত্তা,
দিয়ে দণ্ড পুরস্কার, সুখ হৃৎক ভয়
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রাণয়।

৫

রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিন্ন জাগি,
বাহিরে দাঁড়াই এসে ক্ষণেকের লাগি।
শান্ত মৌন নগরীর সুপ্ত হর্মাণিরে
হেরিছ জ্বলিছে তারা নিশ্চল তিমিরে।
ভূত ভাবী বর্তমান একটি পলকে
মিলিল বিবাদব্রিহ্ম আনন্দপুলকে
আমার অন্তরতলে ; অনিবার্য
সে-মুহুর্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুপ,
অমৃতগত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনযুক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কী অনলে উজ্জ্বলিল। সৌরভে নিঃশ্বাসি'
অপরূপ ধূপধ্বন উঠিল স্তম্ভারে
তোমার নক্ষত্রদীপ নিঃশব্দ মন্দিরে।

৬

কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে
গাহিতে তোমার গান কহিল সকলে,
সহসা কুখিয়া গেল হৃদয়ের দ্বার,
যেথায় আসন তব গোপন আগার।

স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব,
 সখাসনে হাস্তোচ্ছ্বাস সেও গান তব,
 প্রিয়াসনে প্রিয়ালাপ, শিশুসনে খেলা,
 জগতে যেখায় যত আনন্দের মেলা,
 সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
 আপনি ধ্বনিতো থাকে সরবে নীরবে ।
 আকাশে তারকা ফুটে ফুলবনে ফুল,
 ধ্বনিতো মানিক থাকে হয় নাকো ভুল,
 তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
 রূপেছ, কবিও যেন রাপে তার মান ।

৭

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
 হেরি সে মত্ততা মোর বুদ্ধ আসি কর—
 তাঁর ভূতা হয়ে তোর এ কী চপলতা ।
 কেন হাস্ত-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
 কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
 ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে ।
 দিয়েছি উত্তর তাঁরে—ওগো পক্ষকেশ,
 আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ ।
 যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
 ধ্বনিত মানব-প্রাণ, আমার বীণায়
 দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
 সাধা নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান ।
 তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে-ক্ষমতা,
 সাধা নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অগ্রথা ।

৮

বিরহ-বৎসর পরে, মিলনের বাঁণ
 তেমন উন্মাদ-মঞ্চে কেন বাজিলি না ?
 কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্ণপানে
 ছুটিয়া গেল না উর্ধ্ব উদ্দাম পরানে
 বসন্তে মানস-যাত্রী বলাকার মতো ?
 কেন তোর সব তনু সবলে প্রহত
 মিলিত ঝংকারভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
 আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
 উঠিল না বাজি' ? হতাশাস মদুস্বরে
 গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
 কেন মৌন হল ? তবে কি আমারি প্রিয়া
 সে পরশ-নিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
 তবে কি আমারি বাঁণা মূলিচ্ছন্ন-তার,
 সেদিনের মতো ক'রে বাজে নাকো আর ?

৯

ওরে পদ্মা, ওরে মোর স্বাক্ষসী প্রেয়সী
 লুঙ্ক বাহু বাড়াইয়া উজ্জ্বলি উল্লসি
 আমারে কি পেতে চাস চির আলিঙ্গনে ?
 শুধু এক মুহূর্তের উন্নত মিলনে
 তোর বক্ষমাঝে চাস করিতে বিলয়
 আমার বক্ষের যত সুখ দুঃখ ভয় ?
 আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে
 বসি' তোর তটোপাশে প্রশান্ত নির্জনে,
 বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মুগ্ধরা
 শাণিত অসির মতো ভীষণ প্রথরা,

অন্তরে নিভৃত শিথ শান্ত সুগভীর,—
 দীপহীন কঙ্কণের অর্ধ রজনীর
 বাসরঘরের মতো নিবৃত্ত নির্জন ;—
 সেথা কার তরে পাতা সূচির শয়ন ?

১০

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে,
 এবার কিছু কি কবি করেছে সঞ্চয় ?
 ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
 চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট স্ত্রাম কিশলয়,
 ক্লান্ত করবীর শুষ্ক ? তপ্ত রৌদ্র হতে
 নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের স্মরা,
 ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
 রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা ।

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা নিশীথে
 নবমলিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
 তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
 যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
 সে কি রাগ নাই গেথে অক্ষয় সংগীতে ?
 সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

১১

হে জনসমূহ, আমি ভাবিতেছি মনে
 কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট মন্বনে
 অনন্ত বয়স ধরি । দেব-দৈত্যদলে
 কী রত্ন সন্ধান লাগি তোমার অতলে
 অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
 পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়

ফেনিল কল্লোলভঞ্জে ? ওগো দাও দাও
 কী আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও ।
 তোমার অন্তরলক্ষ্মী যে শুভপ্রভাতে
 উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি হাতে
 বিম্বিত ভুবনমাঝে,—লয়ে বরমালা
 ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা,
 সেদিন হইবে ক্ষান্ত এ মহামহন,
 যেমে যাবে সমুদ্রের রক্ত এ ক্রন্দন ।

১২

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
 শুন এ কবির গান ।
 তোমার চরণে নবীন হর্ষে
 এনেছি পূজার দান ।
 এনেছি মোদের দেহের শক্তি,
 এনেছি মোদের মনের ভক্তি,
 এনেছি মোদের ধর্মের যতি,
 এনেছি মোদের প্রাণ ।
 এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
 তোমারে করিতে দান ।

কাঞ্চন-খালি নাহি আমাদের,
 অন্ন নাহিকো জুটে ।
 যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
 নবীন পর্ণপুটে ।
 সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
 দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,

চিরদারিত্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে ।
স্বর-দ্বন্দ্ব তোমার প্রসাদ
লইব পৰ্বপুটে ।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় ।
ভিক্ষাহরণ কেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় ।
দৈন্তের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো ।
পরের সজ্জা কেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয় ।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব ।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব ।
যে জীবন ছিল তব তপাবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজ্যসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব ।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব ।

১৩

নব বৎসরে করিলাম পণ
 লব স্বদেশের দীক্ষা,
 তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
 হে ভারত, লব শিক্ষা ।
 পরের ভূষণ, পরের বসন,
 তেয়াগিব আজ পরের অশন,
 যদি হই দীন, না হইব হীন,
 ছাড়িব পরের ভিক্ষা ।
 নব বৎসরে করিলাম পণ
 লব স্বদেশের দীক্ষা ।

না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটির
 কল্যাণে সুবিচিত্র ।
 না থাকে নগর আছে তব বন
 ফলে ফলে সুপবিত্র ।
 তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে
 তোমাতে দেবেছি তত ছোটো করে
 কাছে দেগি আজ, হে স্বদয়রাজ
 তুমি পুরাতন মিত্র ।
 হে তাপস, তব পর্ণকুটির
 কল্যাণে সুপবিত্র ।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
 দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা
 তোমাতে ভুলিতে কিরায়েছি মুগ্ধ,
 পরেছি পরের সজ্জা

কিছু নাহি গনি' কিছু নাহি কহি'
 অপিছ মন্থ অন্তরে রহি,
 তব সনাতন ধ্যানের আসন
 মোদের অস্থিমজ্জা ।
 'পরের বুলিতে তোমায়ে ভুলিতে
 দিযেছি পেয়েছি লজ্জা ।

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
 লইব তোমার দীক্ষা ।
 তব পদতলে বসিয়া বিরলে
 শিখিব তোমার শিক্ষা ।
 তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
 তব মন্দের গভীর মর্ম
 লইব ভুলিয়া সকল ভুলিয়া
 ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা :
 তব গৌরবে গরব মানিব
 লইব তোমার দীক্ষা ।

খেয়া

উৎসর্গ

বিজ্ঞানার্চার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

করকমলেশু

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা ।
কী পেয়েছে আকাশ হতে,
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
 সে যে প্রাণের কথা ।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুকে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
 নীরব ব্যাকুলতা ।
আমার লজ্জাবতী লতা ।

বন্ধু, সজ্জা এল, স্বপনভরা
 পবন এরে চুম্বে ।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
 জড়িয়ে এল ঘুম্বে ।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
 কোন্ ধ্যেয়ানে রতা ।
আমার লজ্জাবতী লতা ।

বন্ধু,
 আনো তোমার তড়িৎ-পরশ,
 হরষ দিয়ে দাও,—
 করুণ চক্ষু মেলে ইহার
 মর্মপানে চাও ।
 সারাদিনের গঙ্গাগীতি
 সারাদিনের আলোর স্বর্গি
 নিয়ে এ যে হৃদয়ভারে
 ধরায় অবনতা ;—
 আমার লজ্জাবতী লতা ।

বন্ধু,
 তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
 ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
 সত্য যেবা কিছু আছে
 বিশ্ব সেবা রয় ।
 এই যে মুদে আছে লাঞ্চে
 পড়বে তুমি এরি মাঝে
 জীবনমত্যা রৌদ্রছায়া
 ঝটিকার বারতা ।
 আমার লজ্জাবতী লতা ।

১৮ আষাঢ় ১৩১৩

কলিকাতা

খেয়া

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘূমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ ।
ওপারেতে সোনার কূলে আধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান ।
নামিয়ে মূপ চুকিয়ে সূপ যাবার মূপে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব যে আজ ঘরছাড়া,
সঙ্ক। আসে দিন যে চলে যায় ।
ওরে আয় ।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ পেয়ায় ।

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে ।
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্ পানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশ ।
অগাচলে তীব্র তলে ঘন গাছের কোল ঘেষে
ছায়ায় যেন ছায়ায় মতো যায়,
ডাকলে আমি ক্ষণেক বামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায় ?
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায় ।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
 পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
 ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
 সজ্জাবেলা কে ডেকে নেয় তারে ।
 ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
 চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
 দিনের আলো যার ফুরাল সাঁজের আলো জলল না
 সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
 ওরে আয় ।
 আমায় নিয়ে যাবি কে রে
 বেলাশেষের শেষ পেয়ায় ।

আঘাট ১৩১২

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দিঘির ধারে ।
 ঐ শোনা যায় বেগুনছায়
 কঙ্কণ-ঝংকারে ।
 আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
 শেষ হয়ে গেছে জলভরা আঙ্গ,
 দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে ।
 ওরা চলেছে দিঘির ধারে ।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—

শাপা-ধরণর পাতা-মরমর
 ছায়া-সুশীতল বাটে ?
 বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ,
 ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,
 এ বেলা কেমনে কাটে ?
 ' আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে ?

ওগো কী আমি কহিব আর ?

ভাবিস নে কেহ ডর করি আমি

ভরা-কলসের ভার ।

যা হ'ক তা হ'ক এই ভালোবাসি,

বঁহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি,

কতদিন কতবার ।

ওগো আমি কী কহিব আর ।

একি শুধু জল নিয়ে আসা ?

এই আনাগোনা কিসের লাগি যে

কী কব, কী আছে ভাষা !

কত-না দিনের আধারে আলোতে

বহিয়া এনেছি এই ঝাঁক পথে

কত ঝাঁক কত হাসা ।

একি শুধু জল নিয়ে আসা ?

আমি ডরি নাই ঝড়জল

উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে

উদ্‌গম অঞ্চল ।

বেগুশাশা 'পরে বারি ঝরঝরে,

এ-কূলে ও-কূলে কালো ছায়া পড়ে,

পথঘাট পিচ্ছল ।

আমি ডরি নাই ঝড়জল ।

আমি গিয়াছি আধার সাজে ।

শিহরি শিহরি উঠে পল্লব

নির্জন বনমাঝে ।

বাতাস ধমকে, জোনাকি চমকে,

ঝিল্লীর সাথে ধমকে ধমকে

চরণে ভূষণ বাজে ।

আমি গিয়াছি আধার সাজে ।

যবে বৃকে ভরি উঠে বাধা,—
 ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
 অকারণ আকুলতা,—
 আপনার মনে একা পথে চলি,
 কাঁথের কলসী বলে ছলছলি
 জলভরা কলকথা,
 যবে বৃকে ভরি উঠে বাধা ।

ওগো দিনে কতবার করে
 ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
 ঐ পথ ডাকে মোরে ।
 কুম্ভমের বাস খেয়ে খেয়ে আসে,
 কপোত-কুঙ্কন-কক্শ আকাশে
 উদাসীন মেঘ ঘোরে—
 ওগো দিনে কতবার করে ।

আমি বাহির হইব বলে
 যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
 নীল আকাশের কোলে !
 তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,—
 কালো লহরীর মাথায় মাথায়
 চঞ্চল আলো দোলে—
 আমি বাহির হইব বলে ।

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি ।
 আঙিনার দ্বারে চাহি পশুপানে
 ঘর ছেড়ে যেতে নারি ।
 দিনের আলোক স্নান হয়ে আসে,
 বধুগণ ঘাটে যায় কলহাসে
 কক্ষে লইয়া ঝারি ।
 মোর ভরা হয়ে গেছে বারি ।

ঘাটে

বাউলের স্তর

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া ।
 যে হাওয়াতে ঢলত তরী
 অন্তে সেই লাগাই হাওয়া ॥
 নেই যদি বা জমল পাড়ি
 ঘাট আছে তো বসতে পারি,
 আমার আশার তরী ডুবল যদি
 দেখব তোদের তরী বাওয়া ॥
 হাতের কাছে কোলের কাছে
 যা আছে সেই অনেক আছে,
 আমার সারাদিনের এই কিরে কাজ
 ওপার পানে কেঁদে চাওয়া ?
 কম কিছু মোর থাকে হেথা
 পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা,
 আমার সেই পানেই কল্পিতা
 সেখানে মোর দাবি-দাওয়া ॥

২৭ ভাদ্র ১৩১২

গিরিভি

শুভক্ষণ

ওগো মা,
 রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
 ঘরের সমুপপথে,
 আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
 রহিব বলো কী মতে ?

বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অন্ধে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস ?

মাগো, কী হল তোমার, অবাকনয়নে
মুখপানে কেন চাস ?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে স্তূর পুরে ;—
শুধু সঙ্কর বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে ।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজ মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে ?

ত্যাগ

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে ।
ঘোমটা ঝসায় বাতায়নে পেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে ।

মাগো কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে।
মোর হার-ছোঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার তুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুপপে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে ?

১৩ শ্রাবণ ১৩১২

বোলপুর

আগমন

তখন রাত্রি আধার হল
সাজ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলাম
আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার খত
রুদ্ধ হল রাতের মতো,
দু-এক জনে বলেছিল,
“আসবে মহারাজ।”
আমরা হেসে বলেছিলাম
“আসবে না কেউ আজ।”

ঘরে যেন আঘাত হল
 শুনেছিলেম সবে,
 আমরা তখন বলেছিলেম,
 “বাতাস বুঝি হবে !”
 নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
 শুয়েছিলেম আলসভরে,
 দু-এক জনে বলেছিল,
 “দূত এল বা তবে !”
 আমরা হেসে বলেছিলেম
 “বাতাস বুঝি হবে ।”

নিশীথ রাতে শোনা গেল
 কিসের যেন ধ্বনি ।
 ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
 মেঘের গরজ্জনি ।
 ফলে ফলে চেতন করি
 কাপল ধরা প্রহরি,
 দু-এক জনে বলেছিল,
 “ঢাকার বনঝনি ।”
 ঘুমের ঘোরে কহি মোরা,
 “মেঘের গরজ্জনি !”

তখনো রাত আধার আছে,
 বেঞ্জে উঠল ভেরী,
 কে ফুকারে “জাগো সবাই,
 আর করো না ঘেরি ।”
 বক্ষপরে দু-হাত চেপে
 আমরা ভয়ে উঠি কঁপে,

তু এক জনে কহে কানে,
 “রাজার দ্বজা হেরি।”
 আমরা জেগে উঠে বলি
 “আর তবে নয় দেরি।”

কোপায় আলো, কোপায় মালা,
 কোপায় আয়োজন।
 রাজা আমার দেশে এসে
 কোপায় সিংহাসন।
 হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
 কোপায় সভা, কোপায় সজ্জা।
 তু-এক জনে কহে কানে,
 “বৃথা এ ক্রন্দন—

প্রিত্তরে শূণ্য ঘরে
 করো অভ্যর্থন।”

ভরে দুয়ার খুলে দে রে,
 বাজা শব্দ বাজা !
 গভীর রাত্রে এসেছে আজ
 আধার ঘরের রাজা।
 বজ্র ডাকে শূণ্যতলে,
 বিদ্রোহের কিলিক বলে,
 ছিন্নশয়ন টেনে এনে
 আড়িনা তোর সাজা
 ঝড়ের সাথে ইঠাং এল
 দুঃখরাতের রাজা।

২৮ শ্রাবণ ১৩১২

কলিকাতা

দুঃখমূর্তি

দুঃখের বেশে এসেছ বলে
 তোমাতে নাহি ডরিব হে ।
 যেখানে বাধা তোমাতে সেথা
 নিবিড় ক'রে ধরিব হে ।
 আধারে মুগ ঢাকিলে, স্বামী,
 তোমাতে তবু চিনিব আমি,
 মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
 চরণ ধরি' মরিব হে—
 যেমন করে দাও না দেখা
 তোমাতে নাহি ডরিব হে ।

নয়নে আজি ঝরিছে জল
 বরুক জল নয়নে হে ।
 বাজিছে বৃকে বাজুক, তব
 কঠিন বাহবাধনে হে ।
 তুমি যে আছ বক্ষে ধরে
 বেদনা তাহা জানাক মোরে
 চাব না কিছু, কব না কথা,
 চাহিয়া রব বদনে হে ।
 নয়নে আজি ঝরিছে জল
 বরুক জল নয়নে হে ।

যুক্তিপাশ

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
 কখন যে গেছ বিহানে
 তাহা কে জানে ।

আমি চরণশব্দ পাই নি শুনিতে
 ছিলেম কিসের ধেয়ানে
 তাহা কে জানে ।
 রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ
 কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
 তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
 এপনো রয়েছে যামিনী,—
 যেমন বন্ধু আছিল সকলি
 বুঝি বা রয়েছে তেমনি ।
 হে মোর গোপনবিহারী,
 ঘূমায়ে ছিলেম বগন, তুমি কি
 গিয়েছিলে মোরে নেহারি ?

আজ নয়ন মেলিয়া একী হেরিলাম
 বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
 আমি বাধা নাই ।

ওগো যে-আধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
 আধা নাই তার আধা নাই,
 আমি বাধা নাই ।
 তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
 দেখিছু কে মোর আগল টুটিয়া
 ঘরে ঘরে যত দুয়ার-জানালা
 সকলি দিয়েছে খুলিয়া ;—
 আকাশ-বাতাস ধরে আসে মোর
 বিজয়পতাকা তুলিয়া !

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হে বিজয়ী বীর অজানা,
কখন যে তুমি জয় করে যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা !

আমি ঘরে বাধা ছিলাম, এবার আমারে
আকাশে রাপিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া ।

সব বাধা খুলে দিয়ে মুক্তিবাধনে
বাধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া ।

রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব পোলা দুয়ারে, --
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে ।

হে মোর পরানবধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে ।

প্রভাতে

এক রজনীর বরষনে শুধু
কেমন করে

আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে ।

নয়ন মেলিয়া দেগিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,

কূল কোথা এর, তল মেলে কই
কহ গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেপো
উঠেছে ভরে ।

কাল রঞ্জনীতে কে জ্ঞানিত মনে
এমন হবে
ঝরঝর বারি তিমির নিশীপে
ঝরিল হবে,—
ভরা শ্রাবণের নিশি দু-পহরে
শুনেনিচ্ছ শুয়ে দীপহীন ঘরে
কৈদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে
কাতর হবে

তপন সে রাতে কে জ্ঞানিত মনে
এমন হবে ।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ-
সলিলমাঝে
'আজি এ অমল কমলকাঙ্ক্ষি
কেমনে রাজে ।
একটিমাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল,
কপন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিলমাঝে !

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহায়ে দেপি,
দুপ-যামিনীর বৃকচেরা ধন
ছেরিলু এ কী ।

ইহারি লাগিয়া হৃদ বিদারণ,

এত ক্রন্দন, এত আগরণ,

ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন

বক্ষে লেখি ।

দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন

হেরিছ এ কী ।

১৪ আষাঢ় ১৩১২

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—

চাই নি সাহস করে—

সঙ্কোবেলায় যে মালাটি

গলায় ছিলে পরে—

আমি চাই নি সাহস করে ।

ভেবেছিলাম সকাল হলে

গণন পারে যাবে চলে

ছিন্নমালা শয্যাতলে

রইবে বৃষ্টি পড়ে ।

তাই আমি কাড়ালের মতো

এসেছিলাম ভোরে—

তবু চাই নি সাহস করে ।

এ তো মালা নয় গো, এ যে

তোমার তরবারি ।

জলে ওষ্ঠ আগুন যেন,

বজ্র-হেন ভারি—

এ যে তোমার তরবারি ।

তক্ষণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
“কী পেলি তুই নারী?”

নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই তো আমি ভাবি বসে
এ কী তোমার দান ?
কোণায় এরে লুকিয়ে রাপি
নাই যে ছেন স্থান।

ওগো এ কী তোমার দান ?
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভ্রমণ কি আমায় সাজে ?
রাপতে গেলে বুকের মাঝে
বাণা যে পায় প্রাণ।

তবু আমি বইল বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ল আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ ক’রে
রাখব পরানময়।

তোমার তরবারি আমার
করবে বঁধন ক্ষয় ।
আমি ছাড়ব সকল ভয় ।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
করব না আর সাজ ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ ।
আমি করব না আর সাজ ।
ধূলায় বসে তোমার তরে
কাদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মানব না আর লাজ ।

তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ ।

২৬ ভাদ্র ১৩১২

গিরিডি

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বধূ,
এই যে নবীনা বুদ্ধিনিহীনা
এ তব বালিকা বধূ ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত পেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এসে ভাবে তুমি তার
পেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বধূ ।

জানে না করিতে সাজ ।
 কেশবেশ তার হলে একাকার
 মনে নাহি মানে লাজ ।
 দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
 ধূলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
 ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
 ঘরকরনের কাজ ।
 জানে না করিতে সাজ ।

কহে এরে গুরুজনে,
 “ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা”
 ভীত হয়ে তাহা শোনে ।
 কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
 কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
 গেলা ফেলি কহু মনে পড়ে তার
 “পালিব পরানপণে
 যাহা কহে গুরুজনে ।”

বাসকশয়ন'পরে
 তোমার বাহুতে বাঁধা রুহিলেও
 অচেতন ঘুমভরে ।
 সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
 ক'ত শুভপন বৃথা চলি যায়,
 যে-হার তাহারে পরালে, সে-হার
 কোথায় খসিয়া পড়ে
 বাসকশয়ন'পরে ।

শুধু ছুদিনে ঝড়ে
 —দশদিক ত্রাসে আধারিয়া আসে
 ধরাতলে অধরে—
 তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
 খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার,

তোমারে সবলে রহে জঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে ধরধরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে ।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয় ।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতেই বুঝি ভালোবাস,
খেলাধরদ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কী যে পাও পরিচয় ।
মোরা মিছে করি ভয় ।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর গেলা ঘুচে যাবে
ওই তব স্রীচরণে ।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন তলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তপন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে ।

ওগো বর, ওগো বধু,
জান জান তুমি—ধূলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধু ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
বেশেছ সাজিয়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া বেশেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বধু ।

অন্যত

দাঁড়িয়ে আছ আধেকপোলা

বাতায়নের ধারে

নূতন বধু বৃষ্টি ?

আসবে কখন চুড়িওলা

তোমার গৃহঘারে

লয়ে তাহার পুঁজি ।

দেপছ চেয়ে গোকুর গাড়ি

উড়িয়ে চলে ধূলি

পর রোদের কালে ;

দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি

বোঝাই নৌকাগুলি

বাতাস লাগে পালে ।

আধেক পোলা বিজ্ঞনঘরে

ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা

একলা বাতায়নে,

বিশ্ব তোমার আগির 'পরে

কেমন পড়ে আঁকা,

তাই ভাবি যে মনে ।

ছায়াময় সে ভুবনখানি

স্বপন দিয়ে গড়া

রূপকথাটি ছাঁদা,

কোন সে পিতামহীর বাণী

নাইকে। আগাগোড়া

দীর্ঘ ছড়া বাধা ।

আমি ভাবি হঠাৎ যদি

বৈশাখের এক দিন

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাতাস বহে বেগে—
 লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
 শূন্যে বাঁধনহীন,
 পাগল উঠে জেগে,—
 যদি তোমার ঢাকা ঘরে
 যত আগল আছে
 সকলি যায় দূরে—
 ওই যে বসন নেমে পড়ে
 তোমার আঁধির কাছে
 ও যদি যায় উড়ে,—

তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
 বজ্রভেরীর স্বরে
 তোমার ঘরে ঢুকি
 জগৎ যদি এক নিমেষে
 শক্তিমূর্তি ধ'রে
 দাঁড়ায় মুখোমুখি—
 কোথায় থাকে আধেকঢাকা
 অলস দিনের ছায়া,
 বাতায়নের ছবি,
 কোথায় থাকে স্বপনমাথা
 আপনগড়া মায়া,—
 উড়িয়া যায় সব।

তখন তোমার ঘোমটা-গোলা
 কালো চোথের কোণে
 কাঁপে কিসের আলো,
 ভূবে তোমার আপনা-ভোলা
 প্রাণের আন্দোলনে
 সকল মন্দভালো।

বন্ধে তোমার আঘাত করে
 উদ্ভাল নর্তনে
 রক্ততরঙ্গিণী ।
 অঙ্গে তোমার কী স্নর তুলে
 চঞ্চল কম্পনে
 কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ।

আজকে তুমি আপনাকে
 আধেক আড়াল ক'রে
 দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
 দেখতেছ এই জগৎটাকে
 কী যে মায়ায় ভরে,
 তাহাই ভাবি মনে ।
 অর্থবিহীন পেলার মতো
 তোমার পথের মাঝে
 চলছে যাওয়া-আসা,
 উঠে ফুটে মিলায় কত
 ক্ষুদ্র দিনের কাজে
 ক্ষুদ্র কঁাদা-হাসা ।

২৬ শ্রাবণ ১৩১২

বোলপুর

বাঁশি

ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
 শুধু ক্ষণেক তরে
 দাও গো আমার করে ।
 শরৎ-প্রভাত গেল ব'য়ে,
 দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাঁশি-বাজা সাঙ্গ যদি

কর আলস ভরে

তবে তোমার বাঁশিখানি

শুধু ক্ষণেক তরে

দাও গো আমার করে ।

আর কিছু নয় আমি কেবল

করব নিয়ে খেলা

শুধু একটি বেলা ।

তুলে নেব কোলের 'পরে,

অধরেতে রাখব ধরে,

তারে নিয়ে যেমন খুশি

যেথা-সেথায় ফেলা--

এমনি করে আপন মনে

করব আমি খেলা

শুধু একটি বেলা ।

তার পরে যেই সন্ধ্যা হবে

এনে ফুলের ডালা

গোঁথে তুলব মালা ।

সাজাব তায় ঘুণীর হারে,

গন্ধে ভরে দেব তারে

করব আমি আরতি তার

নিয়ে দীপের থালা ।

সন্ধ্যা হলে সাজাব তায়

ভরে ফুলের ডালা

গোঁথে ঘুণীর মালা ।

রাতে উঠবে আধেক শশী

তারার মধ্যখানে,

চাবে তোমার পানে ।

তখন আমি কাছে আসি
 ফিরিয়ে দেব তোমার বাঁশি,
 তুমি তখন বাজাবে সুর
 গভীর রাতের তানে
 রাতে যখন আধেক শশী
 তারার মধ্যখানে
 চাবে তোমার পানে ।

২৯ শ্রাবণ ১৩১২

কলিকাতা

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
 আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ভেঁকে,
 “একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
 আঁচল আড়ে প্রদীপপানি ঢেকে ।
 আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
 দেউটি তব হেথায় রাখো বালা ।”
 গোদুলিগে হুটি নয়ন কালো
 ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
 সে কহিল, “ভাসিয়ে দেব আলো
 দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে ।”
 চেয়ে দেখি দাড়িয়ে কাশের বনে
 প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে ।

ভরা মাঝে আঁধার হয়ে এলে
 আমি ভেঁকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,
 “তোমার ঘরে সকল আলো জ্বলে
 এ দীপপানি সঁপিতে যাও কারে ?

আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
 দেউটি তব হেথায় রাখো বালা ।”
 আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
 ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে
 সে কহিল “আমার এ যে আলো
 আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে ।”
 চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
 প্রদীপখানি জলে অকারণে ।
 অমাবস্তা আঁধার দুই পহরে
 জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে
 “ওগো তুমি চলেছে কার তরে
 প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে ?
 আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
 দেউটি তব হেথায় রাখো বালা ।”
 অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
 ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,
 সে কহিল, “এনেছি এই আলো
 দীপালিতে মাজিয়ে দিতে হবে ।”
 চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
 দীপখানি তার জলে অকারণে ।

২৫ শ্রাবণ ১৩১২

বোলপুর

অবারিত

ওগো তোরা বল তো, এরে
 ঘর বলি কোন্ মতে ?
 এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে
 আনাগোনার পথে ?

আসতে যেতে বাঁধে তরাঁ
 আমারি এই ঘাটে,
 যে খুশি সেই আসে,—আমার
 এই ভাবে দিন কাটে ।
 ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
 হয় রে—
 কাঁ কাঁ নিয়ে আছি,—আমার
 বেলা বহে যায় যে, আমার
 বেলা বহে যায় রে ।

পায়ের শব্দ বাজে তাদের,
 রজনীদিন বাজে ।
 ওগো মিথ্যা তাদের ডেকে বলি
 “তোদের চিনি না যে !”
 কাউকে চেনে পরশ আমার
 কাউকে চেনে স্বাণ,
 কাউকে চেনে বৃকের রক্ত
 কাউকে চেনে প্রাণ ;
 ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
 হয় রে—
 ডেকে বলি, “আমার ঘরে
 যার খুশি সেই আয় রে, তোরা
 যার খুশি সেই আয় রে ।”

সকালবেলায় শব্দ বাজে
 পুবের দেবালয়ে,—
 ওগো স্নানের পরে আসে তারা
 ফুলের সাজি লয়ে ।
 মুখে তাদের আলো পড়ে
 তরুণ আলোখানি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অরুণ পায়ের ধুলোটুকু

বাতাস লহে টানি ।

ফিরিয়ে দিতে পারি না যে

হায় রে—

ডেকে বলি, “আমার বনে

তুলিবি ফুল, আয় রে তোরা,

তুলিবি ফুল আয় রে ।”

দুপুরবেলা ঘণ্টা বাজে

রাজার সিংহদ্বারে ।

ওগো

কী কাজ ফেলে আসে তারা

এই বেড়াটির ধারে ।

মলিনবরন মালাগানি

শিথিল কেশে সাজে,

ক্লিষ্টকরণ রাগে তাদের

ক্লান্ত বাঁশি বাজে ।

ফিরিয়ে দিতে পারি না যে

হায় রে—

ডেকে বলি, “এই ছায়াতে

কাটাবি দিন, আয় রে তোরা

কাটাবি দিন আয় রে ।”

রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে

গহন বনমাঝে ।

ওগো

ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর

কার সে আঘাত বাজে ?

যায় না চেনা মুখপানি তার,

কয় না কোনো কথা,

ঢাকে তারে আকাশভরা

উদাস নীরবতা ।

কিরিয়ে দিতে পারি না যে

হায় রে—

চেয়ে থাকি সে-মুখপানে

রাখি বহে যায়, নীরবে

রাখি বহে যায় রে ।

১৫ পৌষ ১৩১২

শান্তিনিকেতন

গোধূলিগন

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে

গোধূলি-লগন রে ।

বিসাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে

সোনার গগন রে ।

শেষ করে দিল পাপি গান গাওয়া,

নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া,

ওপারের তীর ভাঙা মন্দির

ঈধারে মগন রে ।

আসিছে মধুর ঝিল্লি-নুপুরে

গোধূলি-লগন রে ।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো বেলায়,

কখনো কত কী কাজে ।

এখন কি শুনি পুরবীর সুরে

কোন দূরে বাঁশি বাজে ।

বুঝি দেয় নাই, আসে বুঝি আসে,

আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,

বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
 নবমিলনের সাজে ?
 সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
 ডাক মোরে আর কাজে ?

এখন নিরিবিলা ঘরে সাজাতে হবে রে
 বাসক-শয়ন যে ।
 ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
 হয় নি চয়ন যে ।
 সারা যামিনীর দীপ সযতনে
 জালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
 যুগীদল আনি গুণ্ঠনধানি
 করিব বয়ন যে ।
 সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের
 বাসক-শয়ন যে ।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
 চলে গেছে তারা সব ।
 রাপালের গান হল অবসান,
 না গুনি ধেমুর রব ।
 এই পথ দিয়ে প্রভাতে ছুপুবে
 যারা এল আর যারা গেল দূরে
 কে তারা জানিত আমার নিভৃত
 সন্ধ্যার উৎসব ।
 কেনাবেচা যারা করে গেল সারা
 চলে গেল তারা সব ।

আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গনা
 গোধূলি-লগন রে ।
 পূসর আলোকে মুদ্রিবে নয়ন
 অন্ত-গগন রে—

এখন নিখিলি নিখিলি শব্দে মাছারাও হতেছে

বামল মাছরাও -

খুলেছে মাগি বচনীমাগি

হুগনি হুগনি !

মাগা মাগিমাগি দিলে মাগি

মাগা মাগি হুগনি হুগনি মাগা মাগি, -

মাগি মাগি মাগি হুগনি মাগি

করিব মাগি, -

মাগা মাগি হুগনি নিখিলিমাগি

বামল মাগি !

প্রত্যেক প্রত্যেক মাগি নিখিলি হুগনি

হুগনি হুগনি মাগি মাগি, -

মাগা মাগি মাগি হুগনি মাগি,

না হুগনি হুগনি হুগনি ।

এই মাগি দিলে প্রত্যেক হুগনি

মাগা মাগি মাগি মাগি হুগনি,

হুগনি হুগনি, মাগা মাগি হুগনি

মাগা মাগি

কেনা হুগনি মাগি হুগনি মাগি

হুগনি হুগনি মাগি মাগি !

তখন এ-ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
 কে লইবে টানি বাহাট আমার,
 আমায় কে জানে কী মন্ড্রে গানে
 করিবে মগন রে—
 সব গান সেরে আসিবে যখন
 গোধূলি-লগন রে ।

লীলা

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
 তোমার গগনকোণে
 সদাই কিরি অকারণে ।
 তুমি আমার চিরদিনের
 দিনমণি গো—
 আঞ্জো তোমার কিরণপাতে
 মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাপে
 দেয় নি মোরে বাষ্প ক'রে
 তোমার পরশনি—
 তোমা হতে পৃথক হয়ে
 বৎসর মাস গনি ।

ওগো এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
 এমনি পেলা তব
 তবে পেলাও নব নব ।
 লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
 ক্ষণিকতা গো—
 সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
 ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,

বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
 খেলাও যথা-তথা,—
 শূন্য আমায় নিয়ে রচ
 নিত্য বিচিত্রতা ।

ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
 সাজ ক'রো খেলা
 ঘোর নিশীথরাত্রিবেলা ।
 অশ্রুধারে ঝরে যাব
 অন্ধকারে গো—
 প্রভাতকালে রবে কেবল
 নির্মলতা গুহ্মশীতল,
 রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
 হাসবে চারিধারে,—
 মেঘের পেলা মিশিয়ে যাবে
 জ্যোতিঃসাগরপারে ।

২০ পৌষ ১৩১২

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

মেঘ

আদি অস্ত হারিয়ে ফেলে,
 সাদা কালো আসন মেলে,
 পড়ে আছে আকাশটা পোশখেয়ালি,
 আমরা যে সব রাশি রাশি
 মেঘের গুঞ্জ ভেসে আসি,
 আমরা তারি খেয়াল তারি হেয়ালি ।
 মোদের কিছু ঠিকঠিকানা নাই,
 আমরা আসি আমরা চলে যাই ।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
 গ্রহতারা রবির ডালা,
 জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা ;
 ওদের হিসেব পাকা খাতায়
 আলোর লেখা কালো পাতায়,
 মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া ;
 রংবেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
 যেমন খুলি মোছে আবার লেখে ।

আমরা কত বিনা কাজে
 ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
 অকারণে মুচকে হাসি হামেশা ।
 তাই বলে সব মিথ্যা না কি ?
 বৃষ্টি সে তো নয়কে ফাঁকি,
 বজ্রটা তো নিতান্ত নয় তামাশা ।
 শুধু আমরা থাকি নে কেউ, ভাই,
 হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই ।

নিরুদ্ভম

তখন আকাশতলে ডেউ তুলেছে
 পাপিরা গান গেয়ে ;
 তখন পুষ্পের দুটি ধারে
 ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
 মেঘের কোণে রং ধরেছে
 দেখি নি কেউ চেয়ে ।
 মোরা আপন মনে ব্যস্ত হয়ে
 চলেছিলাম ধৈয়ে ।

মোরা সুখের বশে গাই নি তো গান,
করি নি কেউ খেলা ;
চাই নি ভুলে ডাহিন-বায়ে,
হাটের লাগি যাই নি গায়ে,
হাসি নি কেউ, কই নি কথা,
করি নি কেউ ছেলা ;
মোরা ততই বেগে চলেছিলাম
যতই বাড়ে বেলা ।

শেষে সুখ যখন মাঝ আকাশে
কপোত ডাকে বনে,
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শুকনো পাতা বেড়ায় উড়ে,
বটের তলে রাখালশিশু
ঘুমায় অচেতনে,
আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্রামল তৃণাসনে ।

আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে :
চলে গেল উল্ল শিরে
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথতরুর শেষে ;
তারা পেরিয়ে গেল কত যে মার্ট,
কতদূরের দেশে !

ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে ।
লাজের ঘারে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,

ময় হলেম আনন্দময়
 অগাধ অগৌরবে,—
 পাণির গানে, বাণির তানে,
 কম্পিত পল্লবে ।

আমি মুগ্ধতম্ দিলাম মেলে
 বসুন্ধরার কোলে ।
 বাণের ছায়া কঁা কোঁতুকে
 নাচে আমার চক্ষে মুগ্ধ,
 আমার মুকুল গঞ্জে আমায়
 নিধুর ক'রে তোলে
 নয়ন মুদে আসে মৌমাছির
 গুঞ্জন-কল্লোলে ।

সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
 মিলিয়ে এল প্রাণে ।
 ভূলে গেলেম কিসের ভরে
 বাহির হলেম পপের 'পরে,
 টেলে দিলেম চেতনা মোর
 ছায়ায় গঞ্জে গানে ;
 ধীরে ধুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে
 কখন কে তা জানে ।

শেষে গভীর ঘূমের মধ্য হতে
 ফুটল যখন আঁশি,
 চেয়ে দেখি, কখন এসে
 দাড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
 তোমার হাসি দিয়ে আমার
 অচৈতন্য ঢাকি' ।
 ওগো ভেবেছিলাম আছে আমার
 কত না পথ বাকি ।

মোরা ভেবেছিলেম পরানপণে

সজাগ রব সবে ;

সন্ধ্যা হবার আগে যদি

পার হতে না পারি নদী,

ভেবেছিলেম তাহা হলেই

সকল ব্যর্থ হবে ।

যখন আমি ধেমে গেলাম, তুমি

আপনি এলে কবে ।

৬ চৈত্র ১৩১২

কলিকাতা

রূপণ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম

গ্রামের পথে পথে,

তুমি তখন চলেছিলে

তোমার স্বর্ণরূপে ।

অপূর্ব এক স্বপ্নসম

লাগতেছিল চক্ষু মম

কী বিচিত্র শোভা তোমার

কী বিচিত্র সাজ ।

আমি মনে ভাবতেছিলেম

এ কোন্ মহারাজ ।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহাল

ভেবেছিলেম তবে,

আজ আমারে দ্বারে দ্বারে

ফিরতে নাহি হবে ।

বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুইধারে—
মৃঠা মৃঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে ।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুগ্পানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে ।
দেশে মূপের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল বাবা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
“আমায় কিছু দাও গো” বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত ।

মরি, এ কী কণা রাজাধিরাজ,
“আমায় দাও গো কিছু ।”
শুনেন ক্ষণকালের তরে
রৈলু মাথা-নিচু ।
তোমার কী বা অভাব আছে,
ভিগারি ভিক্ষকের কাছে ?
এ কেবল কৌতূকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা ।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা ।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
 উজাড় করি—এ কী
 ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
 সোনার কণা দেখি ।
 দিলেম যা রাজ-ভিখারি
 স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
 তখন কাঁদি চোখের জলে
 দুটি নয়ন ভরে
 তোমায় কেন দিই নি আমার
 সকল শূণ্য করে ।

৮ চৈত্র [১৩১২]

কলিকাতা

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাই নি কিছু,
 জানাই নি মোর নাম,
 তুমি যখন বিদায় দিলে
 নীরব রহিলাম ।
 একলা ছিলাম কুয়ার ধারে
 নিমের ছায়া তলে,
 কলস নিয়ে সবাই তখন
 পাড়ায় গেছে চলে ।
 আমায় তারা ভেকে গেল
 “আয় গো বেলা যায় ।”
 কোন্ আলসে রইল বসে
 কিসের ভাবনায় ।

পদধ্বনি শুনি নাইকো

কখন তুমি এলে।

কইলে কথা ক্লাস্তকণ্ঠে

করুণ চক্ষু মেলে—

“তুমাকাতর পাছ আমি”—

শুনে চমকে উঠে

জলের ধারা দিলেম ঢেলে

তোমার করপুটে।

মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,

কোকিল কোথা ডাকে

বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে

পল্লীপথের বঁাকে।

যখন তুমি শুধালে নাম

পেলেম বড়ো লাজ,

তোমার মনে থাকার মতো

করেছি কোন্ কাজ ?

তোমায় দিতে পেরেছিলেম

একটু তুমার জল

এই কথাটি আমার মনে

রহিল সম্বল।

কুয়ার ধারে ছপুরবেলা

তেমনি ডাকে পাখি,

তেমনি কাঁপে নিমের পাতা,

আমি বসেই থাকি।

জাগরণ

পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,
 লাগছে মনে ভয়—
 সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ি
 যদি এমন হয় ।
 যদি তখন হঠাৎ এসে
 দাঁড়ায় আমার দুয়ার-দেশে ।
 বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
 আছে তো তার জানা,—
 ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস
 করিস নে কেউ মানা ।

যদি বা তার পায়ের শব্দে
 ঘুম না ভাঙে মোর
 শপথ আমার তোরা কেহ
 ভাঙাস নে সে ঘোর ।
 চাই নে জাগতে পাখির রবে
 নতুন আলোর মহোৎসবে,
 চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল
 বকুলফুলের বাসে,
 তোরা আমায় ঘুমোতে দিস
 যদিই বা সে আসে ।

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
 গভীর অচেতনে,
 যদি আমায় জাগায় তারি
 আপন পরশনে ।
 ঘুমের আবেশ যেমনি টুট
 দেখব তারি নয়ন দুটি

মুখে আমার তারি হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর স্বপ্নের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে ।

সে আসবে মোর চোখের 'পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হয়ে আগে ।
প্রথম ঢমক লাগবে স্বপ্নে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তার চেতনায় ভ'রে—
তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে ।

১০ চৈত্র ১৩১২

কলিকাতা

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে ।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যর্থ হয়ে রজনীদিন
আঘাত করিস বোটাতে
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে ।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
মান করতে পারিস তারে,

ছিঁড়তে পারিস দলগুলি তার,
 ধুলায় পারিস লোটাতে,
 মোদের বিষম গুণগোলে
 যদিই বা সে মুখটি খোলে,
 ধরবে না রং, পারবে না তার
 গন্ধটুকু ছোটাতে ।
 তোরা কেউ পারবি নে গো
 পারবি নে ফুল ফোটাতে ।

যে পারে সে আপনি পারে
 পারে সে ফুল ফোটাতে ।
 সে শুধু চায় নয়ন মেলে
 ছুটি চোখের কিরণ ফেলে,
 অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
 মন লাগে বোটাতে !
 যে পারে সে আপনি পারে
 পারে সে ফুল ফোটাতে ।

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
 ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
 পাতার পাখা মেলে দিয়ে
 হাওয়ায় থাকে লোটাতে ।
 রং যে ফুটে ওঠে কত
 প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
 যেন কারে আনতে ভেকে
 গন্ধ থাকে ছোটাতে ।
 যে পারে সে আপনি পারে,
 পারে সে ফুল ফোটাতে ।

হার

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারব না।
হারাও যদি হারব গেলায়
তোমার গেলা ছাড়ব না।
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে,
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে,
আমরা না হয় মরার পথে
করব প্রয়াণ রসাতলে,
হারের গেলাই গেলব মোরা
বসাও যদি হারের দলে।

আমরা বিনা পণে গেলব না গো
গেলব রাজার ছেলের মতো।
ফেঙ্গব গেলায় ধনরতন
যেপায় মোদের আছে যত।
সবনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যাক সকলি যাক,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
গেলা মোদের করব সারা।
তার পরে কোন বনের কোণে
হারের দলটি হব হারা।

তবু, এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার গেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাধন,

শেষ দানেতে তোমার কাছে
 বিকিয়ে দেব আপনারে ।
 তার পরে কী করবে তুমি
 সে-কথা কেউ ভাবতে পারে ?

১২ চৈত্র [১৩১২]

বোলপুর

বন্দী

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
 এত কঠিন করে ?

প্রভু আমায় বেঁধেছে যে
 বজ্রকঠিন ডোরে ।

মনে ছিল সবার চেয়ে
 আমিই হব বড়ো,
 রাজার কড়ি করেছিলাম
 নিজের ঘরে জড়ো ।

ঘুম লাগিতে শুয়েছিলাম
 প্রভুর শয্যা পেতে,
 জেগে দেখি বাধা আছি
 আপন ভাঙারেতে ।

বন্দী ওগো কে গড়েছে
 বজ্রবাধন মানি ?

আপনি আমি গড়েছিলাম
 বহু যতন মানি ।
 ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ
 করবে জগৎ গ্রাস,

আমি রব একলা স্বাধীন
 সবাই হবে দাস ।
 তাই গড়েছি রজনীদিন
 সোহার শিকলখানা—
 কত আগুন কত আঘাত
 নাইকো তার ঠিকানা ।
 গড়া যখন শেষ হয়েছে
 কঠিন স্মৃকঠোর,
 দেখি আমার বন্দী করে
 আমারি এই ডোর ।

১ বৈশাখ ১৩১৩

বোলপুর

পথিক

পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি
 এগুন এ যে গভীর ঘোর নিশা ।
 নদীর পারে তমাল-বনভূমি
 গহন ঘন অন্ধকারে মিশা ।
 মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা,
 বাঁশির ধনি হৃদয়ে এসে লাগে,
 নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
 তরুণ ঝাঁপি এখনো দেখো জাগে ।
 বিদায়-বেলা এধনি কিগো হবে,
 পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে ?

তোমাতে মোরা বাঁধি নি কোনো ডোরে
 রুধিয়া মোরা রাপি নি তব পথ,
 তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ প'রে
 বাহিরে দেখো দাঁড়ায়ে তব রথ ।

বিনায়-পথে দিয়েছি বটে বাধা,
 কেবল শুধু করুণ কলগীতে ।
 চেয়েছি বটে রাখিতে হেথা বাধা
 কেবল শুধু চোপের চাহনিতে ।
 পথিক ওগো মোদের নাহি বল,
 রয়েছে শুধু আকুল আশিজল !

নয়নে তব কিসের এই মানি,
 রক্তে তব কিসের তরলতা ।
 আধার হতে এসেছে নাহি আমি
 তোমার প্রাণে কাহার কী বারতা ।
 সপঞ্চবি গগনসীমা হতে
 কখন কী যে মন দিল পড়ি,—
 তিমির রাত্তি শব্দহীন শ্রোতে
 জ্বলয়ে তব আসিল অবতরি ।
 বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
 তোমার কাছে পাঠাল কেন্ দত্ত ?

এ মেল যদি না লাগে তব ভালো,
 শাস্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
 সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
 বাণীর তবে ধামায়ে দিব তান ।
 স্তব্ধ মোরা আধারে রব বসি,
 ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে.
 কক্ষরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শব্দী
 চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে ।
 পথ-পাগল পথিক রাপো কথা,
 নিশীথে তব কেন এ অধীরতা ?

মিলন

- আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
 জুড়াল হৃদয় জুড়াল—আমার
 জুড়াল হৃদয় প্রভাতে ।
- আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
 পরান কী নিধি জুড়াল—ভূবিয়া
 নিবিড় নীরব শোভাতে ;
- আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
 দেগেছি একেলা আলোকে—দেগেছি
 আমার হৃদয়-রাজারে ।
- আমি দু-একটি কথা কয়েছি তা-সনে
 সে নীরব সভামানবেরে—দেগেছি
 চিরজনমের রাজারে ।
- ওগো সে কি মোরে শুধু দেগেছিল চেয়ে
 অথবা জুড়াল পরশে—তাহার
 কয়ল করের পরশে—
- আমি সে-কণ্ঠ সকলি গিয়েছি যে ভুলে
 ভুলেছি পরম হরষে ।
- আমি জানি না কী হল, শুধু এই জানি
 চোপে মোর সুপ মাগাল—কে যেন
 সুপ-অগ্নন মাগাল,—
- কার আগিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
 যদিকেই আগি তাকাল ।
- আজ মনে হল কারে পেয়েছি—কারে যে
 পেয়েছি সে-কথা জানি না ।
- আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
 সারা আকাশের আড়িনা—কিসে যে
 পুরেছে শূন্য জানি না ।

এই বাতাস আমারে ছদয়ে লয়েছে,
 আলোক আমার তহুতে—কেমনে
 মিলে গেছে মোর তহুতে ;—
 তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
 আমার অণুতে অণুতে ।

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
 দেহমন মোর ফুরাল,—যেন রে
 নিঃশেষে আজি ফুরাল,—
 আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
 জুড়াল জীবন জুড়াল—আমার
 আদি ও অন্ত জুড়াল ।

২৩ মার্চ সোমবার ১৩১২

শিলাইদহ । পদ্মা

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি
 সুর দিয়ে যে যাব
 তারে তারে খুঁজে বেড়াই
 সে-সুর কোথায় পাব ।

যেমন সহজ হোরের জাগা,
 শ্রোতের আনাগোনা,
 যেমন সহজ পাতায় শিশির,
 মেঘের মুখে সোনা,
 যেমন সহজ জ্যোৎস্নাপানি
 নদীর বালু-পাড়ে,
 গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
 আষাঢ়-অঙ্ককারে,—

খুঁজে মরি তেমনি সহজ,
 তেমনি ভরপুর,
 তেমনিতরো অর্থ-ছোটা
 আপনি-ফোটা স্তর ;
 তেমনিতরো নিত্য নবীন,
 অফুরন্ত প্রাণ,
 বহুকালের পুরানো সেই
 সবায় জানা গান ।

আমার যে এই নূতন গড়া
 নূতন-বীধা তার
 নূতন স্তরে করতে সে যায়
 সৃষ্টি আপনার ।
 মেশে না তাই চারিদিকের
 সহজ সমীরণে,
 মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
 বৃক্ক আলোর সনে ।
 জীবন আমার কান্দে যে তাই
 দগু পলে পলে,
 যত চেষ্টা করি কেবল
 চেষ্টা বেড়ে চলে ।
 ঘটিয়ে তুলি কত কী যে
 বৃষ্টি না এক তিল,
 তোমার সঙ্গে অনায়াসে
 হয় না সুরের মিল ।

২৪ মাঘ ১৩১২

শিলাইদহ । পদ্মা

বিকাশ

আজ বৃকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
 দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতগানি,
 আকাশেতে সোনার আলোয়
 ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
 কুঁড়ির মতো কেটে গিয়ে
 ফুলের মতো উঠল কেঁদে,
 সুধাকোষের স্তম্ভ তার
 পারলে না আর রাখতে বেধে।
 ওরে মন, খুলে দে মন,
 যা আছে তোর খুলে দে।
 অন্তরে যা ভূবে আছে
 আলোকপানে তুলে দে।
 আনন্দে সব বাধা টুটে
 সবার সাংগে ওঠ রে ফুটে,
 চোখের 'পরে আলসন্ডের
 রাগিস নে আর আঁচল টানি।

আজ বৃকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
 দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতগানি।

২৪ মাঘ ১৩১২

শিলাইদহ। পদ্মা

সীমা

সেটুকু তোর অনেক আছে
 যেটুকু তোর আছে খাটি।
 তার চেয়ে লোভ করিস যদি
 সকলি তোর হবে মাটি।

একমনে তোর একতারাতে
 একটি যে তার সেইটে বাজা,
 ফুলবনে তোর একটি কুসুম
 তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ।
 যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
 আনন্দে তুই ধামিস এসে,
 যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
 সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে ।
 লোকের কথা নিস নে কানে,
 ফিরিস নে আর হাজার টানে
 যেন রে তোর হৃদয় জানে
 হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
 একতারাতে একটি যে তার
 আপন মনে সেইটি বাজা ।

২৫ মার্চ ১৩১২
 শিলাইদহ । পদ্মা

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
 করিয়া দিয়েছ সোজা,
 আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
 সকলি হয়েছে বোঝা ।
 এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
 নামাও ।
 ভারের বেগেতে চলেছি, আমার
 এ যাত্রা তুমি ধামাও ।

যে তোমার ভার বহে, কভু তার
সে ভারে ঢাকে না আঁখি,
পথে বাহিরিলে জগৎ তারে তো
দেয় না কিছুই ঝাঁকি ।

অবারিত আলো ধরে আসি তার
হাতে,
বনে পাখি গায় নদীধারা খায়,
চলে সে সবার সাথে ।

তুমি কাজ দিলে কাজেরি সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি ।

বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
ঢাকি,
তোমা পানে চেয়ে যত করি ভোগ
তত আরো থাকে বাকি ।

আপনি যে দুপ ডেকে আনি, সে যে
জালায় বজ্রানলে,
অস্ত্রার করে রেখে যায়, সেপা!
কোনো ফল নাহি ফলে ।

তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের
দান,
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ ।

যেখানে যা-কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা,—
যে দোষে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা ।

এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও ।
ভাবের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর নামাও ।

২৫ মাঘ [১৩১২]

পদ্মা

টিকা

আজ পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে
হেরিত্ত অরুণ শিখা,—হেরিত্ত
কমলবরন শিখা,
তপনি হাসিয়া প্রভাত-তপন
দিলেন আমারে টিকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টিকা ।
কে যেন আমার নয়ন-নিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যেদিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি ।
অস্তুর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোপাও না পায় দিশা ।

আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিছ
কমলবরন শিখা—আমার
অস্তুরে দিল টিকা ।

ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
 এ পরশ রেখা দিব না মুছিতে,
 সঙ্ক্যার পানে নিয়ে যাব বহি
 নবপ্রভাতের লিখা
 উদয়-রবির টিকা ।

২৬ মাঘ [১৩১২]

পদ্মা

বৈশাখে

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
 আমলা গাছের কচি পাতায়
 কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
 নিমের ফুলে গন্ধে মাতায় ।
 কেউ কোথা নেই মাঠের 'পরে,
 কেউ কোথা নেই শূণ্য ঘরে
 আজ দুপরে আকাশতলে
 রিমিঝিমি নুপুর বাজে ।
 বারে বারে ঘুরে ঘুরে
 মৌমাছিদের গুঞ্জ সুরে
 কার চরণের নৃত্য যেন
 ফিরে আমার বৃকের মাঝে,
 রক্তে আমার তালে তালে
 রিমিঝিমি নুপুর বাজে ।
 ঘন মহল-শাখার মতো
 নিশাসিয়া উঠিছে প্রাণ ;
 গায়ে আমার লেগেছে কার
 এলোচুলের স্তম্ভর স্রাণ ।

আজি রোদের প্রথম তাপে
 বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
 বাতাস বাজে মর্মরিয়া
 সারি-বাঁধা তালের বনে ।
 আমার মনের মরীচিকা
 আকাশপারে পড়ল লিগা,
 লক্ষ্যবিহীন দূরের 'পরে
 চেয়ে আছি আপন মনে ।
 অলস দেখ চরে বেড়ায়
 সারি-বাঁধা তালের বনে ।

আজিকার এই তপ্ত দিনে
 কাটল বেলা এমনি করে ।
 গ্রামের ধারে ঘাটের পথে
 এল গভীর ছায়া পড়ে ।
 সন্ধ্যা এখন পড়ছে হেলে
 শালবনেতে আঁচল মেলে,
 আঁধার-ঢালা দিঘির ঘাটে
 হয়েছে শেষ-কলস ভরা ।

মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
 ভাবি মাঠের মধো গিয়ে—
 সারা দিনের অকাজে আজ
 কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা ?
 আমার কি মন শূন্য, যখন
 হল বধুর কলস-ভরা ?

বিদায়

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই ।
 কাজের পথে আমি তো আর নাই ।
 এগিয়ে সব যাও না দলে দলে,
 জয়মালা লও না তুলি গলে,
 আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
 অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
 তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই ।

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
 চলেছিলাম সবাই হাতে হাতে ।
 এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
 হিয়া আমার উঠল কেমন করে
 জানি নে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোর
 সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে ।
 আর তো চলা হয় না সাথে সাথে ।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
 সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে ।
 রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাড়া-গড়া,
 মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,
 আলবালে জল সেচন করা
 উচ্চশাপা স্বর্ণটাপার গাছে ।
 পারি নে আর চলতে সবার পাছে ।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
 আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি ।
 লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
 হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,

একটি কথা পরান জুড়ে বাজে
 “ভালোবাসি, হায় রে ভালোবাসি।”
 সবার বড়ো হৃদয়-হরা হাসি।

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
 অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।
 মেষের পথের পথিক আমি আজি,
 হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি,
 অকূল-ভাসা তরী়ার আমি মাঝি
 বেড়াই ঘুরে অকারণের দোরে।
 তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

১৭ চৈত্র ১৩১২

বোলপুর

পথের শেষ

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
 পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
 সূর্য তপন পূব-গগনমূলে,
 নৌকা তপন বাধা নদীর কূলে,
 শিশির তপন শুকায় নিকো ফুলে,
 শিবালয়ে উঠল বেজে শাঁপ,
 পথের নেশা তপন লেগেছিল,
 পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা
 ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ—
 প্রভাতকালে অপার পানে চেয়ে
 কী মোহগান উঠতেছিল গেয়ে,
 উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
 বহুদূরের অরণ্য-পবিত্র,

নানা দিনের নানা পথিক-চলা
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ ।

ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের 'পরে ।
নিভ্য কেবল এগিয়ে চলার স্মৃতি,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উন্মুক্ত
অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে,
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে
বাহির হয়ে এলেম পথের 'পরে ।

বেলা এগন অনেক হয়ে গেছে,
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর ।
ভেবেছিলাম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখতে পাব কান্দে,
শুনতে যেন পাব নূতন সুর ।
তার পরে তো অনেক বেলা হল
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর ।

অনেক দোষে ক্লান্ত এগন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা ।
এগন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এগন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে পেয়ার তরী ভাসা ।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা ।

নীড় ও আকাশ

নীড়ে বসে গেয়েছিলেম

আলোছায়ার বিচিত্র গান।

সেই গানেতে মিশেছিল

বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।

দুপুরবেলার গভীর ক্লান্তি,

রাত্রিবেলার নিবিড় শান্তি,

প্রভাতকালের বিজয়যাত্রা,

মগ্ন মৌন সঙ্ঘাবেলার,

পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,

শ্রাবণ রাতে জলের ফোটা,

উন্মুখ শব্দটুকুন

কোটরমাঝে কাঁটের গেলার,

কত আভাস আসা-যাওয়ার,

ঝরঝরানি হঠাৎ ছাওয়ার,

বেগুনেনের ব্যাকুল বার্তা।

নিশ্চিন্ত জ্যোৎস্নারাতে,

ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ,

কত গভীর কত ছন্দ,

সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,

নীড়ে গাওয়া গানের সাথে।

আজ কি আমার গাইতে হবে

নীল আকাশের নির্জন গান?

নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে

ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরান?

গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,

শব্দবিহীন শূন্যপরে,

ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
 সন্ধিবিহীন নির্মমতায়
 মিশে যাব অবাধ সুখে,
 উড়ে যাব উর্ধ্বমুখে,
 গেয়ে যাব পূর্ণস্বরে
 অর্থবিহীন কলকথায় ?
 আপন মনের পাই নে দিশা,
 ভুলি শব্দা, হারাই তৃষা,
 যখন করি বান্ধনহার।
 এই আনন্দ-অমৃতপান ।
 তবু নীড়েই ফিরে আসি,
 এমনি কাদি এমনি হাসি
 তবুও এই ভালোবাসি
 আলোছায়ায় বিচিত্র গান ।

১২ চৈত্র [১৩১২]

বোলপুর

সমুদ্রে

সকালবেলায় ঘাটে যেদিন
 ভাসিয়ে দিলেম নৌকোপানি
 কোথায় আমার যেতে হবে
 সে-কথা কি কিছুই জানি ?
 শুধু শিকল দিলেম খুলে,
 শুধু নিশান দিলেম তুলে,
 টানি নি দাঁড়, ধরি নি হাল,
 ভেসে গেলেম শ্রোতের মুখে ;
 তীরে তরুর ডালে ডালে
 ডাকল পাশি প্রভাত কালে,

তীরে তরুর ছায়ায় রাখাগ
বাজায় বাঁশি মনের সুরে ।

তখন আমি ভাবি নাইকো
সূর্য যাবে অস্তাচলে,
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে
পড়ব এসে সাগর-জলে ;
ঘাটে ঘাটে তাঁরে তাঁরে
যে-তরী ধায় ধীরে ধীরে,
বাইতে হবে নিয়ে তাঁরে
নীল পাথারে একলা প্রাণে ।
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
মুখে আমার রৈল চেয়ে,
সিকু-শকুন উড়ে গেল
কুলে আপন কুলায় পানে ।

চলুক তরী তেউয়ের 'পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ ।
গাও রে আজি নিশিথরাতে
অকুল-পাড়ির আনন্দগান ।
যাক না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক না সাড়া
বাধনহারা হাওয়ার ডাকে ।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বৃকে দু-হাত মেলি
অস্তবিহীন অজানাকে ।

দিনশেষ

ভাঙা অতিথিশালা ।

ফাটা ভিতে অশথ-বটে

মেলেছে ডালপালা ।

প্রথর রোদে তপ্ত পথে

কেটেছে দিন কোনোমতে,

মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায়

মিলবে হেথা ঠাই ;

মার্ঠের 'পরে আঁধার নামে,

হাটের লোকে ফিরল গ্রামে,

হেথায় এসে চেয়ে দেখি

নাই যে কেহ নাই ।

কত কালে কত লোকে

কত দিনের শেষে

ধুয়েছিল পথের ধূলি

এইখানেতে এসে ।

বসেছিল জ্যোৎস্নারাত্রে

স্নিগ্ধ শীতল আড়িনাতে,

করেছিল সবাই মিলে

নানাদেশের কথা ।

প্রভাত হলে পাখির গানে

জেগেছিল নূতন প্রাণে,

ছুলেছিল ফুলের ভারে

পথের তরুণতা ।

আমি যেদিন এলেম, সেদিন

দীপ জ্বলে না ঘরে ।

বহুদিনের শিখার কালি

আঁকা ভিত্তির 'পরে ।

শুকজলা দিঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া ।
আমার দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলেন এসে ?
হায় রে বিজ্ঞান দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কায় ।

৮ বৈশাখ ১৩১৩

সমাপ্তি

বন্ধ হয়ে এল শ্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক প'ল তরী ;
নৌকা-বাওয়া এবার করো সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কী করি ।
এখন তবে চলো নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাবলাবনে ঐ দেখা যায় ভাঙা ।
ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেসে,
চলো এখন, যাবে যে দূরদেশে ।

এখন তোমায় তারার কীণালোকে
চলতে হবে মাঠের পথে একা,
গিরিকানন পড়বে কি আর চোখে,
কুটিরগুলি যাবে কি আর দেখা ?
পিছন হতে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আসবে আঁধার বেয়ে

অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে

আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে ।

চলো এবার ক'রো না আর দেরি—

মেঘের আভাস আকাশকোণে হেরি ।

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি

ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল ।

এখন ধরে আয় রে ফিরে মাঝি,

আড়িনাতে আসনপানি মেলো ।

ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা

জ্বালতে হবে সারারাতের আলো,

শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জ্বাল-বোনা,

গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দভালো ।

কিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন,

সকল হ'ক রে সকল সমাপন ।

১০ বৈশাখ ১৩১৩

বোলপুর

কোকিল

আজ বিকালে কোকিল ডাকে,

স্তনে মনে লাগে

বাংলাদেশে ছিলেম যেন

তিন-শ বছর আগে ।

সে দিনের সে শিঙ গভীর

গ্রামপথের মায়া

আমার চোখে ফেলেছে আজ

অশ্রুজলের ছায়া ।

পল্লীগানি প্রাণে ভরা,
 গোলায় ভরা ধান,
 ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে
 হাসির কলতান ।
 সন্ধ্যাবেলায় ছাদের 'পরে
 দপিন হাওয়া বহে,
 তারার আলোয় কারা ব'সে
 পুরাণ-কথা কহে ।

ফুলবাগানের বেড়া হতে
 হেনার গন্ধ ভাসে,
 কদমশাপার আড়াল থেকে
 চাদটি উঠে আসে ।
 বধু তপন বিনিয়ে খোঁপা
 চোপে কাজল আঁকে,
 মাঝে মাঝে বকুলবনে
 কোকিল কোথা ডাকে ।

তিন-শ বছর কোথায় গেল,
 তবু বুঝি নাকো
 আজো কেন ওরে কোকিল
 তেমনি সুরেই ডাক ।
 ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
 ফেটেছে সেই ছাদ,
 রূপকথা আজ কাহার মুখে
 শুনবে শাঁঝের চাঁদ ?

শহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
 সময় নাই রে হায়—
 ঘরিয়্যা চলেছি আজ
 কিসের ব্যর্থতায় !

আর কি বধু, গাঁথ মালা,
চোখে কাজল আঁক ?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক ?

২২ বৈশাখ [১৩১৩]

বোলপুর

দিঘি

জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাটল সারা দিন ।

সামনে আসে বাকাহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্মহীন ।

তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
এইটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এগন, সূর্য ডুবু ডুবু,
ঘরে কি মন রয় ?

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
নীতল জলরাশি,

নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তাঁয়ের তরু হতে
সকল ছায়া আসি ।

দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারা,
পথে চলতে বধু যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায় ।

শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
 অন্ধ উঠে ভরে ।
 ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
 কিরে এলেম ভেসে,
 সীতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
 সকল-হারা দেশে ।

ওগো বোবা, ওগো কালো, শুদ্ধ সুগন্ধীর
 গভীর ভয়ংকর,
 তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
 মাটির পিঙ্গর ।
 পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
 প্রাণের নিকেতন,
 হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
 দেখিছে দর্পণ ।

তারের কর্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
 নামি তোমার মাঝে ;
 এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছলছলিয়ে উঠে
 কানের কাছে বাজে ?
 ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
 বৃকের আলিঙ্গন
 আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাধা হতে
 কাড়িল মোর মন ।

শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করণ কাকলিতে
 ক্লান্ত আশার ডাক ।
 মান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
 উড়ে গেল কাক ।

মর্মরিয়া মর্মরিয়া বাতাস গেল মরে
বেগুনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মতো
দিঘির কালো জলে ।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ ।
রক্তবিহীন অঙ্ককারে পাথার শব্দ মেলে
গেল বকের বাঁক ।
পথে কেবল জোনাক জলে নাইকো কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে ।
দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে ।

২৭ বৈশাখ ১৩১৩

শান্তিনিকেতন

বাড়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
বাড় এল রে আজ,
মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
বাজ্ রে মৃদু বাজ্ ।
আজকে তোরা কী গাবি গান,
কোন রাগিণীর সুরে ?
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পুরে ।

বৃষ্টিধারায় কাপসা মাঠে
ডাকছে ধেমুদল,

তালের তলে শিউরে ওঠে
 বাধের কালো জল ।
 প'ড়ো বাড়ির ভাঙা ভিত
 ওঠে হাওয়ার হাঁক,
 শূন্যপেতের ওপার যেন
 এপারকে দেয় ডাক ।

আমাকে আজ কে খুঁজছে
 পথের থেকে চেয়ে ?
 জলের বিন্দু পড়ছে রে তার
 অলক বেয়ে বেয়ে ।
 মল্লারেতে মীড় মিলিয়ে
 বাজে আমার প্রাণ,
 দুয়ার হতে কে ফিরেছে
 না গেয়ে তার গান ?

আয় গো তোরা ধরেতে আয়,
 ব'স্ গো তোরা কাছে ।
 আজ যে আমার সমস্ত মন
 আসন মেলে আছে ।
 জলে স্থলে শূন্য হাওয়ায়
 ছুটেছে আজ কী ও ?
 ঝড়ের 'পরে পরান আমার
 উড়ায় উত্তরায় ।

আসবি তোরা কারা কারা
 বৃষ্টিধারার স্রোতে
 কোন্ সে পাগল পারাবারের
 কোন্ পরপার হতে ?
 আসবি তোরা ভিজে বনের
 কান্না নিয়ে সাথে,

আসবি তোরা গঙ্ঘরাজের
গাঁথন নিয়ে হাতে ।

ওরে আজি বহুদূরের
বহুদিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্‌খামে ?
ফুরিয়ে যাওয়ার ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে ।

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সকল ব্যাকুলতা
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
এলোমেলো কথা ।
দুলছে দূরে বনের শাখা,
ঝুটি পড়ে বেগে,
মেঘের ডাকে কোন্‌ অশান্ত
উঠিস জেগে জেগে ?

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

কলিকাতা

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি—

তোমার এবার সময় কখন হবে ?

সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—

শিখা তাহার জালিয়ে দেবে কবে ?

নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
 তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
 পথে পথে ছেড়েছি সব খোজা,
 কেনাবেচা নানান হাটে হাটে ।

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
 গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
 ভরেছি জুঁই পদুপাতার পুটে
 তোমার করপদুদলের লাগি ।
 রেখেছি আজ শান্ত শীতল ক'রে
 অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে !
 সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে
 তোমার এবার সময় কখন হবে ।

আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
 নদীর পারে নারিকেলের বনে,
 দেবালয়ের বিজ্ঞান আড়িনাতে
 পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে ।
 দপিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে
 আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে ;
 বাধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
 ঘাটের 'পরে মরবে মাথা কুটে ।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
 ধমধমিয়ে আসবে যখন জল,
 বাতাস যখন পড়বে তুলে তুলে,—
 চন্দ্র যখন নামবে অন্তাচল,—

শিথিল তব্ব তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
 চরণতলে পড়বে লুটে তবে ।
 বসে আছি শয়ন পাতি ভুমে
 তোমার এবার সময় হবে কবে ?

১৭ বৈশাখ [১৩১৩]

কলিকাতা

গান শোনা

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
 শোনাই কখন বলো ?
 ভরা চোখের মতো যখন নদী
 করবে ছল ছল,
 ঘনিষে যখন আসবে মেঘের ভার
 বহুকালের পরে,
 না যেতে দিন সজল অঙ্কুর
 নামবে তোমার ঘরে ;
 যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে,
 তবুও বেলা আছে,
 সাধি তোমার আসত যারা রাতে
 আসে নি কেউ কাছে ;
 তখন আমায় মনে পড়ে যদি,
 গাইতে যদি বল,—
 নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী
 করবে ছল ছল ।

জ্ঞান আলোয় দখিন বাতায়নে
 বসবে তুমি একা—
 আমি গাব বসে ঘরের কোণে
 যাবে না মুখ দেখা ।

ফুরাবে দিন আঁধার ঘন হবে,
 বৃষ্টি হবে গুরু,
 উঠবে বেজে মুহূগভীর রবে
 মেঘের গুরু গুরু ।

ভিজ়ে পাতার গন্ধ আসবে ঘরে,
 ভিজ়ে মাটির বাস,
 মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে
 বনের নিশ্বাস ।

বাদল-সীয়ে আঁধার বাতায়নে
 বসবে তুমি একা,
 আমি গেয়ে যাব আপন মনে
 যাবে না মুখ দেখা ।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে,
 বাড়বে অঙ্ককার,
 নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেঘে
 ভেদ হবে না আর ;
 কাসরঘণ্টা দূরে দেউল হতে
 জলের শব্দে মিশে

আঁধার পথে ঝ'ড়ে হাওয়ার শ্রোতে
 ফিরবে দিশে দিশে ।

শিরীষ ফুলের গন্ধ থেকে থেকে
 আসবে জলের ছাঁটে,
 উচ্চরবে পাইক যাবে হৈকে
 গ্রামের শূঁছ বাটে ।

জলের ধারা ঝরবে বাঁশের বনে,
 বাড়বে অঙ্ককার,
 গানের সাথে বাদলা রাতের সনে
 ভেদ হবে না আর ।

ও-ঘর হতে যবে প্রদীপ জ্বলে
 আনবে আচম্বিত,
 সেতারখানি মাটির 'পরে ফেলে
 ধামাব মোর গীত ।
 হঠাৎ যদি মুখ ফিরিয়ে তবে
 চাহ আমার পানে
 এক নিমিষে হয়তো বুঝে লবে
 কী আছে মোর গানে ।
 নামায়ে মুখ নয়ন করে নিচু
 বাহির হয়ে যাব
 একলা ঘরে যদি কোনো কিছ
 আপন মনে ভাব ।
 ধামায়ে গান আমি চলে গেলে,
 যদি আচম্বিত
 বাদল-রাতে আঁধারে চোপ মেলে
 শোন আমার গীত ।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

বোলপুর

জাগরণ

কুম্পক্ষে আধখানা চাঁদ
 . উঠল অনেক রাতে,
 খানিক কালো পানিক আলো
 পড়ল আঁধিনাতে ।
 ওরে আমার নয়ন আমার
 নয়ন নিদ্রাহারা,
 আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
 কত গুনবি তারা ?
 সাড়া কারো নাই রে সবাই
 ঘুমায় অকাতরে ।

প্রদীপগুলি নিবে গেল
 ছয়ার দেওয়া ঘরে ।
 তুই কেন আজ বেড়াস কিরি
 আলোয় অন্ধকারে ?
 তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে
 বনপথের পারে ?

শব্দ কোথাও শুনতে কি পাস
 মাঠে তেপাস্থরে ?
 মাটি কোথাও উঠছে কৈপে
 ঘোড়ার পদভরে ?
 কোথাও ধুলো উড়ছে কি রে
 কোনো অকাশকোণে ?
 আগুনশিখা যায় কি দেখা
 দূরের আম্রবনে ?

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
 লিপন পেয়েছিলি ?
 বৃকের কাছে লুকিয়ে রেপে
 শাস্তি হারাইলি ?
 নাচে রে তাই রক্ত নাচে
 সকল দেহমাঝে,
 বাজে রে তাই কী কথা তোর
 পাজর জুড়ে বাজে ।

আজিকে এই খণ্ড চাঁদের
 ক্ষীণ আলোকের 'পরে
 ব্যাকুল হয়ে অশান্ত প্রাণ
 আঘাত করে মরে ।

কী লুকিয়ে আছে ওরে,
 কী রেখেছে ঢেকে,
 কিসের কাঁপন কিসের আভাস
 পাই যে থেকে থেকে ?

ওরে কোথাও নাই রে হাওয়া,
 স্তব্ধ বাঁশের শাখা ;
 বালুতটের পাশে নদী
 কালির বর্ণে আঁকা ।
 বনের 'পরে চেপে আছে
 কাহার অভিশাপ,---
 ধরণীতল মূর্ছা গেছে
 লয়ে আপন তাপ ।

ওরে হেথায় আনন্দ নেই
 পুরানো তোর বাড়ি ।
 ভাঙা ছুয়ার বাহুড়কে ওই
 দিয়েছে পপ ছাড়ি ।
 সঙ্ক্যা হতে ঘুমিয়ে পড়ে
 যে যেথা পায় স্থান ।
 জাগে না কেউ বাঁধা হাতে,
 গাহে না কেউ গান ।

হেথা কি তোর ছুয়ারে কেউ
 পৌঁছোবে আজ রাতে ?
 এক হাতে তার ধরজা তুলে
 'আলো' আরেক হাতে ।
 হঠাৎ কিসের চকলতা
 ছুটে আসবে বেগে,
 গ্রামের পথে পাপিরা সব
 গোয়ে উঠবে জেগে ।

উঠবে যদও বেজে বেজে
 গর্জি গুরু গুরু
 অন্ধে হঠাৎ দেবে কাঁটা,
 বক্ষ দুক দুক ।
 ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি,
 ওরে শাস্তিহারা,
 আঁধার পপে চেয়ে চেয়ে
 কার পেয়েছিস সাড়া ?

১৭ জুলাই ১৩১৩

বোলপুর

হারাদ্বন্দ্ব

বিশি যদিদি ক্ষান্ত দিলেন
 সৃষ্টি করার কাজে
 সকল তারা উঠল ফুটে
 নীল আকাশের মাঝে ;
 নবীন সৃষ্টি সামনে রেপে
 স্বরসভার তলে
 ছায়াপথে দেবতা সবাই
 বসেন দলে দলে ।
 গাহেন তারা, “কী আনন্দ ।
 এ কী পূর্ণ ছবি ।
 এ কী মন, এ কী হৃদয়,
 গ্রহ চন্দ্র রবি ।”

হেনকালে সভায় কে গো
 হঠাৎ বলি উঠে—
 “জ্যোতির মালায় একটি তারা
 কোণায় গেছে টুটে ।”

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
 থেমে গেল গান,
 হারা তারা কোথায় গেল
 পড়িল সন্ধান ।
 সবাই বলে, “সেই তারাতেই
 স্বর্গ হতে আলো—
 সেই তারাটাই সবার বড়ো,
 সবার চেয়ে ভালো ।”

সেদিন হতে জগৎ আছে
 সেই তারাটির খোজে,
 তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
 চক্ষু নাহি বোজে ।
 সবাই বলে, “সকল চেয়ে
 তারেই পাওয়া চাই ।”
 সবাই বলে, “সে গিয়েছে
 ভুবন কানা তাই ।”
 শুধু গভীর রাত্রিবেলায়
 শুক তারার দলে—
 “মিথ্যা খোজা, সবাই আছে”
 নীরব হেসে বলে ।

চাঞ্চল্য

নিশাস রূধে হু-চক্ষু মুদে
 তাপসের মতো যেন
 শুক ছিলি যে ওরে বনভূমি
 চঞ্চল হলি কেন ?

হঠাৎ কেন রে হুলে ওঠে শাখা,
যাবে না ধরায় আর ধরে রাখা,
ঝটপট করে হানে ঘেন পাখা
খাঁচায় বনের পাখি ।
ওরে আমলকী, ওরে কদম্ব,
কে তোদের গেল ডাকি ?

“ঐ যে ঈশানে উড়েছে নিশান,
বেজেছে বিয়াধ বেগে—
আমার বরষা কালো বরষা যে
ছুটে আসে কালো মেঘে ।”

ওরে নীলজল অতল অটল
ভরা ছিল কুলে কুলে,
হঠাৎ এমন শিহরি শিহরি
উঠিলি কেন রে হুলে ?
তালতরুছায়া করে টলমল,
কেন কলকল কেন ছলছল,
কী কথা বলিতে হলি চঞ্চল,
ফুটিতে চাহে না বাক,—
কাঁদিয়া হাসিয়া সাড়া দিতে চাস
কার গুনেছিল ডাক ?

“ঐ যে আকাশে পূবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে,—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে ।”

পরান আমার ঋষিয়া দুয়ার
আপনার গৃহমাঝে

ছিল এতদিন বিশ্রামহীন,
কী জানি কত কী কাজে ।

আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর,
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাজর,
অকারণে বহে নয়নের লোর,
কোথা যেতে চাস ছুটে ?
কে রে সে পাগল ভাঙিল আগল
কে দিল দুয়ার টুটে ?

“জানি না তো আমি কোথা হতে নামি,
কী ঝড়ে আঘাত লেগে,
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে ।”

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে ?

যারা ধূলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তারা তোমায় ভাবে মিছে ।

আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাপি ডালি—

ওগো যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি ।

ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
চোখে লাগছে ঘুমঘোর ;

সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর ।

আমি বসে আছি বসনপানি টেনে মুখের 'পরে
যেন ভিখারিনীর মতো
কেহ শুধায় যদি "কী চাও তুমি", থাকি নিরুত্তরে
করি ছুটি নয়ন নত।

আজি কোন্‌ লাজে বা বলব আমি তোমায় শুধু চাহি,—
আমি বলব কেমন করে—

শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনীদিন বাহি,—
তুমি আসবে আমার তরে?

আমার দৈন্ত্যপানি গড়ে রাগি, রাজৈশ্বৰ্যে তব
তারে দিব বিসর্জন,

ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রৈল সংগোপন।

আমি স্তূদূরপানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—

তুমি হঠাৎ কপন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বলে।

তোমার রথের 'পরে সোনার দরজা বলবে বলমল
সাথে বাজবে দীর্ঘশির তান,—

তোমার প্রতাপভরে বসুন্ধরা করবে টলমল
আমার উঠবে নেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আসবে পথে।

হেসে হু-হাত ধরে ধূলী হতে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।

আমার ভূষণবিহীন মলিনবেশে ভিখারিনীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বামপাশে,

তখন লতার মতো কীপব আমি গর্বে সূখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।

ওগো সময় বয়ে যাচ্ছে চলে রয়েছে কান পেতে
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি ।
তোমার এ-পথ দিয়ে কত না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি ।
তবে তুমিই কি গো নীর বহয়ে রবে ছায়ার তলে
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে
তারে রাখবে মলিন বেশে ?

অনুমান

পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই
আধেক আঁপি মুদিয়ে চাই,
ভয়ে চাই নে ফিরে ।
আমি দেখি যেন আপন মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আসছ তুমি ধীরে ।
যেন চিনতে পারি সেই অশাস্ত
তোমার উত্তরীয়ার প্রাস্ত
ওড়ে হাওয়ার 'পরে ।
আমি একলা বসে মনে গনি
শুনছি তোমার পদধ্বনি
মর্মরে মর্মরে ।
ভোরে নয়ন মেলে অরুণরাগে
যখন আমার প্রাণে জাগে
অকারণের হাসি,
যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে
কোন্ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারশি,—

- যখন নব মেঘের সজল ছায়া
যেন রে কার মিলন-মায়ী
ঘনায় বিশ্ব জুড়ে,
যখন পুলকে নীল শৈল ঘেরি
বেজে ওঠে কাহার ডেরী,
ধজা কাহার উড়ে,—
- তখন মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
সন্দেহ আর কেই বা মানে,
ভুল যদি হয় হ'ক ।
- ওগো জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে झুড়াল চোখ ।
- সে কি তখন আমি ছিলাম এক!,
কেউ কি মোরে দেয় নি দেথা ?
কেউ আসে নাই পিছে ?
- তখন আড়াল হতে সহাস অঁগি
আমার মুখে চায় নি নাকি ?
এ কি এমন মিছে ?

বর্ষাপ্রভাত

- ওগো এমন সোনার মায়াগানি
কে যে গড়েছে ।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে ।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
গাছে পালায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাসরাগে
কী গান ধরেছে ।

আজ বিশ্বদেবীর ঘরের কাছে
কোন্ সে ভিখারি
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
দু-হাত বিখারি,—
আজল ভরে সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিতে,
লুটিয়ে গেল পৃথিবীতে,
এ কী নেহারি ।

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপুরীতে
মৌমাছির লেগেছিল
মধু চুরিতে ।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভায়ে,
সোনার মধু লক্ষধারে
লাগে ঝুরিতে ।

আজ সকাল হতেই পবন এল,—
লক্ষ্মী একেলা
অরুণরাগে পাতবে আসন
প্রভাত বেলা ।
শুনে দিগ্বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়মধুপ জুটে
করেছে মেলা ।

ও কি সুরপুরীর পর্দাবানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে ?

কে জানে গো কী উল্লাসে
হেরেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে দুলে ।

ওগো কাহারে আজ জানাই, আমি—
—কী আছে ভাষা—
আকাশপানে চেরে আমার
মিটেছে আশা ।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই নে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা ।

বর্ষা-সন্ধ্যা

আমায় অমনি খুশি করে রাখে
কিছুই না দিয়ে,—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে ।
এমনি ধূসর মাঠের পারে,
এমনি সীতের অঙ্ককারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর স্বা দিয়ে ।

আমায় অমনি রাখে বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে ।

আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
কিছুই না করি',
হৃ-হাত মেলে দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

- আষাঢ়-রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল আঁকড়ি।
- আমি রাতের সাথে মিশিয়ে রব
কিছুই না করি।
- আজ বাদল হাওয়ায় কোথা রে জুঁই
গন্ধে মেতেছে ?
লুপ্ত তারার মালা কে আজ
লুকিয়ে গৈধেছে ?
আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশপারে,
কে আজি এই অন্ধকারে
শয়ন পেতেছে ?
- আজ বাদল হাওয়ায় জুঁই আপনার
গন্ধে মেতেছে।
- ওগো আজকে আমি স্থপে রব
কিছুই না নিয়ে
আপন হতে আপন মনে
স্বধা ছানিয়ে।
বনে হতে বনান্তরে
ঘনধারায় বৃষ্টি ঝরে,
নিদ্রাবিহীন নয়ন 'পরে
স্বপন বানিয়ে।
- ওগো আজকে পরান ভরে লব
কিছুই না নিয়ে।

“সব-পেয়েছি”র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো
 নাই রে কোঠাবাড়ি,
 ছুয়ার খোলা পড়ে আছে,
 কোথায় গেল ঘরী?
 অশশালায় অশ কোথায়
 হস্তিশালায় হাতি,
 মলটিকদীপে গন্ধতৈলে
 জ্বালায় না কেউ বাতি।
 রমণীরা মোতির সিঁথি
 পরে না কেউ কেশে,
 দেউলে নেই সোনার চূড়া
 সব-পেয়েছির দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
 গাছের ছায়াতলে,
 স্বচ্ছত্তরল শ্রোতের ধারা
 পাশ দিয়ে তার চলে।
 কুটিরেতে বেড়ার 'পরে
 দোলে ঝুমকা লতা ;
 সকাল হতে মৌমাছির
 বাস্তু ব্যাকুলতা।
 ভোরের বেলা পথিকেরা
 কী কাজে যায় হেসে—
 সাজে ফেরে বিনা-বেতন
 সব-পেয়েছির দেশে।

আড়িনাতে ছপুর বেলা
 মুহুরকল্প গেয়ে

বকুলতলার ছায়ায় বসে
 চরকা কাটে মেয়ে ।
 মার্চে মার্চে ঢেউ দিয়েছে
 নতুন কচি খানে,
 কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি
 হঠাৎ আসে প্রাণে ।
 নীল আকাশের হৃদয়খানি
 সবুজ বনে মেশে,
 যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
 সব-পেয়েছির দেশে ।

সদাগরের নৌকা যত
 চলে নদীর 'পরে—
 হেথায় ঘাটে বাধে না কেউ
 কেনাবেচার তরে ।
 সৈন্যদলে উড়িয়ে ধরজা
 কাঁপিয়ে চলে পথ ;
 হেথায় কত নাহি ধামে
 মহারাজের রথ ।
 এক রজনীর তরে হেথা
 দূরের পাশ্ব এসে
 দেখতে না পায় কী আছে এই
 সব-পেয়েছির দেশে ।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
 নাইকো ঘাটে গোল,
 গুরে কবি এইখানে তোর
 কুটিরখানি তোল ।
 ধুয়ে ফেল রে পথের ধুলো,
 নামিয়ে দে রে বোকা,

বেঁধে নে তোর সেতারখানা
 রেখে দে তোর খোঁজা ।
 পা ছড়িয়ে বসু রে হেথায়
 সারাদিনের শেষে,
 তারায়-ভরা আকাশতলে
 সব-পেয়েছির দেশে ।

সার্থক নৈরাশ্য

তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা
 নিভ্রা ছিল না চোখের কোণে ;
 আঘাত আধারে আকাশে মেঘের মেলা,
 কোথাও বাতাস ছিল না বনে ।
 বিরাম ছিল না তপ্ত শয়ন তলে,
 কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে ;
 হু-হাত বাড়িয়ে কী জানি কী কথা বলে,
 কাঙাল চায় যে কারে কে জানে ।
 দিল আধারের সকল রক্ত ভরি
 তাহার ক্ষুধা ক্ষুধিত ভাষা ;
 মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী
 আজি হারাল রে সব আশা ।

অনাথ জগতে যেন এক স্থপ আছে,
 তাও জগৎ বুঁজে না মেলে ;
 আধারে কখন সে এসে যায় গো পাছে
 বুকে রেখেছে আগুন জ্বলে ।
 দাও দাও বলে ইকিছু সুদূরে চেয়ে
 আমি ফুকরি ডাকিছু কারে ।
 এমন সময়ে অরুণ-তরণী বেয়ে
 প্রভাত নামিল গগনপারে ।

পেয়েছি পেয়েছি নিবাও নিশার বাতি,
 আমি কিছুই চাহি নে আর ।
 ওগো নিষ্ঠুর শূন্য নীরব রাত্তি
 তোমায় করি গো নমস্কার ।
 বাঁচালে, বাঁচালে,—বধির আঁধার তব
 আমায় পৌঁছিয়া দিল কূলে ।
 বঞ্চিত করি যা দিয়েছ কারে কব,
 আমায় জগতে দিয়েছ তুলে ।

ধন্য প্রভাতরবি,
 আমার লহ গো নমস্কার ।
 ধন্য মধুর বায়ু
 তোমায় নমি হে বারম্বার ।
 ওগো প্রভাতের পাপি
 তোমার কল-নির্মল স্বরে
 আমার প্রণাম লয়ে
 বিছাও দূর গগনের 'পরে ।
 ধন্য ধরার মাটি
 জগতে ধন্য জীবের মেলা ।
 ধূলায় নমিয়া মাথা
 ধন্য আমি এ প্রভাতবেলা ।

প্রার্থনা

আমি বিকাব না কিছুতে আর
 আপনারে ।
 আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
 সবার সাথে এক-সায়ে ।

সকালবেলায় আলোর মাঝে
 মলিন যেন না হই লাজে,
 আলো যেন পশিতে পায়
 মনের মধ্যে এক-বারে ।
 বিকাব না বিকাব না
 আপনারে ।

আমি বিশ্ব সাথে রব সহজ-
 বিশ্বাসে ।
 আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
 প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে ।
 পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
 পুণ্য হবে সর্ব দেহ,
 গাছের শাপা উঠবে ভুলে
 আমার মনের উল্লাসে ।
 বিশ্বে রব সহজ স্মৃতি
 বিশ্বাসে ।

আমি সবায় দেখে খুশি হব
 অন্তরে ।
 কিছু বেসুর যেন বাজে না আর
 আমার বীণাযন্ত্রে ।
 যাহাই আছে নয়ন ভরি
 সবই যেন গ্রহণ করি,
 চিন্তে নামে আকাশ-গলা
 আনন্দিত মস্ত রে ।
 সবায় দেখে তৃপ্ত রব
 অন্তরে ।

থেয়া

তুমি এপার-ওপার কর কে গো
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে,
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
তরণী যাও বেয়ে,
দেখে মন আমার কেমন স্তরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হতে সোনার আভা
পরান ফেলে ছেয়ে,
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো থেয়ার নেয়ে ।

আমার মুখে ক্ষণতরে
 যদি তোমার আঁখি পড়ে
 আমি তখন মনে করি
 আমিও যাই ধৈয়ে,
 ওগো খেয়ার নেয়ে ।

১৫ আষাঢ় ১৩১২

নাটক ও প্রহসন

রাজা

রাজা

১

অঙ্ককার ঘর

রানী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা : আলো, আলো কই ? এ-ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না ?

সুরঙ্গমা : রানীমা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্তে কি একটা ঘরেও অঙ্ককার রাখবে না ?

সুদর্শনা : কোথাও অঙ্ককার কেন থাকবে ?

সুরঙ্গমা : তা হলে যে আলোও চিনবে না অঙ্ককারও চিনবে না ।

সুদর্শনা : তুই যেমন এই অঙ্ককার ঘরের দাসী তেমনি তোর অঙ্ককারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না : বল্ তো এ-ঘরটা আছে কোথায় । কোথা দিয়ে এখানে 'আমি কোথা' দিয়ে বেরোই প্রতিদিনই দাঁড়া লাগে ।

সুরঙ্গমা : এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি । তোমার জন্তেই রাজা বিশেষ করে করেছেন ।

সুদর্শনা : তার ঘরের অভাব কী ছিল যে, এই অঙ্ককার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন ।

সুরঙ্গমা : আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অঙ্ককারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন ।

সুদর্শনা : না, না, আমি আলো চাই—আলোর জন্তে অস্থির হয়ে আছি । থেকে আমি আমার পলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস ।

সুরঙ্গমা : আমার সাধ্য কী মা । যেখানে তিনি অঙ্ককার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব !

সুদর্শনা : এত ভক্তি তোর ? অবচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন । সে কি সত্যি ?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত—মদ খেত আর জুয়ো খেলত।

সুদর্শনা। তুই কী করতিস ?

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা^১ ইচ্ছে করেই আমাকে সে-পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি ?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল—ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন ?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ ফোঁটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল।

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম—সে-পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মত কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত !

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর ! কী নিষ্ঠুর ! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা !

সুদর্শনা। সেই রাজার পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে ?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা ! এত অটল এত কঠোর বলেই এত নিষ্ঠুর এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে ?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন ?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুঃস্থপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বৈচে গেলুম, বৈচে গেলুম, জয়ের মতো বৈচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল আমার রাজাকে দেখতে কেমন ? আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন অন্ধকারেই যান। কতলোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না—সবাই যেন কী একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর ? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী? সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। না রানীমা। সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ওই একরকম। কিছু বোকা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অল্পবয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্তিকে আমার স্তপদুংগকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বলব—সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য! যখন বাপের কাছে থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমূগ্ধ হল যে কটাক্ষও তাঁর দিকে তাকাতো চাইতুম না। তার পরে এগুন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয় এই আমার টের—আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝতে পারি নে তবু শুনেতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস তাঁকে দেখবই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল তাঁর মেয়ে থাকে স্বামীরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি আমার স্বামীকে দেখতে কেমন—তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না, বলেন, আমি কি দেখেছি—আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি। যিনি স্তপদুংগের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

সুরঙ্গমা। ওই যে মা একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া?

সুরঙ্গমা। ওই যে গন্ধ পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খুলেছে—তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অঙ্ককার ধরের সেবিকা কিনা তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্মে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা । আমার যদি তোর মতো হয় তাহলে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা । হবে মা হবে । তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছে সেইজন্তে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে । সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে ।

সুদর্শনা । দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে ? রানী হয়ে আমার হয় না কেন ?

সুরঙ্গমা । আমি যে দাসী সেইজন্তেই এত সহজ হল । আমাকে যেদিন তিনি এই অঙ্ককার ঘরের ভার দিয়ে বললেন, সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেগো, এই তোমার কাজ, তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—‘আমি মনে মনেও বলি নি যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও । তাই যে-কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না । ওই যে তিনি আসছেন—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন । প্রভু ।

বাহিরে গান

পোলো পোলো দ্বার রাগিরো না আর

বাহিরে আমায় দাঁড়ায় ।

দাও সাড়া দাও এই দিকে চাও

এস দুই বাহু বাড়ায় ॥

কাজ হয়ে গেছে সারা,

উঠেছে সঙ্ক্যা তারা,

আলোকের পেয়া হয়ে গেল দেয়া

অন্তসাগর পারায় ॥

এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে

বাহিরে রেগো না দাঁড়ায় ॥

ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,

সেজেছ কি গুটি দুকুলে ?

বৈধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল

গেঁথেছ কি মালা মুকুলে ?

ধেম্‌ এল গোষ্ঠে ফিরে,

পাখিরা এসেছে নাড়ে,

পথ ছিল বত জুড়িয়া জগত,
 আধারে গিয়েছে হারিয়ে ॥
 তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
 বাহিরে যেখো না দাঁড়ায়ে ॥

সুরঙ্গমা । তোমার দুয়ার কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা ? ও তো বন্ধ নেই কেবল
 ভেজানো আছে, একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে । সেটুকুও করবে না ? নিজে
 উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুকবে না ?

গান

এ যে মোর আবরণ
 যুটাত কতক্ষণ ?
 নিশ্বাস-বায়ে উড়ে চলে যায়
 তুমি কর যদি মন ।
 যদি পড়ে পাকি ভূমে
 ধুলায় ধরণী চূমে,
 তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে আগি
 এ কেমন তব পণ ?
 রপের ঢাকার রবে
 জাগাও জাগাও সবে,
 আপনার ঘরে এস বলভরে
 এস এস গোরবে ।
 ঘুম টুটে যাক চলে,
 চিনি যেন প্রভু বলে ;
 ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
 চরণে সমর্পণ ॥

রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না ।

সুদর্শনা । আমি এ-বরের অঙ্ককারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাই নে—কোথায়
 দরজা কে জানে । তুই এখানকার সব জানিস—তুই আমার হয়ে খুলে দে ।

[সুরঙ্গমার দ্বার উদ্ঘাটন, প্রণাম ও প্রস্থান]

১ রাজাকে এ নাটকের কোথাও রহস্যকে দেখা গাইবে না ।

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন ?

রাজা । আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও ? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন ?

সুদর্শনা । সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি ঠানী হয়ে দেখতে পাব না ?

রাজা । কে বললে দেখতে পায় ? মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি ।

সুদর্শনা । তা হ'ক, আমাকে দেখা দিতেই হবে ।

রাজা । সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে ।

সুদর্শনা । সহ্য হবে না—তুমি বল কী ! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না ? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয় । তোমার ওই সুগন্ধ উত্তরীয়াটা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল । তোমাকে দেখলে আমি সহিতে পারব না এ কী কথা !

রাজা । আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না ?

সুদর্শনা । এক রকম করে আসে বই কি ! নইলে বাঁচব কী করে ?

রাজা । কী রকম দেখেছ ?

সুদর্শনা । সে তো একরকম নয় ! নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজ্যের রূপটি বৃষ্টি এইরকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোপ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মূণের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা । আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্থান করে তোমার শেকালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ-ফুলের মালা, তোমার বৃকে শ্বেত-চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীয়, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু ; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তাহলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব । আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক-দূরের জন্তে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাজ্ঞাত ফুলের গন্ধের জন্তে বৃকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে বুঝে বুঝে মরবে । আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের

উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হ'ক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি এই অঙ্ককারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

রাজা। সে-ভয়ে দোষ কী? প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অঙ্ককারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বইকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ?

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অঙ্ককার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে; কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কতবড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেপানে কি শুধু তুমি!

সুদর্শনা। বলা বলা এমন করে বলা! আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে,—যেন অনাদিকালের গান, যেন জয়-জয়ান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ? না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর;—তোমার গানে সেই অলোক-সুন্দরীকে দেখতে পাই—সে কি আমার মধ্যে, না তোমার মধ্যে? তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও না! তোমার কাছে অঙ্ককার বলে কি কিছুই নেই? সেইজন্মেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই যে কঠিন কালো লোহার

মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘূমের মতো ঘূঁচার মতো ঘূতুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই! তবে এ-জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা দেখো—কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না—আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী।

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব—লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। কী প্রভু?

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন,—কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফলের কেশরের কাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে-লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁচা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে? তুমি আমার ভেতর রাজা নও! রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে যায় রে যায়,
 তোমার চপল আঁপি বনের পাণি বনে পালায়।
 আজি হৃদয় মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
 তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
 তবে ঘুচে গো ত্বর ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
 আহা আজি সে আঁপি বনের পাণি বনে পালায়।
 চেয়ে দেখিস নারে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়।
 তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায় !
 আজি ফুলের বাসে সুপের হাসে আকুল গানে
 চির-বসন্ত যে তোমারি বোঁজে এসেছে প্রাণে।
 তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগল প্রায়,
 তোমার চপল আঁপি বনের পাণি বনে পালায়।

২

পদ

প্রথম পদিক। ওগো মশায় !

প্রহরী। কেন গো ?

দ্বিতীয়। রাত্তা কোথায় ? আমরা বিদেশী, আমাদের রাত্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাত্তা ?

তৃতীয়। ওই যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে ?

প্রহরী। এখানে সব রাত্তাই রাত্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও। [প্রস্থান

প্রথম। শোনো একবার কথা শোনো। বলে সবই এক রাত্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী ?

দ্বিতীয়। তা ভাই রাগ করিস কেন ? যে-দেশের যেমন ব্যবস্থা ! আমাদের দেশে তো রাত্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁদা। আমাদের রাজা

বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ-দেশে উলটো, যেতেও কেউ চেষ্টা না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত !

প্রথম। ওহে জনার্দন, তোমার ওই একটা বড়ো দোষ।

জনার্দন। কী দোষ দেখলে ?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল ? বলো তো ভাই কোঁড়িল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

কোঁড়িল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনার্দনের ওই একরকম ত্যাগী বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ঠুকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি গেয়ে-গুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম !

কোঁড়িল্য। সে-ও তো ওই জনার্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুপ্তিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জ্ঞান—কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গাণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্তে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়; সে এক বিবশ মুশকিল; শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশে যে ছুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আটাতাঁট ! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ।

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা !

কোঁড়িল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দন বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো।

[প্রস্থান

বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—

এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।

দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।

নব শ্রামল শোভন রথে
এস বকুল-বিছানো পথে,
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেগু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।

এস ঘন পল্লবপুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে।
এস বনমল্লিকাকুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে।

মৃদু মধুর মদির হেসে
এস পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস ॥

[প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজ্যের দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি একদিনও তাকে দেখলুম না এ কি কম দুঃখের কথা।

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি কবে কার কথা কাকে বলেছি। ওই

যে তোমাদের রাহক দাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি? সব তো জান।

দ্বিতীয়। জানি বই কি, সেইজন্তেই তো বলছি—কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি—নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয়। তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ। বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্তে অত ব্যস্ত হও কেন? কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সামলে বেড়ায়?

বিরূপাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্তেই—তা বেশ নাই বললেম। আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই। রাজা দেখা দেন না সে-কথাটা তোমারাই তুললে—তাই তো আমি বললেম, সাথে দেখা দেন না।

প্রথম। ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেলো না।

বিরূপাক্ষ। তা তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই—তোমরা হলে বন্ধু মাতুল। (মুহূৰ্ত্তে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্তে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই তো বটে। আমরা বলি, ভালোরে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন। কিছু না হ'ক একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও যে বুঝি রাজা বলে একটা কিছু আছে। বিরূপাক্ষের কথাটা মনে নিচ্ছে হে।

তৃতীয়। কিছু মনে নিচ্ছে না—ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে।

বিরূপাক্ষ। কী বললে হে, বিপ্ত, তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি?

বিশ্ববন্ধু। তা বলতে চাই নে কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না—এতে রাগই কর আর যাই কর।

বিরূপাক্ষ। তুমি মানবে কেন? তুমি তোমার বাপখুড়োকেই মান না—এত বুদ্ধি তোমার। এ রাজত্বে রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তাহলে কি এখানে তোমার ঠাই হত? তুমি তো নাস্তিক বললেই হয়।

বিশ্ববন্ধু। ওহে আস্তিক, অল্প রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে।

বিরূপাক্ষ। দেখো বিপ্ত, মুখ সামলে কথা কও।

বিশ্ববন্ধু। মুখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই।

প্রথম। চূপ চূপ এ-সব ভালো হচ্ছে না। আমাদের স্তব্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই।

[প্রস্থান]

ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে? মালাটি কোন্ নিপুণ হাতের গাঁথা?

ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি? কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েছেই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে?

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকুরনদিদি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাপে বটে! পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন?

ঠাকুরদা। ওরে তোদের ঠাকুরনদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে-আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা কবি কী বলছেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বলছেন,

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,

সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদাদা)

যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা

সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদাদা)

ঠাকুরদা। আরে চূপ চূপ। এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে?

প্রথম। কেন ধরলুম জান না?

গান

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি

তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,

পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি

যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে,

যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি

সেখানে তোমার মতন খোলা কে—

ঠাকুরদাদা।

ঠাকুরদা। যদি তোরা তাদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তাহলে শুনতে পেতিস এই কাল্ভন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি পুরোনো জিনিসমাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগরাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে।

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন? চলো আমাদের দক্ষিণ বনে।

ঠাকুরদা। ভাই আমার ওই দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদ্যবস্ত্রে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে, সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন? কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ওইটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজ্য ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! এই যে অল্প রাজ্যগুলো তারা তো উৎসবটাকে দলে মলে ছারখার করে দিলে—তাদের হাতিমোড়া-লোকলশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বপ্নে।

(আমরা সবাই রাজা)

আমরা যা খুশি তাই করি

তবু তাঁর খুশিতেই চরি,

আমরা নই বাধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বপ্নে।

(আমরা সবাই রাজা)

রাজা সব্বারে দেন মান
সে মান আপনি কিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কেনো অসতো,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ।
(আমরা সব্বাই রাজা)

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ।
(আমরা সব্বাই রাজা)

তৃতীয় । কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অন্যায়সে তাঁর নামে যা খুলি বলে সেইটে অসঙ্গ হয় ।

প্রথম । এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শান্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মূণ বন্ধ করবারই নেই ।

ঠাকুরদা । ওর মানে আছে ; প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না । স্বর্ষের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূঁচ দিয়ে ফুঁ দিলে সূঁচ অগ্নান-হয়েই থাকেন ।

বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববসু । এই যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না ।

ঠাকুরদা । এতে রাগ কর কেন বিশ্ব । ওর রাজা কুৎসিত বই কী, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন ? স্বয়ং ওর বাপ-মাও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি । ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে ।

বিরূপাক্ষ । ঠাকুরদা, আমি নাম করব না কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি থাকে বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই ।

ঠাকুরদা । নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো ।

বিরূপাক্ষ । না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি ।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে। একে তো যা না বলবার তাই বলে, তার পরে আবার সেটা প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও না।

ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ ক'রো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও-বেচারি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিক্রপাঙ্ক, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে।

[প্রস্থান]

বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিয়া। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেপো ভাই কৌণ্ডিয়া, আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিয়া। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা—নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন^১ নিয়ম দেপছি রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

ভবদত্ত। এতকাল রাজ্যের দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তাহলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

জনার্দন। এই দেপো না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেপছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেপা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

কৌণ্ডিয়া । আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা । তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না ? রাজাকে দেখেছ, কি দেখ নি ?

ভবদত্ত । রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিয়া । ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা । ওর শ্রীয়াশাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে । বিনা-চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই । বিনা অঙ্গে কিছুদিন ওকে আহাৰ কয়তে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে । [প্রস্থান

বাউলের দল

আমার প্রাণের মাহুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল পানে ।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে ॥
আমি তার মুণের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, শোনা হল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাড়াল-বেশে ঘারে ঘারে,
দেশা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয় রে ধেরে দেখু রে চেয়ে
আমার বৃকে—
ওরে দেখু রে আমার দুই নয়ানে ॥

[প্রস্থান

একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক । সরে যাও সব সরে যাও । তক্ষাত যাও ।
প্রথম পথিক । ইস, তাই তো । মন্তলোক বটে । লম্বা পা কেলে চলছেন ।
কেন রে বাপু, সরব কেন ? আমরা সব পথের কুকুর না কি ?
দ্বিতীয় পদাতিক । আমাদের রাজা আসছেন ।

দ্বিতীয় পক্ষিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পক্ষিক। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

দ্বিতীয় পক্ষিক। সত্যি না কি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ওই দেখো না নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পক্ষিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংগুক ফুল আঁকা আছে দেখছ না?

দ্বিতীয় পক্ষিক। ওরে কিংগুক ফুলই তো বটে, মিথ্যা বলে নি—একেবারে লাল টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

দ্বিতীয় পক্ষিক। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ওই কুস্তাই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুস্ত, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

দ্বিতীয় পক্ষিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তার খুড়শুৱ—অন্ত পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ খুড়শুৱ গোছের চেহারা বটে, বৃদ্ধিটাও নেহাত খুড়শুৱের ধাঁচার।

কুস্ত। অনেক দুঃখে বৃদ্ধিটা এই রকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শ পয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মূলুক চায় সে তখন পাজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে রাজনা নেবার বেলায় মধ্যাঙ্গেরা ত্র্যম্পর্শ কিছুই তো বাধত না!

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুস্ত, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও!

প্রথম পদাতিক। ওহে খুড়খুড়, এবার খুড়শাণ্ডীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এস গে, আর দেরি নেই।

কুস্ত। না বাবা, রাগ ক'রো না। আমি কান মলছি, নাকে পত দিচ্ছি—যতদূর পরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইপানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি। [পদাতিকদের প্রস্থান]

দ্বিতীয় পথিক। কুস্ত, তোমার ওই মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুস্ত। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছে—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে তাই বোঁফাস কথাটা মুণ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হ'ক মিথো হ'ক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ; মিথো হলেই বা লোকসান কী।

কুস্ত। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামি জিনিস—বাজে পরচ করতে গিয়ে কতুর হতে হয়।

মাধব। ওই যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুস্ত, এমন কী মনে হচ্ছে।

কুস্ত। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্তে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুস্ত। বড়ো ধাঁদা ঠকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি। [প্রস্থান]

আর একদল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

দ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়বস্তুর নাতি। আমার নাম বিরাজ দস্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি—আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনও কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিল কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভক্তসেন, ভক্তকে স্বরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজ দত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়বে না।

দ্বিতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি সবাইকে ঠেলেঠেলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাপা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

মাধব। তাই তো হে লোকটার আশ্পর্শ তো কম নয়।

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্য।

মাধব। ওহে রাজা কি আর একটু বুঝবে না? এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। না হে না—রাজারা বোঝে না কিছু—হয়তো ওই তালপাতার হাওয়া পেয়েই ভুলবে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুস্তুর প্রবেশ

কুস্ত। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুস্ত। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্মেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোপ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না!

কুস্ত। তা আজকে যদি মজি হয়ে থাকে বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মজি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুস্ত। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি!

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে এমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি বা দেখা দিত তোদের চোপেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধজায় কী দেখলি।

কুম্ভ। কিংগুক ফুল ঝাঁকা—একেবারে চোপ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র ঝাঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাঁচি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুকেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!—ওই যে আমার পাগলা আসছে। আর ভাই আর—আর তো বাজে বকতে পারি নে—একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান

তোরা যে যা বলিস ভাই

আমার সোনার হরিণ চাই।

সেই মনোহরণ চপল চরণ

সোনার হরিণ চাই ॥

সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়

যায় না তারে বাঁধা,

তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,
তবু ছুটব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে,
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে ?
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি বোঁকে,
আমার ফরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে আছি স্মৃতি হস্তমুখে
দুঃখ আমার নাই ।
আমি আপনমনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা । ওরে দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা ।

গান

আজি . কমলমুকুলদল খুলিল !

হুলিল রে হুলিল

মানস-সরসে রস-পুলকে

পলকে পলকে ডেউ তুলিল ।

গগন মগন হল গঞ্জে,
সমীরণ মুছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জন ছন্দে
মধুর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;—
নিপিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !

[প্রস্থান

অবস্খী কোশল কাকী প্রভৃতি রাজগণ

অবস্খী । এপানকার রাজা কি আমাদেরও দেপা দেবে না ?

কাকী । এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী-রকম ? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই ?

কোশল । আমাদের জন্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল ।

কাকী । জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব ।

কোশল । এই সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই একটা ফাঁকি চলে আসছে ।

অবস্খী । ওহে তা হতে পারে কিন্তু এপানকার মহিষী স্তম্ভন না নিতান্ত ফাঁকি নয় ।

কোশল । সেই লোভেই তো এসেছি । যিনি দেপা দেন না তাঁর জন্তে আমার বিশেষ ঐশ্বর্য্য নেই, কিন্তু যিনি দেপবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে ।

কাকী । একটা ফন্দি দেখাই যাক না ।

অবস্খী । ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায় ।

কাকী । এ কী ব্যাপার । নিশেন উড়িয়ে এদিকে কে আসে ? এ কোথাকার রাজা ?

পদাতিকগণের প্রবেশ

কাকী । তোমাদের রাজা কোথাকার ?

প্রথম পদাতিক । এই দেশের । তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন ।

[প্রস্থান

কোশল । এ কী কথা । এপানকার রাজা বেরিয়েছে !

অবন্তী । তাই তো তাহলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে—অন্য দর্শনীয়াটা রইল ।

কাকী । শোন কেন ? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয় । দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ ।

অবন্তী । কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে ।

কাকী । চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না । আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি ।

রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী । রাজগণ, স্বাগত । এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি হয় নি তো ?

রাজগণ । (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না ।

কাকী । যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে ।

রাজবেশী । আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অন্তর্গত এই জগৎ একবার দেখা দিতে এলুম ।

কাকী । অমুগ্রহের এত আতিশয়া সহ্য করা কঠিন ।

রাজবেশী । আমি অধিকক্ষণ থাকব না ।

কাকী । সেটা অমুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে ।

রাজবেশী । ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাকী । আছে বই কি । কিন্তু অমুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি ।

রাজবেশী । (অমুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জগৎ তোমরা দূরে যাও । এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার ।

কাকী । অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয় ।

রাজবেশী । না, সে আশঙ্কা ক'রো না ।

কাকী । এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো ।

রাজবেশী । বোধ হচ্ছে আমার ভূত্যগণ বাক্ষী মণ্ডটা রাজশিবিরে কিছু মুক্ত হস্তেই বিতরণ করেছে ।

কাকী । ভগুরাজ, যদ্যপােক বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেই-জন্তেই এখন ধুলোর লোটাবার অবস্থা হয়েছে ।

রাজবেশী । রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয় ।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি।

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণয়। অথবা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তাহলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেকে ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাই নে, রানী সুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ফল হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত্তা চলতে হবে। আচ্ছা এখন ভূমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করা গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান]

ঠাকুরদা ও কুস্তুর প্রবেশ

কুস্ত। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা আমার রাজ্য কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম, কিন্তু ঠকলুম না তো?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তাহলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তাহলে ঠকলি বই কি।

কুস্ত। ঠাকুরদা, উৎসব শুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে

সকল আগন্তকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ওই আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল।

ঠাকুরদা। আজ আমি ধারে, আজ আমাকে অল্প জায়গায় খুঁজলে মিলবে কেন ?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি ধারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুস্তি স্তম্ভন মৃষল তোষল এদের নিয়েই আছ ? দেশবিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে না ?

ঠাকুরদা। ভাই এরা সব সরল লোক—চূপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে এদের যেন কত সেবা করলুম, আর যারা মন্তুলোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি বসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা !

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে। তবে আর কি ; এইবারে শুরু করা যাক।

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,

আমরা ঘরে-বাইরে গাই

তাই রে নাই রে নাই রে না।

যতই দিবস যায় রে যায়

গাই রে স্থপে হায় রে হায়

তাই রে নাই রে নাই রে না।

যারা সোনার চোরাবালির পরে

পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে

তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই

তাই রে নাই রে নাই রে না।

যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে

গাঁঠকাটার দৃষ্টি হানে,

তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই

তাই রে নাই রে নাই রে না।

যখন ঘরে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাই রে নাই রে নাই রে না ।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না ।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না ॥

[প্রস্থান

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা ।

ঠাকুরদা । কী ভাই ।

প্রথম। আজ বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে মালা বদল করব এই পণ করে ঘর থেকে বেরিয়েছি ।

ঠাকুরদা । কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি ।

দ্বিতীয়া । কেন বলো তো ?

ঠাকুরদা । তোমাদের ঠাকরুনদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন ।

তৃতীয়া । দেখেছ, দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ ?

দ্বিতীয়া । হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হল ?

ঠাকুরদা । যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কি করে ?

প্রথম। তবে তাই বলো, আমাদের ফাঁদের গুণ ।

ঠাকুরদা । চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয় ।

তৃতীয়া । আচ্ছা ঠাকরুনদিদির হিসেবটা কী রকম ? আজ উৎসবের দিনে না হয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন ।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্তে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না ?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব-শেষে আমি।

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এস এস।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে ষাড়া আছি, জানি এইখান দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পাছুটো ছটফট করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ।
তারি সঙ্গে কী মদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জয় নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

[নাচের দলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ-কথা দু-শবার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দু-শবার। এত কঠিন সংঘর্মের দরকার কী—পাঁচ-শবার বলো না।

ঠাকুরদা। তবে কী রে? তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয়? তা যা তাই আনন্দ করে বলে বেড়া গে রাজা নেই। আজ আমাদের নানা স্মরের উৎসব—সব স্মরই ঠিক একতানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
 দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে ।
 যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
 বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
 যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে ।
 বসন্তে আজ দেখে রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে ।
 আমার প্রভুর পায়ের তলে,
 শুধুই কি রে মানিক জলে ?
 চরণে তাঁর লুটিয়ে ঝাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে ।
 আমার গুরুর আসন কাছে
 সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
 অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে ।
 উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে ।

৪

প্রাসাদ-শিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা । ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি ?
 রোহিণী । ওনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে । সেইজন্তে
 যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি, এই বুঝি হবে রাজা । আবার
 দুদিন পরে ভুল ভাঙে ।
 সুদর্শনা । ভুল তোরা করতে পারিস কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না । আমি
 হলুম রানী । ওই তো আমার রাজাই বটে ।
 রোহিণী । তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি
 করতে পারেন ?
 সুদর্শনা । ওই মূর্তি দেখলেই চিন্তা যে আপনি গাঁচার পাণির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে ।
 ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো ?

রোহিণী। এসেছি বই কি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা?

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ওই যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস?

রোহিণী। হাঁ ওই যার পতাকায় কিংগুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প তাই ভয় হয় কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা। আহা যদি সুরক্ষমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। সুরক্ষমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!

সুদর্শনা। তা যা বলিস সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ-কথা আমি ককূপনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম তাহলে এমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

সুদর্শনা। না, না, সে তো বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরও বেশি। কত ছলই যে জানে। ওইজুতাই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হ'ক সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না,—আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রজ্জ দেখে হেসে বাঁচি নে।

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী? যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহ ভঞ্জন হ'ক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে-ই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না, না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না—তবু কথাটা সকলেরই মুখে গুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে—ওই দেখো না তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর। পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন কে দিলে ?

সুদর্শনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না—তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব না—ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমন চঞ্চল হয়েছে—এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মন্দের ফেনার মতো চারিদিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো বসন্ত, যে-সব ভীকু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে কোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না !—ওরে প্রতিহারী।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)। কী মহারানী।

সুদর্শনা। ওই যে আম্রবনের বাঁধিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে—ডাক ডাক ওদের ডেকে নিয়ে আয়—একটু গান শুনি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ! তোমার স্মিত কোঁতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে—কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই—আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি! ভয় লজ্জা স্মৃৎ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারিদিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

বালকগণের প্রবেশ

এস, এস, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান

বিরহ মধুর হল আজি

মধুরাতে।

গভীর রাগিণী উঠে বাজি

বেদনাতে।

ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা

অধীর অদর্শন-তৃষা

কী করণ মরীচিকা আনে
 আশ্বিনপাতে !
 সুদূরের সুগন্ধ ধারা
 বায়ুভরে
 পরানে আমার পথহারা
 ঘুরে মরে !
 কার বাণী কোন্ স্বরে তালে
 মর্মরে পল্লবজালে,
 বাজে মম মঞ্জীররাজি
 সাপে সাপে ॥

সুদর্শনা । হয়েছে হয়েছে আর না । তোমাদের এই গান শুনে চোপে জল ভরে আসছে । আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই । এমনি করে বোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে । কোন্ মাধু্যের সম্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো—ইচ্ছে করছে চোপে-দেপা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই—হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে সেইপানকার ছায়ার মধ্যে উদ্‌াস হয়ে চলে যাই । ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো । আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা—এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পৌঁড়া দেবে—তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মতো কিছুই আমার কাছে নেই ।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান]

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা । ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী । তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনতে আমার লজ্জা করছে । এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয় । তবু বল্ কী হল বল্ !

রোহিণী । আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হল না ।

সুদর্শনা । বলিস কী ? তিনি বুঝতে পারলেন না ?

রোহিণী । না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে পুতুলটির মতো বলে রইলেন । কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্তে একটি কথা কইলেন না ।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি আমার যেমন প্রগল্ভতা তেমনি শান্তি হয়েছে। তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আনলি নে কেন ?

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে ? পাশে ছিলেন কাক্ষীর রাজা, তিনি খুব চতুর—চকিতে সমস্ত বুঝতে পারলেন—মুচকে হেসে বললেন, মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্ত-সখার পূজার পুষ্প মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন। শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হল। আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিলুম এমন সময়ে কাক্ষীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।

সুদর্শনা। কাক্ষীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হল ? আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্ঘাটিত করে দিলে। তা হ'ক, যা তুই যা, আমি একটু একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন কেঁরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না—পরাভব, সর্বত্রই পরাভব—বিমূখ হয়ে থাকব সে-শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে ওই মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে। রোহিণী।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী।

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য ?

রোহিণী। তোমার কাছে না হ'ক যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না, না, ওকে দেওয়া বলে না ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পৃহা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে ওটা খুলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম—এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—পারলুম না। এ যে কীটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসব-দেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম—এই অগৌরবের মালা।



কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেশো না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী। রাজাগুলোকে স্বধ্ব রাঙিয়েছে না কি ?

দ্বিতীয়। ওরে বাস রে। কাছে ঘেঁষে কে। তারা সব বেড়ার মধ্যে পাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিল ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড—ওদের তক্ষাতে বেপে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিল বুঝি ?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না ?

ঠাকুরদা। এখনও ডাক পড়ল না—দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শকু-সুখনরা সব গেল কোথায় ?

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল—সুতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সঙ্গে অমন পাড়া আগতে পারে ? [প্রস্থান

বাউলের দল

যা ছিল কালো ধলো

তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।

যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ

তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হ'ল কেমন দেখ'রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল।

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল ?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমাহুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিত্তো ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এগানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজেকে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে ?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা

প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।

বড়ো উতলা আজ পরান আমার

খেলাতে হার মানবে কি ও ?

কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে

রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?

তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে

আমারো রং বক্ষে নিয়ে—

এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু

রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

[প্রস্থান

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথম। ওমা, ওমা, যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো।

দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথম। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্তে পথ চেয়ে আছে ভাই ?

ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্তে।

তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মাহুষ খুঁজবে ব্যাধি ?

ঠাকুরদা। হ্যাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্তে মন-কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায় ।

আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায় ।

দ্বিতীয়া । আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো । ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী ।

ঠাকুরদা । তার কাছে ধরা দিলে ধরা-দেওয়াও যা, ছাড়া-পাওয়াও তা ।

যে জন দেয় না দেপা যায় যে দেপে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,

আমার মন মজেছে সেই গভীরের

গোপন ভালোবাসায় ॥ [স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা । ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল কিন্তু মনের মাতন এখনও যে থামতে চাইছে না—তোরা তো বাড়ি চলেছিস তোর শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা ।

গান

আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন তাধিন
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন ।

তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুনতে না পাই কে কী বলে
তাধিন তাধিন—

তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন তাধিন ।

আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
থসে গেল ভজন সাধন,
তাধিন তাধিন—

বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে

ভাবনা যত সব ভেগেছে

তাহিন তাহিন ।

[নাচের দলের প্রস্থান]

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা । এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা ?

ঠাকুরদা । ঘরের কাজে ছিলাম ।

সুরঙ্গমা । সে কাজ তো শেষ হল । একটি মাছুষও নেই—সবাই চলে গেছে ।

ঠাকুরদা । এবার তবে ভিতরে চলি ।

সুরঙ্গমা । কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে ।

ঠাকুরদা । সবাই যখন নিজের তালপাতার ডেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল ।

সুরঙ্গমা । উৎসবে ডেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন ।

ঠাকুরদা । তাঁর বাঁশি কারও বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না, তা না হলে লজ্জায় আর সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত ।

সুরঙ্গমা । দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন ।

ঠাকুরদা । দুঃখ দেবেন !

সুরঙ্গমা । হাঁ ঠাকুরদা । এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না ।

ঠাকুরদা । এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন । সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই ।

সুরঙ্গমা । তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে ? রাজ্যের কাজে কোন্‌ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয় ।

গান

গুপ্প ফুটে কোন্‌ কুঞ্জবনে

কোন্‌ নিভৃতে রে কোন্‌ গহনে ।

মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু

সৌরভ-চঞ্চল সঞ্চরণে

কোন্‌ নিভৃতে রে কোন্‌ গহনে ॥

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত-নিশা

বাহির-অন্ধন-সঙ্গী সনে ।

উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে

কে লয়ে যাবে সে ভবনে—

কোন নিভূতে রে কোন্ গহনে ॥ [সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাঞ্চী । তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেইরকম করো । ভুল না হয় ।

রাজবেশী । ভুল হবে না ।

কাঞ্চী । করভোক্তানের মধ্যেই রানীর প্রাসাদ ।

রাজবেশী । হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি ।

কাঞ্চী । সেই উত্তানে আগুন লাগিয়ে দেবে—তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কাষসিদ্ধি করতে হবে ।

রাজবেশী । কিছু অগ্রথা হবে না ।

কাঞ্চী । দেশো হে ভগুরাজ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলছি, এ-দেশে রাজা নেই ।

রাজবেশী । সেই অরাজকতা দূর করবার জন্তেই তো আমার চেষ্টা । সাধারণ লোকের জন্তে সত্য হ'ক মিথ্যে হ'ক একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে ।

কাঞ্চী । হে সাধু, লোকহিতের জন্তে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত । ভাবছি যে এই হিতকাযটা নিজেরই করব । (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে কে তুমি ? কোথায় লুকিয়ে ছিলে ?

ঠাকুরদা । লুকিয়ে থাকি নি । অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি ।

রাজবেশী । ইনি এ-দেশের রাজাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, নিবোধেরা বিশ্বাস করে ।

ঠাকুরদা । বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নিবোধ নিয়েই আমাদের কারবার ।

কাঞ্চী । তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ ?

ঠাকুরদা । আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন ।

কাঞ্চী । তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে ।

ঠাকুরদা । আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল ?

কাঞ্চী। বিড় বিড় করে বকছ কী ?

ঠাকুরদা। আমি বলছি, দেশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলাম না, তাই বুঝি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্তে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল না কি ?

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো—বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে যে কন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোগান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী। কিছু তো বুঝতে পারছি নে। (মালীদের প্রতি)
তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস ?

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস ?

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোন্ রাজা ?

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে-রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি ?

প্রথম মালী। হাঁ সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব। [প্রস্থান

রোহিণী। এরা কী বলে বুঝতে পারি নে—ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমন সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন কিন্তু কোথায় কিছুই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্তগাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি। [প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে! শীঘ্র একটা দুর্দৈব ঘটবে। আমাকে সূক্ষ্ম জড়াবে না তো?

অবস্ঠী। প্রবেশ করিয়া। রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান?

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবস্ঠী। কোশলরাজের জন্তে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়?

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবস্ঠী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। সপ্নী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান?

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবস্ঠী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবস্ঠী। কেন গেল?

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তারা বললে রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবস্ঠী। রাজা! কোন্ রাজা!

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

অবস্ঠী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হ'ক এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। [দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিশ্চয় নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম তখন তিনি তো একরকম আশ্চর্যবিস্মৃত ছিলেন—তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই পুরস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরও বাড়ছে। এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন? এখন তো এদের গুড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ওদিকে দৌড়ল কোথায়? চপলা, চপলা। আমার ডাক শুনলই না। এমন তো কখনোই হয়

না। চারদিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মত হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। যেন চারদিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্নততা আজ। ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই।

৭

রানীর প্রাসাদদ্বার

রাজবেশী। এ কী কাণ্ড করেছ কাঞ্চীরাজ ?

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটোতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারদিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাঞ্চী। তুমি তো এ-দেশের লোক—পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা ?

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী। ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা রক্ষা করো। চারদিকে আগুন।

কাঞ্চী। মৃদু ওঠ, আর দেরি না।

সুদর্শনা (প্রবেশ করিয়া)। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হ'ক। [কাশ্মীররাজের সহিত প্রস্থান]

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হতাশন, দণ্ড করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব—হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী (প্রবেশ করিয়া)। রানী, ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ করো না।

সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবারই আগুন।

[প্রাসাদে প্রবেশ]

৮

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই তোমার ভয় নেই। আগুন এ-ঘরে এসে পৌছোবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ আমার সমস্ত জন্মটাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাঁহ মিটেতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটেবে না, কোনোদিন মিটেবে না।

রাজা। হতাশ হ'য়ো না রানী।

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা—আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে-পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তৌ ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চারদিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাণিষ্ঠ মন বললে,

ওই হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা।

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বৃকের মধ্যে এখনও কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্বরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্তে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল ধূমকেতু যে-আকাশে উঠছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তখনই চোখ বৃজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কুলশূণ্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সঙ্ঘার রক্তিম।

রাজা। আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে-লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সহিতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে উদ্ধৃষ্ণাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্তে সেই দুঃখ থেকে বাচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে রানী হবে। যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় বিন্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না

ভালোবাসায় ভোলাব।

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো

গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

ভরাব না ভূষণ-ভারে

সাজাব না ফুলের হারে

সোহাগ আমার মালা করে

গলায় তোমার পরাব।

জানবে না কেউ কোন্‌ তুফানে

তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,

চাঁদের মত অলপ টানে

জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

সুদর্শনা। হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপনসুন্দর ঝলমল করছে। এই আমি তোমাকে সব কণা বললুম এখন আমাকে শান্তি দাও।

রাজা। শান্তি শুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেবো।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না—তোমাকে আমি সহিতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি আমাকে—জানি নে আমাকে তুমি কী করেছ। কিন্তু কেন তুমি এমনতরো? কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি—তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো শুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বৃন্দবৃন্দের মতো শূন্য।

সুদর্শনা। তা হ'ক কিন্তু আমি পারছি নে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে! আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে-মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অল্পদিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করছি—কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরও বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে দূরে চলে যাই—এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না বলেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত ঝিঝি হয়। তুমি কেশের শুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও না

কেন ? তুমি আমাকে মার না কেন ? মারো, মারো, আমাকে মারো । তুমি আমাকে কিছু বলছ না সেইজগুই আরও অসহ্য বোধ হচ্ছে ।

রাজা । কিছু বলছি নে কে তোমাকে বললে ?

সুদর্শনা । অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীৎকার করে বলো, বজ্রগর্জনে বলো—
আমার কান থেকে অস্ত্র সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো—আমাকে এত সহজে ছেড়ে
দিয়ে না, যেতে দিয়ে না ।

রাজা । ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন ?

সুদর্শনা । যেতে দেবে না ? আমি যাবই ।

রাজা । আচ্ছা যাও ।

সুদর্শনা । দেখো তাহলে আমার দোষ নেই । তুমি আমাকে জোর করে ধরে
রাখতে পারতে কিন্তু রাখলে না । আমাকে বাঁধলে না—আমি চললুম । তোমার
প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক ।

রাজা । কেউ ঠেকাবে না । ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবোধে চলে তেমনি
তুমি অবোধে চলে যাও ।

সুদর্শনা । ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল । হয়তো ডুবে কিন্তু
আর ফিরব না ।

[দ্রুত প্রস্থান]

সুদর্শনার প্রবেশ ও গান

ভয়ের মোর আঘাত করে

ভীষণ, হে ভীষণ !

কঠিন করে চরণ পরে

প্রণত করো মন ।

বৈধেছ মোরে নিত্যকাজে

প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে

নিত্য মোরে বৈধেছ সাজে

সাজের আভরণ ।

এস হে, ওহে আকস্মিক

ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক

মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক

নিমেষে এ জীবন ।

তাহার পরে প্রকাশ হ'ক

উদার তব সহাস চোখ

তব অভয় শাস্তিময়

স্বরূপ পুরাতন ॥

সুদর্শনা (পুনঃপ্রবেশ করিয়া) । রাজা, রাজা ।

সুরঙ্গমা । তিনি চলে গেছেন ।

সুদর্শনা । চলে গেছেন ? আচ্ছা বেশ, তাহলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন । আমি কিরে এলুম কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না । আচ্ছা ভালোই হল— তাহলে আমি মুক্ত । সুরঙ্গমা আমাকে ধরে রাণবার জন্তে তিনি কি তোকে বলেছেন ?

সুরঙ্গমা । না, তিনি কিছুই বলেন নি ।

সুদর্শনা । কেনই বা বলবেন ? বলবার তো কথা নয় । তাহলে আমি মুক্ত । আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম কিন্তু মুখে বেধে গেল । বল দেখি বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন ?

সুরঙ্গমা । প্রাণদণ্ড ? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না ।

সুদর্শনা । তাহলে ওদের কী হল ?

সুরঙ্গমা । ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন । কাকীরাজ পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন ।

সুদর্শনা । শুনে পাচলুম ।

সুরঙ্গমা । রানীমা তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে ।

সুদর্শনা । প্রার্থনা কি মুগ্ধ জানাতে হবে মনে করেছিস ? রাজার কাছ থেকে এ-পথস্থ আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব—এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না ।

সুরঙ্গমা । মা, আমি খার দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন । সেই আমার অলংকার । লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি ।

সুদর্শনা । তবে তুই কী চাস ?

সুরঙ্গমা । আমি তোমার সঙ্গে যাব ।

সুদর্শনা । কী বলিস তুই ? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা ?

সুরঙ্গমা । দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন ।

সুদর্শনা । পাগলের মতো বকিস নে । আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম সে গেল না । তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস ?

সুদক্ষমা । সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই । কিন্তু আমি যাব—সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে ।

সুদর্শনা । না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোমার কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে—সে আমি সহিতে পারব না ।

সুদক্ষমা । মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি—আমাকে পর করে রাখতে পারবে না—আমি যাবই ।

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী ।

আমি সকল দাগে হব দাগি ।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন ;
যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা অঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অগ্নরাগী ।

আমি গুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পক্ষে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥

৯

সুদর্শনার পিতা কান্ধকুজরাজ ও মন্ত্রী

কান্ধকুজ । সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত পবর পেয়েছি ।

মন্ত্রী । রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্তে লোকজন পাঠিয়ে দিই ?

কান্ধকুজ । হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে ? অঙ্ককার হ'ক, রাত্ণায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে ।

মন্ত্রী । প্রাসাদে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে দিই ?

কান্তুকুজ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

কান্তুকুজ। যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তাহলে পিতা নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্তুকুজ। সে যে আমার কন্যা এ-কথা যেন প্রকাশ না হয়—তাহলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে।

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ ?

কান্তুকুজ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি—সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা ! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে—আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে—তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস ওতে আমার আরও রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা ?

সুদর্শনা। সে আমি জানি নে—কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে সমস্ত ছারখার হয়ে যাক ! অতবড়ো রানীর পদ একমুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর বাঁট দেবার জন্তে ? মশাল জ্বলে উঠবে না ? ধরণী কৈপে উঠবে না ? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া ? সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না ?

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁয়ায়—এখনও সময় যায় নি।

সুদর্শনা। রানীর মহিমা ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এলুম এখানে আর কেউ

নেই যে আমার সঙ্গে মিলবে? একলা—একলা আমি। আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্তে কেউ এক পাও বাড়াবে না?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না—একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রসার্দে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারি নি—ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কঁপে কঁপে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত কৈলে দিয়ে আসতে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা? আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি না কেন?

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগুন লাগায় নি—আগুন লাগিয়েছিল কাকীরাজ।

সুদর্শনা। ভীক! ভীক! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মাছুব নেই। এমন অপদার্থের জন্তে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা! কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজ্যের কি উচিত ছিল না আমাকে এখনও ফেরাবার জন্তে আসে? (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস ফেরাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! কখনো না! রাজা এঁলেও আমি কিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না। চলে যাবার দ্বার একেবারে গোলা রইল। বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রানী বলে আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজ্যের মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষকও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি। চূপ করে রইলি যে। বল না তোর রাজ্যের এ কী রকম ব্যবহার।

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে—আমার রাজ্য নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে—আমার কাগ্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক সেই কঠিনেরই জয় হ'ক।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ তো ওই মাঠের পারে পূর্বদিগন্তে যেন ধুলো উড়ছে।

সুরঙ্গমা। হাঁ তাই তো দেখছি।

সুদর্শনা। ওই যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাচ্ছে না।

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে। তবে তো এল।

সুরঙ্গমা । কে আসছে ।

সুদর্শনা । আবার কে ? তোর রাজা । থাকতে পারবে কেন । এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য ।

সুরঙ্গমা । না, এ আমার রাজা নয় ।

সুদর্শনা । না, বই কি । তুমি তো সব জান । ভারি কঠিন তোমার রাজা ! কিছুতেই টলেন না ! দেখি কেমন না টলেন । আমি জানতুম সে ছুটে আসবে । কিন্তু মনে রাখিস সুরঙ্গমা আমি তাকে একদিনের জন্তেও ডাকি নি । আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো । সুরঙ্গমা যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে । (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই বুঝি যাব ? কখনো না । আমি যাব না । যাব না ।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা । মা, এ আমার রাজা নয় ।

সুদর্শনা । নয় ? তুই সত্যি বলছিস ? এখনও আমাকে নিতে এল না ?

সুরঙ্গমা । না, আমার রাজা এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে না । সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না ।

সুদর্শনা । এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা । কাকীরাজের সঙ্গে সেই আসছে ।

সুদর্শনা । তার নাম কী জানিস ?

সুরঙ্গমা । তার নাম সুবর্ণ ।

সুদর্শনা । তবে তো সে আসছে । ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে । সুবর্ণকে তুই জানতিস ?

সুরঙ্গমা । যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

সুদর্শনা । না না, তোর মুখে আমি তার কোনো কথা শুনতে চাই নে । সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা । তার পরিচয় আমি নিজেই পাব । কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল তো । এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না ? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে । আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্তে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না । তোর মতো দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না ! আচ্ছা সত্যি বল, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস ?

সুরঙ্গমার গান

আমি কেবল তোমার দাসী ।

কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি !

শুণ যদি মোর থাকত তবে

অনেক আদর মিলত ভবে,

বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী ॥

১১

শিবির

কাঞ্চী । (কান্ধকুঞ্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে
আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসি নি । রাজ্যে ফিরে যাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে
আছি, কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্তেই
অপেক্ষা ।

দূত । মহারাজ স্বরণ রাখবেন রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন ।

কাঞ্চী । কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তার আশ্রয় ।

দূত । কিন্তু পতিকূলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে ।

কাঞ্চী । সে-সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন ।

দূত । জীবন থাকতে সে-সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না—মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে কিন্তু
অবসান ঘটতেই পারে না ।

কাঞ্চী । সেজন্ত কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না, কারণ তাঁর স্বামীই স্বয়ং
তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন । রাজন্ ।

সুবর্ণ । কী মহারাজ ।

কাঞ্চী । তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেণে তুমি স্থির থাকবে ?

সুবর্ণ । এমন কাপুরুষ আমি না ।

দূত । এ যদি আপনাদের পরিহাস-বাক্য না হয় তাহলে রাজ্যভবনে আতিথ্য নিতে
দ্বিধা কিসের ?

কাঞ্চী । রাজন্ ।

সুবর্ণ । কী মহারাজ ।

কাঞ্চী। ভূমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে কিরিয়ে নিয়ে যাবে ?

সুবর্ণ। এ-ও কি কখনো হয় ?

দূত। তবে কী ইচ্ছা করেন ?

কাঞ্চী। সে-ও কি বলতে হবে ?

সুবর্ণ। তা তো বটেই। সে তো বুঝতেই পারছেন।

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জগ্গেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি এই কথা রাজাকে জানাও গে। [দূতের প্রস্থান

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুবর্ণ কী।

সুবর্ণ। কান্ধকুজরাজকে ভয় না করলেও চলে—কিন্তু—

কাঞ্চী। কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি, মহারাজ, ওই কিস্কটি দেপা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ওই কিস্কর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কণ্টা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিস্ক এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মাতুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মাতুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাকে অকস্মাৎ বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম—কোনোমতে তাঁকে বাচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্তে আসছেন
সংবাদ পেলুম। [প্রস্থান

কাকী। যা ভয় করছিলুম তাই হল। সুদর্শনার পলায়নসংবাদ রটে গিয়েছে—
এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বলছি
আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাকী। কেন? তাতে তাঁর লাভ কী?

সুবর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে মরবে—মাঝের থেকে যার
ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাকী। এখন বেশ বুঝছি কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে
সর্বদাই দেখা যাবে এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনও আমি বলছি তোমাদের রাজা
আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ আমাকে ছেড়ে দিন।

কাকী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে—তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ
প্রয়োজন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভরাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর
ওপারে। [প্রস্থান

কাকী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্ডাকুন্ডের সঙ্গে
যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক তার পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ওই উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তাহলে নিশ্চিত হতে
পারি—আমি অতি হীনব্যক্তি—আমার দ্বারা—

কাকী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সিঁড়ি বল রাস্তা বল
পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয় তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক
চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে
কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মস্তার সঙ্গে পরামর্শ করতে
গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থ টাই বুঝে নেন।

কাকী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্ত্রী না করে গোয়ালঘরের
ভার দিভুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চলে দিয়ে আসি গে—
সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তাহলে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা । যুদ্ধ এখনও চলছে ?

সুরঙ্গমা । হাঁ, এখনও চলছে ।

সুদর্শনা । যুদ্ধে ষাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাত জনের মধ্যে ভাগ করে দিই । সত্যিই যদি তাই করতেন ভালো হত ।

সুরঙ্গমা । কী মা ।

সুদর্শনা । তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা । মা, আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না । যদি না দেন তাহলে সকলকেই নির্বাক হয়ে থাকতে হবে । আমি কিছুই বুঝি নে জানি, সেইজন্তে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে ।

সুদর্শনা । যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল তো ।

সুরঙ্গমা । সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে ।

সুদর্শনা । আর কেউ না ?

সুরঙ্গমা । সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল—কাকীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন ।

সুদর্শনা । আমার মৃত্যুই ভালো ছিল । কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্তে যদি আসতে তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না । আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন ?

সুরঙ্গমা । সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা,—ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়—সেইজন্তেই ভয়, নইলে একলার জন্তে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা । দেখ্ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে ।

সুরঙ্গমা । তা হবে, কেউ হয়তো বাজায় ।

সুদর্শনা । সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে ।

সুরঙ্গমা । হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আর বাজায় ।

সুদর্শনা । তা হবে, কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি । সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর-ঘরের অঙ্ককার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত । সেই গানই তো কোন্ অঙ্ককারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অঙ্ককারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত ।

সুরঙ্গমা । আহা মা, সে কী অঙ্ককার । সেই অঙ্ককারের দাসী আমি ।

সুদর্শনা । আমার জন্তে সেখান থেকে তুই কেন এলি ?

সুরঙ্গমা । আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্তে ।

সুদর্শনা । না না তিনি আসবেন না—তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন । কেনই বা না ছাড়বেন ? অপরাধ তো কম করি নি ।

সুরঙ্গমা । যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহলে তাঁকে আর দরকার নেই । তাহলে তিনি নেই । তাহলে আমার সেই অঙ্ককার একেবারে শূন্য—তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি—কেউ ডাকে নি—সমস্ত বঞ্চনা ।

দ্বারীর প্রবেশ

সুদর্শনা । কে তুমি ?

দ্বারী । আমি এই প্রাসাদের দ্বারী ।

সুদর্শনা । কী খবর শীঘ্র বলো ।

দ্বারী । আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন ।

সুদর্শনা । বন্দী হয়েছেন ? মাগো বসুন্ধরা ।

[মূর্ছা]

১৩

বন্দী কান্তকুব্জরাজ, অন্ত্যাত্ম রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী । রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল ?

কলিঙ্গ । কই শেষ হল ? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে ।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মালা নিতে আসি নি, বরমালা নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না ?

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্তমাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনকে দাবি মেটাবেন কি করে।

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনকে দাবি তো হুণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কি পরিষ্কার করেই বলো।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ংবরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং ঘাঁর গলায় মালা দেবেন। এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কাত্যকূষ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন, অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন—আমাকে জীবিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক হুংপ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে-প্রস্তাব করলেম তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ংবরের দিনস্থির হ'ক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাঞ্চী বাতীত অল্প রাজগণের প্রস্থান]

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ।

সুবর্ণ। কী আদেশ।

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিশুগণকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

সুবর্ণ। কিংকর প্রস্তুত আছে কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম।

রানী সুদর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনও তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ

করে নি দেখছি। যাই হ'ক তিনি তো রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না অতএব যেমন করেই হ'ক এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সখ্যে এই যে-সব অমূলক কল্পনা করছেন এ অতি ভয়ানক কল্পনা—দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না—আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্বরণীয় করে রাখে না।

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তাহলে স্বয়ংবরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজ্যের উচিত কথা? তিনি কি নিজের মূপে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক, ধিক আমাকে।

সুরঙ্গমা। সেই সঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বললে, তোমার রানীকে বাঁলো বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।

সুদর্শনা। চূপ কর, চূপ কর, আমাকে আর দৃষ্ট করিস নে।

সুরঙ্গমা। ওই দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ওই ধীর গায়ে কোনো আভরণ নেই কেবল মুকুটে একটি ফুলের মালা জড়ানো উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ওই সুবর্ণ! তুই সত্যি বলছিস।

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বলছি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর একটা কী দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়।

সুরঙ্গমা। সকলে তো বলে ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।

সুদর্শনা। ওই সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর মানি চলে যাবে?

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ভোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন?

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)। স্বয়ংবরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরপানা নিয়ে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা, আমার রাজা। তুমি আমাকে তাগ করেছ উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না? (বৃকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেখে আমার কলুষ লেগেছে—এ-দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি বৃক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে ঘারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আশ্রুক মৃত্যু আশ্রুক,—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর—তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে—সে তুমিই সে তুমি।

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,

ওহে অন্ধকারের স্বামী।

এস নিবিড়, এস গভীর, এস জীবনপারে

আমার চিন্তে এস নামি।

এ দেহমন মিলায়ে যাক হইয়া যাক হারা

ওহে অন্ধকারের স্বামী।

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা

ঐ চরণে যাক ধামি ।

নিবাসনে বাধা আছি দুবাসনার ভোরে

ওহে অঙ্ককারের স্বামী ।

সব বাধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে

ওহে আমি বাধনকামী ।

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,

ওহে অঙ্ককারের স্বামী—

সকল ঝরে সকল ভরে আশ্রুক সে চরম

ওগো মরুক না এই আমি ॥

১৫

স্বয়ংবরসভা

রাজগণ

বিদর্ভ । ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাপ নি ।

কাঞ্চী । কোনো আশা নেই বলে । আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লঙ্কা দেবে ।

কলিঙ্গ । যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি ।

বিরাট । এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহুশোভার হীনতা প্রচার করতে চান । নিষ্কের দেহে ঔর পৌরুষের অভিমান অন্ত কোনো আভরণ রাপতেই দেয় নি ।

কৌশল । ঔর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণ বর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান ।

পাঞ্চাল । সেটা কি উনি ভালো করছেন ? সকলেই জানে রমণীর চোপ প তঙ্কের মতো—আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে ।

কলিঙ্গ । কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে ?

কাঞ্চী । অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই কল মধুর হয়ে দেপা দেয় ।

কলিঙ্গ । কল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সহ্য । ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি ।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ-বয়সে বারংবার আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে—আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্তে অপেক্ষা করবে। যদি নিবোধ না-ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অন্তঃগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে?

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম, দৈবজ্ঞ বলেছিল যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বই ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছে কোশলরাজ? ফল ত্যাগ করাবার জন্তে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল?

কোশল। ছিল বই কি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প না কি?

কাঞ্চী। ভূমিকম্প? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর কোনো রাজ্যের সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হতে পারে কিন্তু তাহলে তো দূতের মুগ্ধ সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ।

বিদর্ভ। অদৃষ্টপুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্ধে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ে না।

কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকবে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যেন একটা—

কাঞ্চী। ওই যেন-একটার কথা তুলবেন না—ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।

কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি?

পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্ছে।

কাঞ্চী। তবে আর কি—নিশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন—এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ

অমনতরো সংকুচিত হরে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপছে যে।

যোদ্ধাবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙ্গ। ও কী ও? ও কে?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে।

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়। কলিঙ্গরাজ তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক না কী বলে।

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা?

পাঞ্চাল। কোন্ রাজা?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা?

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা?

কলিঙ্গ। কে?

কোশল। কে সে?

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়?

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস। আহ্বান! কী-ভাবে আহ্বান করেছেন?

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি? মিল্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি—তুমি আবার সেনাপতি?

ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে?

তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব—কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললাম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ আমরা আপনাকেই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো তোমার রাজছত্র ধুলায় লুটোচ্ছে ; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা আমিও যাচ্ছি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাল্পনিক ভয়ে ভুগ্ন দিচ্ছি—শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে এখন ভীকৃত্য করে সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করছে ?

১৬

সুদর্শনা ও সুরজমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন ?

সুরজমা। তা তো বলতে পারি নে—পথ চেয়ে বসে আছি।

সুদর্শনা। সুরজমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে বেদনা বোধ হচ্ছে। লজ্জাতেও মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাব কেমন করে ?

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও তাহলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে— কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কি না, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বলত আমার উপরে রাজার অশ্রুগ্রাহের অন্ত নেই—সেইজন্তেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রানীমা। কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া! সুরঙ্গমা, সেই আশীর্বাদ কর যেন—

সুরঙ্গমা। কী বল তুমি। আমি আশীর্বাদ করব কিসের?

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে মুইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে—সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু, কই রাজা এখনও কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরও কিসের জন্তে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা ভুই যা, একবার তাঁর গবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর গবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী কর কী রানী ! আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে । আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ ।

সুদর্শনা । তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও ।
'বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন ?

ঠাকুরদা । ওই তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে । আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে তার আর বলব কী । যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই ।

সুদর্শনা । চলে গিয়েছেন ?

ঠাকুরদা । সাদা শব্দ তো কিছুই পাই নে ।

সুদর্শনা । চলে গিয়েছেন ? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু !

ঠাকুরদা । সেইজন্মে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে । কিন্তু আমার রাজা তাতে পেয়ালও করে না ।

সুদর্শনা । চলে গেলেন ? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন । একেবারে পাখর, একেবারে বজ্র । সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি—বুক কেটে গেল—কিন্তু নড়ল না । ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে ?

ঠাকুরদা । চিনে নিয়েছি যে—সুপে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না ।

সুদর্শনা । আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না ?

ঠাকুরদা । দেবে বই কি—নইলে এত দুঃখ দিয়ে কেন ? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয় ।

সুদর্শনা । আচ্ছা আচ্ছা দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা । এই জানালার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা নড়ল না—দেপি সে কেমন না আসে ।

ঠাকুরদা । দিদি তোমার বয়স অল্প—জেন্ন করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয় । পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব । [প্রস্থান

সুদর্শনা । চাই নে তাকে চাই নে । সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে । কিসের জন্মে সে যুদ্ধ করতে এল ? আমার জন্মে একেবারেই না ? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্মে ?

সুরঙ্গমা । দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না । দেখালেন আর কই ?

সুদর্শনা । যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে । এত নত করলে তবু সাধ মিটল না ? বিশ্বশুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে কেলে রেখে দিয়ে চলে গেল ?

নাগরিকদল

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, তাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেরদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল—কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়—কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে ?

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি—ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল লড়াই করে মরব আমি আর তার ফল ভোগ করবে আর কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বৃকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অল্প রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল কিন্তু তার বৃকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এজন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি—সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল ?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচার-কর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেথাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ওই কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তার সেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তাহলে কাঞ্চীকে কি আর আশ্রয় রাখতুম?

ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই মন্ত মন্ত বিচারকর্তা—ওদের বুদ্ধি একরকমের।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি। ওদের সবই মজি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তাহলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে?

১৮

পথ

ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুরদা। এ কাঁ কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে।

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্তে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক সে যত বড়ো রাজাই হ'ক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজনু, রাতে বেরিয়েছ যে।

কাঞ্চী। ওই লক্ষাটুকু এখনও ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বান্দররা হাসে।

কাকী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শঙ্কু-সুধনের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাকী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি—আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাকী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর কি, এগন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে?

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানাক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিবি লাল হয়ে উঠেছিল—রণক্ষেত্রেও মল জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্তে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর তো রে তাই; তোদের সেই দরজায় যা দেবার গানটা ধর।

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত ঘারে।

তব অবগুষ্ঠিত কুষ্ঠিত জীবনে,

ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।

আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,

আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই সংগীত-মুখরিত গগনে

তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।

এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ো

দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
 আজি পলবে পলবে বাজে রে
 দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
 আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে ।

মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে
 কারে ঘারে ঘারে কর হানি মাগিছে,
 এই সৌরভবিহ্বলা রজনী
 কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে ?

ওগো সুন্দর বল্লভ-কান্থ,
 তব গষ্ঠীর আশ্বাস কারে ।

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা । বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা । হার যেনে তবে বেঁচেছি । ওরে বাস রে ।
 কী কঠিন অভিমান । কিছুতেই গলতে চায় না । আমার রাজা কেন আমার কাছে
 আসতে যাবে—আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে
 পারছিলুম না । সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিণে
 হাওয়া বৃকের বেদনার মত হহ করে বয়েছে, আর ক্লম্ভচতুর্দশীর অঙ্ককারে বউকথাকও
 চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অঙ্ককারের কারা ।

সুরঙ্গমা । আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে
 চায় না ।

সুদর্শনা । কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল
 কোথায় তার বীণা বাজছিল । যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর
 বাজে । বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন স্বাক্ষর সেই
 সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না । সে-বীণা তুই কি
 শুনেছিলি সুরঙ্গমা ? না, সে আমার স্বপ্ন ?

সুরঙ্গমা । সেই বীণা গুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি । অভিমান-
গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম ।

সুদর্শনা । তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে । মিলন হলে এই
কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি । বলব
চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি । এ-গর্ব
আমি ছাড়ব না ।

সুরঙ্গমা । কিন্তু সে-গর্বও তোমার টিকবে না । সে যে তোমারও আগে এসেছিল
নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য ।

সুদর্শনা । তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে
পারি নি । যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে
গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও
বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি । এখন আমার মনে আর কোনো
ভাবনা নেই । তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গে দিচ্ছে—এত
কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা,
আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয়
আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অঙ্ককার ঘরের মধ্যে
যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গিয়ে কাটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম ।
কে বললে, তিনি নেই ? সুরঙ্গমা তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন ?

সুরঙ্গমার গান

অঙ্ককারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে ।

কখন তুমি এলে, হে নাথ, যুহু-চরণপাতে ?

ভেবেছিলেম জীবনস্বামী,

তোমায় বুঝি হারাই আমি,

আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে ।

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,

তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো ।

তোমার পথে চলা যখন

ঘুচে গেল, দেখি তখন

আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে ॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখু সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরও একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় ক'রো না মা।

সুদর্শনা। ভয়। ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ (প্রবেশ করিয়া)। মা, তুমিও চলেছ বৃষ্টি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুগেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কাঞ্চী। কিন্তু, মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অন্তমতি কর তাহলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধূলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলায়। এ-পথে তো হাতিঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনাকুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদেব পুত্রিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ স্রবের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। রানীমা, ওই দেপো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।

শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকে গান।

ধনু হলি ওরে পাষ,
 রজনী-জাগরক্লান্ত,
 ধনু হল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ ।
 বনের কোলের কাছে
 সমীরণ জাগিয়াছে ।
 মধুভিক্ষু সারে সারে
 আগত কুঞ্জের দ্বারে ।
 হল তব যাত্রা সারা,
 মোছো মোছো অশ্রুধারা,
 লজ্জাভয় গেল ব্যরি ঘুটিল রে অভিমান ॥

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা । ভোর হল, দিদি, ভোর হল ।

সুদর্শনা । তোমাদের আশীর্বাদে পৌছেছি, ঠাকুরদা, পৌছেছি ।

ঠাকুরদা । কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেগেছ? রথ নেই, বাগ নেই, সমারোহ নেই ।

সুদর্শনা । বল কী, সমারোহ নেই? ওই যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ ।

ঠাকুরদা । তা হ'ক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হ'ক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের যে বাখা লাগে । এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাক এ কি আমরা সহ করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি ।

সুদর্শনা । না না না । সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মধ্যে ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বৈচেছি বৈচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নিচে ।

ঠাকুরদা । শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেগে পরিহাস করবে সেইটে আশ্রয়ের অসহ হয় ।

সুদর্শনা । শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হ'ক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক । আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অন্তরাগ ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। 'তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করছ? যে পায় তার গায়ে মূঠো মূঠো ধুলো দেয় যে—সে-ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও তুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিলে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেপতে দেপতে রং ফিরে যাবে।—আর এই আমাদের রানীকে দেপো—ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাক্ষ্মী দেবে—কিন্তু সে-রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ খুঁচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কা সুরে যে এতক্ষণে বাঁণা বেজে উঠছে তাই শোনবার জগ্রে প্রাণটা ছটকট করছে।

সুরঙ্গমা। ওই যে স্বয় উঠল।

২০

অন্ধকার ঘর

সুরঙ্গমা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে-আদর আর কিরিয়ে দিয়ে না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সহিতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অল্পম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অল্পপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও— সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অঙ্ককার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল! এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অঙ্ককারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

উপন্যাস ও গল্প

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাড়া রায় পদবী “রয়” ও “রে” রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে, যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুণীদের মূখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট রায়।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে-পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ-যাত্রা টিকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এর কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভরতি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তার ইচ্ছা ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রং এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। পাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্য-বাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবনশ্রুতিতে উট জঙ্কটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি, ঘাড়-গদানে, সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেথাপ, চালটা টিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ল্যাড়া ক্যাকাশে মক্কুমিতেই তার চলন।—সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ক্যাশানটা হল মুশোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দেশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ক্যাশান তাদেরই। বন্ধিমি স্টাইল

বঙ্কিমের লেখা ‘বিষবৃক্ষে,’ বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন,—বঙ্কিম ফ্যাশান নসিরামের লেখা “মনোমোহনের মোহনবাগানে,” নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নিচে ব্যবসাদার নাচওআলীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধুর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্তে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্রচন্দ্রবরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশান-দ্রবস্ত্র দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজ্ঞমানেরা তাঁকে হবাকব্য দেওয়াটা বে-দস্বর বলে জানত। অক্সফোর্ডের বিএর মুখে এ-সব কথা শুনেতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে—সেইজন্তেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা “ন পুনরাবর্তন্তে।”

আমার শ্রালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সহিতে পারত না—বলত, “রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।” সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম এ ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, “অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে, বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্তেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।” দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্রালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়ান্ত্রো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে, বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপমারা ; প্রশংসা করবার জন্তে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো ; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষার ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে,—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অশ্রুকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোক-কামানো টাচা-মাজা চিকন শ্রামবর্ণ পরিপুষ্ট মুগ, ক্ষুণ্ণভরা ভাবটা, চোখ চকল, হাসি চকল, নড়াচড়া চলাফেরা চকল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধূতি সাদা থানের, যত্নে কৌচানো, কেননা ওর বয়সে এ-রকম ধূতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বা কাঁধ থেকে বোতাম ডান-দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধূতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চণ্ডা পয়েরি বেড়ের ক্ষিতে, তারই বা দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়ওআলা মাস্তাজি চাদর বা কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লঙ্কো টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর একরকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুখালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে থাকে বলে ডিসটিগুইশড। নিজেকে অপবিত্র করবার শপথ ওর নেই, কিন্তু ক্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কোঁতুক ওর অপরিহার্য। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কৃষ্টির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এদিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুনবাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি,—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উঁচুখুরওআলা জুতো, লেসওআলা বুককাটা জ্যাকেটের ফাকে প্রবালে আঁধারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্থগভীরিতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুটখুট করে ক্ষত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে স্ফুটগ্রহ হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্তে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্শের প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঐদাসীন্দ্র নেই, বিশেষ ভাবে কারও প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পাটিতেও যায়, তাসও খেলে ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে-রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-বুকের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলি বিশেষ পক্ষপাতের স্বর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে-মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে, দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্তেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে,—নিকটে দাহবস্ত থাকলেও ওর তরফে আগ্রহতা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সোদীন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত বৃক্ষতার উপরে চাঁদ উঠল ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, “গঙ্গার ওপারে ওই নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।”

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠেছিল,—কিন্তু সে জানত এ-কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ওই বলার কারদাচুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বৃদ্ধদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, “অমিত, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে-ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।”

অমিত হেসে উঠে বললে, “তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ওই ব্যাঙের লাকানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐক্যতানিক সৃষ্টি,—বেটোকেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় শ্রাকরা আছে সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে

নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙঠি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে কেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।”

“ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্মারকর বিল তোমাকে শুধতে হবে না।”

“কিন্তু, লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী পালের ধারে মৃণোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জ্বলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আঁজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মৃণ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।”

লিলি অমিতকে পাগার বাড়ি তাড়না করে বললে, “তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্তর্যমনে থমে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্মারকর গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত থমে পড়ে গেছে, ভুলে গেছে বলে তার হিসেব নেই।”

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেখা গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, “অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?”

অমিত বলে, “বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নিচেই পাত্র।”

সিসি বলে, “অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।”

অমিত বলে, “মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।”

সিসি বলে, “তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।”

অমিত বলে, “আমি মনে-মনে যে-মেয়ের বার্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরতকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌছোয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তবের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।”

সিসি বলে, “অর্থাৎ, সে তোমার বোনের মতো একটুও না।”

অমিত বলে, “অর্থাৎ সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।”

লিসি বলে, “আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্তে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে,

তার কালচার নেই। কেন, ভাই, সে তো এম.এ.তে বটানিতে ফার্স্ট। বিত্তকেই তো বলে কালচার।”

অমিত বলে, “কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিত্ত, আর ওর থেকে যে-আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।”

লিসি রোগে উঠে বলে, “ইস, বিমি বোসের আদর নেই ঠর কাছ! উনি নিজেই না কি তার যোগ্য! আমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।”

অমিত বললে, “পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে-সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।”

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে দাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে,—ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা পাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক খুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে খিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সত্তা কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে কলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনরা ওর যে-অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সঙ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অগ্রমোদিত ও তার বিপরীত কিছু একটা বলে বসবেই।

একদা কোন একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল, ও বলে উঠল “বিশ্ব যখন সত্যের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর এক-শর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে,—খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রেসি পৃথিবী ছেয়ে গেল, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারও গাভী নেই, কেননা তাদের নিজের পুরে বিশ্বাস নেই।”

একদা মেয়েদের পুরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে কস করে বললে, “পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।”

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, “মানে কী হল?”

অমিত বললে, “যে-পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পার্থিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আকিম থাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওআলা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আকিমওআলী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কোঁটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি শরতানী তার জোগান দেয়।”

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে-মনে যুদ্ধসাজ পরে। একজন সেকেন্দ্রে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বন্ধা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভাই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, “কবিমায়ের উচিত পাচ বছর মেয়াদে কবিতা করা; পচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ-কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু চাই, বলব অল্প কিছু চাই। কজলি আম ফুরোলে বলব না, ‘আনো কজলিতর আম।’ বলব, ‘মতুনবাজার থেকে বড়ো দেশে আতা নিয়ে এস তো হে।’ ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ, নুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাসের মেয়াদ। কবিরী হল ক্ষণজীবী, স্নিগ্ধজকরের বয়সের গাছপাথর নেই।...রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো মালিশ এই যে, বড়ো ওঅর্ডসওঅর্থের নকল করে ভ্রলোক অতি অন্তায়-রকম নৈচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্তে থেকে-থেকে করাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চোঁকির হাতা ঝাঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন, তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী কাঁধা থাকবে মর্ত্যে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মালাচন্দন, পাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাকে বলি দেবার পুণ্য দিন,—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিজ্ঞানের শুভলয়। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পূজার প্রণালী এইরকমই। হিন্দী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পূজাও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একষেয়ে করে তোলায় মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।...ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাচ বছর পূর্বকার ভালো-লাগা পাচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় ঝাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে বেচারী জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে। একটু ঠেলা

মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেক্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অস্ত্যোস্তিসংস্কার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাল্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।”

আমাদের মণিভূষণ চশমার বলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, “সাহিত্য থেকে লয়ালাটি উঠিয়ে দিতে চান।”

“একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের জ্ঞাত নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ‘ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফলের মতো নয়, বিদ্রুতের রেখার মতো, স্থায়ালজিয়ার বাখার মতো, খোচাওআলা, কোণওআলা, গণিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দাবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাদতে কাদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছু দিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হস্তমান হঠাৎ লাক্ষ্মীয়ে পড়ে লঙ্কার আগুন লাগিয়ে মনটাকে পৃথস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সম্বন্ধ পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্সকে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্তে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুন্স মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওআলা পাপরের বৃন্দ বানিয়ে চলত তাহলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্তেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।”

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেয়ে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিপেছিল সেটা অমিত্র বক্তৃতার চেয়েও অবোধা হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, “ভালো জিনিস যতো বেশি হয় ততই ভালো।”

অমিত বললে, “ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।... যে-সব কবি খাট-সস্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না, তারা নিজেকে শান্তি দেয় নিজেকে সন্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অল্পকরণের দল চারিদিকে বাহ বেঁধে তাদেরকে মূখ ভাঙাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চূরি গুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসার্ভস অফ স্টোয়ল্‌ন প্রপার্টি। সে-স্থলে লোকহিতের গাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া,— শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।”

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, “জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।”

অমিত ফস করে বললে, “নিবারণ চক্রবর্তী।”

সভার নানা চোঁকি থেকে বিম্বিত রব উঠল— “নিবারণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে?”

“আজকের দিনে এই যে প্রজন্মের অক্ষর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনম্পতি জেগে উঠবে।”

“ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।”

“তবে শুভুন।” বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা কাগজিসে-বাধা পাতা বের করে গার থেকে পড়ে গেল

আনিলাম

অপরিচিতের নাম

ধরণীতে,

পরিচিত জনতার সরণীতে।

আমি আগন্তুক,

আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।

খোলো দ্বার,

বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।

মহাকালেশ্বর

পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,

বল্‌ দুঃসাহসী কে কে

মৃত্যু পণ রেখে

দিবি তার দুৰুহ উত্তর।

শুনিবে না।

মৃত্যুর সেনা

করে পথরোধ।

ব্যর্থ ক্রোধ

হংকারিয়া পড়ে বুকে :

তরঙ্গের নিফলতা

নিত্য যথা

মরে মাথা ঝুঁকে

শৈলতট 'পরে

আত্মঘাতী দস্তভরে।

পুষ্পমালা নাহি মোর, বিন্ধ বক্ষতল,

নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।

শূন্য এ ললাটপটে লিখা

গুঢ় জয়টিকা।

ছিন্ন কস্তা দরিত্রের বেশ।

করিব নিঃশেষ

তোমার ভাণ্ডার।

পোলো গোলো দ্বার।

অকস্মাৎ

বাড়ায়েছি হাত,

যা দিবার দাও অচিরায় !

বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,

পৃথ্বী টলমল।

ভয়ে আর্ত উঠিছে চীংকারি
 দিগন্ত বিদারি,
 “ফিরে যা এগনি,
 রে দুদাস্ত দুরন্ত ভিখারি,
 তোম কণ্ঠধ্বনি,
 ঘুরি ঘুরি
 নিশীথ নিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।”

অস্ত্র আনো।

ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঙ্করে হানো।
 মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
 করি যাব দান।

শৃঙ্গল জড়াও তবে,
 বাধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
 মুহুর্তে চকিতে,
 মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।

হানো মোরে, হানো।
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে
 উৎসবের চাহিব পণ্ডিতে
 দিব্য বাণী।
 জ্ঞানি জ্ঞানি
 তর্কবাণ

হয়ে যাবে খান খান।
 মুক্ত হবে জীবন বাক্যে আচ্ছন্ন দু-চোখ,
 হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।

আজিকার যাহা ভালো
 কল্য যদি হয় তাহা কালো,

যদি তাহা ভস্ম হয়
 বিশ্বময়,
 ভস্ম হ'ক ।
 দূর করো শোক ।
 মোর অগ্নিপরীক্ষায়
 ধন্য হ'ক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায় ।

আমার দুর্বোধ বাণী
 বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি,
 করিবে তাহারে উচ্চকিত,
 আতঙ্কিত ।
 উন্মাদ আমার ছন্দ
 দিবে ধন্দ
 শাস্তিলুপ্ত মুমুকুরে,
 ভিক্ষাজীর্ণ বুভুকুরে ।
 শিরে হস্ত হেনে
 একে একে নিবে মেনে
 ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
 লোকপায়ে
 অপরিচিতের জয়,
 অপরিচিতের পরিচয়,—
 যে অপরিচিত
 বৈশাখের রক্ত ঝড়ে বস্ত্রছুরা করে আন্দোলিত,
 হানি বস্ত্র-মুষ্টি
 মেঘের কার্পণ্য টুটি
 সংগোপন বর্ষণ-সঙ্কয়
 ছিন্ন করে মুক্ত করে সর্বজগন্ময় ॥

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চূপ করে গেল । শাসিয়ে গেল, লিগে জবাব দেবে ।
 সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যশন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে

বললে, “একখানা আন্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুসে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্তে।”

অমিত বললে, “অনাগতকে যে-মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্যো এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।”

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে-মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, “আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?”

অমিত বললে, “সম্ভবপরের জন্তে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ-কথাটাও আমার নোট বইয়ে লেখা আছে।”

“কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।”

“আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তাহলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।”

সিসি বললে, “অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।”

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে গুর দলের লোক কেউ যায় না। আরও একটা কারণ, ওখানে কল্লামায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতের হৃদয়টার 'পরে যে-দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে করেন, তাঁর আনাগোনা ফাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা সব-চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, “যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।”

বাঁ হাতে হাল কারদার ঝেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনেরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনের সমাগম হল তখন সে চারদিক চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্তে—দুদিন না যেতেই বৃষ্টি, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার, খাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার খাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাট্জোয়ার বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্ত-জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিষে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধূয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তার আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, সে-দুঃখ ওর এখানেও যেমন শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। বরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে পানাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আবার এল পাহাড় পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্বরিগীগুলোকে খেপিয়ে কুলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্তে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলাগারি মোটা কবলের মোজা, পুরু স্তবতলাওআলা মজবুত চামড়ার জুতো, থাকি নরকোক কোর্তা, হাটু পর্যন্ত ব্রশ অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না,—মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আকাবাকা সঙ্ক রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে-ঢাকা পদ। এ-রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সজ্জাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি ইকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দ্রবভিনী প্রেয়সীর

অন্তে মোটর-দুটাই প্রশস্ত—তার মধ্যে “ধুমজ্যোতিঃসলিলমক্ৰতাং সন্নিপাতঃ” বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে “দেহলীদন্তপুষ্পা” যে-পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবস্থিকা হ’ক বা মালবিকাই হ’ক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদাক্ষবনচারিণীই হ’ক ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষ্যে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ-কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে—পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অগ্নি গাড়িটা পানিকটা গাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সত্ত্ব মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দারপর্বতের নাড়া-খাওয়া কেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ভ্রমিংক্রমে এ-মেয়ে অগ্নি পাচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্থরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সফ-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তন্ম দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্রাম, টানা চোপ ঘন পশ্চচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অব্যবহৃত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাধা, চিবুক ঘিরে শুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কবজি পয়স্কা, হু-হাতে দুটি সফ প্লেন বাল। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ-করা রূপোর কাঁটা দিয়ে খোপার সঙ্গে বন্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দম্মা হল, একটু কোঁতুকও বোধ করলে। অমিত মুহূর্তের বললে, “অপরাধ করেছি।”

মেয়েটি হেসে বললে, “অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের গুরু আমার থেকেই।”

উৎসজলের যে-উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প-বয়সের বালকের গলার মতো মন্থণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত

অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোটবইখানা খুলে লিখলে, “এ যেন অস্থির তামাকের হালকা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে,—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে, গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।”

মেয়েটি নিজের ক্রটি ব্যাখ্যা করে বললে, “একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোকার বলেছিল এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলাম। এমন সময় উপরওআলার ধাক্কা খেতে হল।”

অমিত বললে, “উপরওআলার উপরেও উপরওআলা আছে—একটা অতি কুশ্লী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীৰ্ত্তি।”

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, “লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।”

অমিত বললে, “আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।”

“দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যাস।”

“দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।”

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, “আমার তরফে আর একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই,—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়—এ-গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছোবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমন কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোকারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।”

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কাই উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া একদমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ছুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুজ করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাস্তা জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্তের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কাই যেমন স্বর্ধ-নক্ষত্রের আন্তন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমতো গাড়ি পৌছোল

যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, “কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।”

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, “আমার সময়ের অভাব নেই, এখনই আসতে পারি।”

•সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল : “পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু-জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রোনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে,—লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে, এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলার স্ত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষ-গুলির মালা। বাধা মাইনেয় বাধা পোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না : আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।”

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, “কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমার 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও !' বেরোল লম্বা সরু পাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল :

পথ বেঁধে দিল বঙ্কনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পক্ষী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগন্তনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,

প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
 অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
 উদ্ধত যত শাখার শিখরে
 রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
 নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
 পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
 বন্ধন তারে করি না খাচায়,
 ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
 কুঞ্জে দুজনে তৃপ্ত।
 আমরা চকিত অভাবনীয়ের
 কচিং কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডলের হাওয়ার সঙ্গে স্কুলকলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটতে সমাজবিন্যাসের যে-ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাকুলে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা ইষ্ঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্য ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাম্যিক। সমূহের ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন সকল পিতামহের নাতিরা যখন এই রকম তারিখের নিপথ্য সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছায় পল্লিকার একেবারে উলটে দিকের টার্মিনাসে। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাহুলি ধুয়ে জল পাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাঙ্ক যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে-বৈশ্বদল নিজেদের

দ্বিজ প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁক। দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋণিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধূনোয়, গোব্রাহ্মণ সেবার শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্চিত্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদান পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপ-কাটলেট-পাওয়া, রামলোচন বাঁজুরজোর কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার নিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পত্নিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন কি, তাঁদের কেউ-কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অমৃত্যুর-বিসর্গের ভুল-চুক না থাকে সেই চেষ্টার লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সর্বস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত,—প্রাগ্‌বন্ধিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাধাই বাংলা অমৃত্যুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষ্যে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অস্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দূকের মধ্যে নিজেকে সেক ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন। এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অভ্যস্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, “মা, এ সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্তে নয়। যারা মৃত, তারা কেবল যে নিজেকেকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবী মুক্ত সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাত্তে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাচে উলটপালট করতে

দুঃখ বোধ করি না—তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মুঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজেকে যখন ভুলতে চাও না, তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।”

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্ন-মশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারিদিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন, তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল; তিনি যোগমায়াকে বলতেন, “মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি স্থখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।” এমন করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের কাগজি কিস্তিত ভাষায় যাকে বলে “বাধ্যতামূলক।” স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এমন পড়ছে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহুসঙ্কানে তার শিক্ষার জন্তে লাভণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

৪

লাবণ্য-পুরাত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিম কালেক্টর অধাক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা পাসের ঘমাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন কি, এখনও তার পাঠ্যভাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিভূষি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নিচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত কাটল মরে যায়, সে-মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামী-সেবা আবাদের যোগ্য যে নরম

জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে—খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাভণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাধা হয়ে থাকল।

তঁার আর একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারও দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্দ্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মাস্তুলটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবস্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই প্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের কর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তঁার বাড়িতে পড়া নিতে, তঁার লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চয়। লাভণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূর্বলবশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাভণ্যর বাধা ছিল না। ঘিধা করে নিজেকে যে-পুঙ্খ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননিগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈষ্ণব ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শপ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপে পেনসিলে-আঁকা লাভণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাটারার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননিগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাভণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে-দাম যে কত বেড়ে যাবে ননিগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গুণায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার কন্দি করছেন এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে? টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়?

এতদিন লাভণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্র

অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফলেট মাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাভণ্যর একটি অযত্নমান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔষতোর ইতিহাস নেই। অথচ শান্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অস্থায়ী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি.এ পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাভণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাভণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাভণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরও হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্তে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্তে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনো দিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাভণ্য মুগ্ধ ফিরিয়ে চলে যেত। এম এ-পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাভণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তাহলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিপিত—তার বদলে আপন পরীক্ষা পাসের অনেকগুলো মোটা মার্ক সে লাভণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই থাকলেও মনসিদ্ধ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানান্তর হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ,—সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থবাহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাভণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই

জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাছে চেপে বসে। সমালোচনার জন্তে মডার্নরিভিউ থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধর্মসাধারণের পুরাবৃত্ত নিয়ে,—অমূল্য্যচিত্র বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন, এক ভাঙা বৌদ্ধস্তুপেরই মতো যার উপরে চেপে আছে বহুশত বংসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তুপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবাগিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ বাধা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে, কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল, নিজের উপরে, ননিগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্তে হুপুরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনই তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিপলেন, বললেন, “পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।”

শোভনলালের মনটা ঢঙ্কল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্তে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ; যে-প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত, সে-সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জানবার জন্তে ওর অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে-পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন হুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্ এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না,—বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ একসময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশবাস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, “আপনি কেন এ-বাড়িতে আসেন?”

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

“আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটতে আপনার সংকোচ নেই?”

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, “আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।”

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত ধর ধর করে কাঁপছে; বোবা একটা বাধা বৃকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত, তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে কসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠি। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বৃষ্টি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন, ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটাল। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্তে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, “আমি তো বিয়ে করতে চাই নি, লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ?”

লাবণ্য বললে, “আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্তেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। যে-পথে আমি যথার্থ স্ত্রী হব, সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।”

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও

অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে
যত কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্ভূত সময়টা ঠাসা ছিল
ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ'র আমল পর্যন্ত,
এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট মারের
রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু
এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ
টুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময়
ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না
করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল :—আর-সমস্ত-কিছুকে
সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে, “জাগো”।
লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে,
জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল।
সে-ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারিদিকে চায়, সকল
জিনিস থেকেই কিসের ছাঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলকে, পড়বার
টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে-বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব
লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুল পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার
উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অগ্রমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে
উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাবাসংগ্রহ। অকস্মাৎ
থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য,
এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ
করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল,

যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা টিলে মলাটের টেক্সটবুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কোঁতুহল ছিল না। আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছোল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতিমূহর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীরের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে-উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল-ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পদা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠেছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, “আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব।”

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধবারীতিতে চুল ছাটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেঁটন করে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতা নেই, দুটি পা নির্মল সূন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, “তোমার কাকা। অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব-চেয়ে বড় উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ক্ষতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ডাকতেন বউদিদি বলে।”

অমিত বললে, “আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।”

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার মা আছেন?”

অমিত বললে, “ছিলেন। মাসি থাকেও খুব উচিত ছিল।”

“মাসির জন্তে খেদ কেন, বাবা?”

“ভেবে দেখুন না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না; বলতেন এটা বাদরাহি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে-মনে বলেন, ছেলেমানুষি।”

যোগমায়া হেসে বললেন, “তাহলে না হয় গাড়িখানা মাসিরই হল।”

অমিত লাক্ষিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, “এইজন্তেই তো পূর্বজন্মের

কর্মকল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্তে কোনো তপস্কাই করি নি—গাড়ি ভাঙটাকে সংকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের স্মৃচনা আছে ভেবে দেখুন।”

যোগমায়ী হেসে বললেন, “কর্মকল কার, বাবা? তোমার, না আমার, না যারা মোটর মেরামতের ব্যবসা করে তাদের?”

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, “শব্দ প্রস্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সন্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?”

যোগমায়ী লাভণ্যর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সন্ধে যথেষ্ট আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিষয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ্য করেই বললেন, “বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার পাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।”

ঋতুতালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, “মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।”

লাভণী বললে, “আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।”

“ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।”

লাভণী হেসে বললে, “ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।”

“আপনি যে-কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।”

“আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়।”

“একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্তরে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে।”

“ঋতুগামী নামটা কী শুনি।”

“বেগ ঋতু করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।”

লাবণ্য বললে, “সহজ নয়, সময় লাগবে।”

“সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব’লে কোনো পদার্থ নেই, ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অমুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।”

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “আপনার কিন্তু স্থানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।”

“ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরও একটু সময় দেন।”

“সময় আর নেই, কাজ আছে” বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্থান করতে গেল না। মিতহাস্তমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কী রকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক স্মৃতি মনে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শাস্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শাস্তির রূপ দেখেছিল যে—শাস্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ষা পেয়ে মরতে হয়, তারাও চলে নিয়মে, আশ্রয় ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেই জন্তে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টা চারদিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে বঁধে রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদাক গাছের কালরঙসো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে—

আঙুনে-জ্বালা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চূপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়লা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্রাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে ঝরা-পাতার শ্রুগন্ধ-ঘন আশ্রয়ের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল তুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেই রকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্রদ্বাগটাতে এসে পৌঁছোলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়লা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধ্যাবেলায়। অমিত সাহিত্যারসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্তে ও পেয়েছিল ঠাধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ-পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শুরু নয় যে, তার কারণ দ্বিভাষ্যের জায়গায় বহুভাষ্য প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অন্তর্পন্থিত থাকবার উপলক্ষ্য ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কতামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে-অন্তর্যোগ লক্ষ্য করেছেন, সেটা সাহিত্যান্তর্যোগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অঞ্চল মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনা উৎসাহ তার আরও প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশংসার করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু' ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য,—এত বাহ্যল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অন্তরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চল।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসম্ভব। ও বলত, যে-জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘূমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘূমের পক্ষে সব-চেয়ে অন্তর্কূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল-সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে—তার পরে পাশ কিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময়-চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বারবার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে বেলা এখনও সাতটার এপারেরই। মনে হল ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে গুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাণ্ডা দিয়ে আসছে লাবণা। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণার অধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণা নারাজ। বাকের মুণ পযন্ত লাবণা যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, “জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়?”

“কিসের অসুবিধা?”

অমিত বললে, “যে-হভভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উপস্থরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে? দেবদেবীদের নিয়ে স্তবধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভূজা অসম্বৃত্ত হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।”

“না ডাকলেই চুকে যায়।”

“বিনা সন্মোদনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।”

“কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।”

“মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লয়টি সার্থক করবার জন্তে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্ত্যের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নিচে আসছে, নিচে থেকে উপরে উঠে চলেছে? মানুষের জীবনেও কি ওই রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না? কল্পনা কল্পন না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ওই রঙিন মেঘের ঝাছ পর্ষন্ত পৌছোল, সামনের ওই

পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ-মুড়ি দিয়ে ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে ভাবতে লাগল, মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট ?”

লাবণ্য কথাতাকে এড়িয়ে বললে, “নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।”

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, “চলতে শিখতেই মাছুবের দেরি হয়, আমার হল উলটো, এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্রাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অঙ্কার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।”

লাবণ্য কথাতাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ওই সবজি ডানাওআলা পাণিটার নাম জানেন ?”

অমিত বললে, “জীবজগতে পাণি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাণি আছে, এমন কি, তারা গানও গায়।”

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, “আশ্চর্য।”

অমিত বললে, “হাসছেন! আমার গভীর কথাতেও গান্ধীর্ষ রাখতে পারি নে। ওটা নুসাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ওই গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।”

লাবণ্য বললে, “আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাণিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।”

অমিত বললে, “দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাণিকে নতুন করে জানছি এ-কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিঃশব্দেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ওই দেখুন না, কথটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।”

লাবণ্য হেসে বললে, “আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরও নতুনের ঘোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে ?”

“এর জবাবে খুব একটা গান্ধীর্ষ কথাই বলতে হল বা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো,—ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-কোটা ভূঁইটাপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস, নতুন করে আবিস্কার।”

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, “আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওআলার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেছি আপনি যে-কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ-কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না,—এক-এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে, বলতে থাকে আমিই লিখেছি, কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি, যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধাই ছিল না।”

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, “বের করতে পেরেছেন?”

“হাঁ, পেরেছি।”

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, “লাইনটা কী বলুন না।”

“For God's sake, hold your tongue
and let me love।”

লাবণ্যর বৃকের ভিতরটা কঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।”

লাবণ্য একটু মাথা বেকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, “হাঁ।”

অমিত বললে, “সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন-এর বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ-লাইন আমার মাথায় আসত না।”

“আবিষ্কার করলেন?”

“আবিষ্কার নয় তো কী? বইয়ের দোকানে বই চোপে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে, আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডন-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেরেছি। মনে হল, অল্প কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়; বড়োলোকের শ্রীক্ষে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডন-এর কাব্যমহল নির্জন, ওখানে ছুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর।

ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।”

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি বাংলা কবিতা লেখেন না কি?”

“ভয় হচ্ছে আজ থেকে লিখতে শুরু করব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড করে বসবে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।”

“লড়াই? কার সঙ্গে?”

“সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে খুব মস্ত কিছু একটার জন্তে একখুনি চোপ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অল্পতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।”

“সে-কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কমুন্সাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োশুড়ো গোছের মাস্তব, অহিংস মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে—তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব, যুদ্ধং দেহি। ওই যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্তে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, গিদে বাড়াবার জন্তে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া পেতে বেরোয়।”

লাবণ্য হেসে বললে, “লোকটা তবু যদি অমাত্ত করে চলে যায়।”

“তখন আমি পিছন থেকে দু-হাত আকাশে তুলে বলব—এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মাস্তব যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যে-রকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে, ভাবনা নেই।”

অমিত বললে, “আমার একটা অন্তরোধ রাখবেন?”

“কী, বলুন।”

“আজ গিদে বাড়াবার জন্তে আর বেশি বেড়াবেন না।”

“আচ্ছা বেশ, তার পরে?”

“ওই নিচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছাতলাপড়া পাখরটার নিচে দিয়ে একটুপানি জল ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে ওইখানে বসবেন আসুন।”

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঝড়িটার দিকে চেয়ে বললে, “কিন্তু সময় যে অল্প।”

“জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্য দেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ মশক মাঝে জল, যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোর মারা না যায় সেটা

নিভান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচূয়াল হওয়া শোভা পায়, দেবতার হাতে সময় অসীম, তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের যেমাদি অন্ন, পাঙ্কচূয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিত-ব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে, ‘ভবে এসে করলে কী’, তখন কোন্ লজ্জায় বলব, ‘ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।’ তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ওই জায়গাটাতে।”

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারও যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্তে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, “চলুন।”

ঘনবনের ছায়া। সূর্য পথ নেমেছে নিচে একটা পাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা একজায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ হুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় পাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়তে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা-তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না,—স্বপ্নে যে-রকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বৃকতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, “দেখুন আশা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু আর একটা চলতি। কিন্তু এ-ছাড়া আরও একটা ভাষা থাকে উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এই রকম জায়গার জন্তে। পাণির গানের মতো, কবির কাবোর মতো,—সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্তে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটেতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্তে যদি ডেক্টেস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন, লাবণ্য দেবী, এখনই আপনার স্মরণ করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?”

লাবণ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, “চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্টা ভদ্র, কোন্টা অভদ্র, তার হিসেব মিটেতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই, অভদ্রও নেই। তাহলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্তে একটা কবিতা না আঙড়ালে তো চলছে না।

গাছে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অহুমতি করেন তো আরম্ভ করি।”

দিতে হল অহুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, “রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।”
“হা, লাগে।”

“আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আৱত্তি করি।”

“আপনি এত ভয় করছেন কেন?”

“এ-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনার জাতিতে ঠেলেন, তাকে নিঃশেষে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে জাতিতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।”

“আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন কঠির জন্তে আমি পরের কঠির সমর্থন ভিক্ষা করি নে।”

“এটা বেশ বলেছেন, তাহলে নিভয়ে শুরু করা যাক।—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,

যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেগছেন? না-চেনার বন্ধন। সব-চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে থালাস পাব, একেই বলে মুক্তিত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষে

বিজড়িত তন্দ্ৰা-জাগরণে

রাহি যবে সবে হয় ভোর,

মুগ দেখিলাম তোরা।

”

৬ক্ 'পরে ৬ক্ রাগি' শুধালেম, “কোথা সংগোপনে

আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?”

নিজেকেই ভুলে-থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেপবার ধন দেপা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে যত্নকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লব টানি’
শব্দ হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা হৃদ হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ভোর,
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

টিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেপকের মধ্যে পাবেন না, সূক্ষ্মগুণে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবন-তত্ত্ব।”—লাবণ্যর মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—

“হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় হবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমাতে চেনার অগ্নি দীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জলি
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।”

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগায়াড় কাছে এসে বললে, “মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদ্যায়ের বেলা কুপণতা করবেন না।”

“পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম-ধাম-বিবরণটা বলো।”

অমিত বললে, “নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।”

“তাহলে ঘটক-বিদ্যায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।”

“অন্ডায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মাস্তবটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যপেট নয়। নামজাদা মাস্তবের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গহিত।”

“আচ্ছা, নামটা না হয় খাটো হল, রূপটা?”

“বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অভ্যাক্তি করে বসি।”

“অভ্যাক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?”

“পাত্র বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই,—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।”

“আচ্ছা নামরূপ থাক, বাকিটা?”

“বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।”

“বুদ্ধি?”

“লোকে যাতে ঙ্কে বুদ্ধিমান বলে ঈর্ষা ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ঙর আছে।”

“বিত্তে?”

“স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে শুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তার মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ক্ষস করে বিশ্বাস করে বসে।”

“পাত্রের যোগ্যতার কদটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।”

“অল্পপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।”

“তাহলে পরিচয়টা আরও একটু স্পষ্ট করো।”

“জানা বর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন, মাসিমা? ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা।”

“সে-ভয় মনে আছে, বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।”

“এ সন্দেহটা পাত্রের পরে দোষারোপ।”

“বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।”

“মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে-কথা বুঝেছিলেন।”

“আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?”

“কী রকম পরীক্ষা চান, বলুন।”

“একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।”

“কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।”

“যে-রত্নকে সন্তায় পাওয়া গেল, তারও আসল মূল্য যে বোঝে সে-ই জানব জ্বরির।”

“মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি স্থূক্ষ করে তুলছেন। মনে হচ্ছে যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা,— জাগতিক নিয়মে এক ভ্রমলোক, এক ভ্রমরমণীকে বিয়ে করবার জন্তে পেপেছে। দোষেগুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনই টেকিতে আনন্দনাডু কুটতে শুরু করেন।”

“ভয় নেই, বাবা, টেকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই ধায় তবেই নূরব লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।”

“আমি যে এ-হেন আধুনিক আমাকে স্তূপ তাক লাগিয়ে দিলেন।”

“আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে?”

“দেখছি বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।”

“তার কারণ আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা বাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল পেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার মাসিমাদের পেলার শপ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।”

“ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরায় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্ন্তে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন?”

“বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনও তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বালাবিবাহ হয়ে না পড়ায়।”

“মাসিমা, আমার মনের স্বর্কীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।”

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলো না। দেপা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল আজ তাকে আন্টনি ক্লিরোপ্যাট্টা পড়বার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আগু কর্তব্য। সে বললে, “অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলে বেড়াত যাব।”

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, “পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না, তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?”

“কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাড়ে তুমি তাই ভাব—”

“ইন্সলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় তাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে-ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা, আর বাধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।”

ঠাং যে-উম্মাহে অমিতসুন্দর ছুটিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অন্তর্মান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, “কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাল উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।”

“সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম?”

“বলেছিলে, ‘অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদগুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।’ বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুটি। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোণাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।”

যতির বয়স বিশেষ কোঠায়। অমিতর মনে যে-চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাভণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, “কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজারদর বেশি, আকব্বারি মোহরের মতো,—কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।”

“তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।”

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, “জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব করো না, ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।”

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেপা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, একধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-একধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালুঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত যুগ্মালিপ্টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে কুমালের উপর কিছু কুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আথরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে তুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চূপ করে রইল, যুদ্দ হাসিতে মুগ্ধ গেল ছেয়ে। অমিত সামনা-সামনি বসে বললে, “সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।”

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিখুঁত পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আথরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, “যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছোট্টে দেব।”

“তা দাও।”

“তোমাকে ডাকব বন্তা বলে।”

“বন্তা!”

“না না, এ-নামটাতে হয়তো বা তোমার বদনাম হল। এ-রকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব, বন্তা। কী বল?”

“তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।”

“কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ডের মতো, কারও কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।”

“আচ্ছা বেশ।”

“আমারও ওইরকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়? বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।”

“নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারি।”

“ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্তে। তুমিই তাহলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।”

“আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।”

“চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে, বধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ওই নামে না হয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী?”

“ভয় হয় এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে স্ত্রী হয়ে যায়।”

“সে-কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা।”

“কী মিতা?”

“তোমার নামে যদি কবিতা লিপি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?—অনন্টা।”

“তাতে কী বোঝাবে?”

“বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।”

“সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।”

“বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেপতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি এ-মানুষটি একেবারে নিজের মতো। পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্টা,

আপন স্বরূপে আপনি ধন্য।”

“তুমি কবিতা লিখবে না কি?”

“নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।”

“এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?”

“কারণ বলি। কাল রাত্রির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয়, তেমনি করেই কেবলই অক্সফোর্ড বুক অফ ভার্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।”

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, “হাত

জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব-চেয়ে ভালো মিল হাতে-হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।”

“কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্তো তোমাকে এত ভয় করি, মিটা।”

“কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আশ্রমে; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আশ্রম অন্তরের। যার মনে নেই সেই আশ্রম, সে যাচাই করবে কী দিয়ে? তাকে পাচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুমুখের কথা। আমার মনে আজ আশ্রম জ্বলছে, সেই আশ্রমের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই টিকল। সব ছ হ শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোল মাকগানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত টেচিয়ে কথা ক’য়ো না, ঠিক কথাটি আশ্রম বলো—

For God's sake, hold your tongue
and let me love ”

অনেকক্ষণ দু-জনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্য হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বলিয়ে নিলে। বললে, “ভেবে দেখো বন্ধা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহুর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলো। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলো শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই যুক্যালিপটস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমানন্দ বাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ওই তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াগালি চাটগাঁ পর্যন্ত চাঁৎকার-শব্দে শব্দের দিকে খুঁবি উঠিয়ে বঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে পবরটা বাংলা দেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।”

“কোনটা ভালো?”

“ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেনাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর পেয়ে পেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে।—আচ্ছা, বন্ধা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।”

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, “তোমার এই চূপ করে পাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কপাকে বরশাস্ত করে দেওয়ার মতো।”

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, “তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়, মিতা।”

“ভয় কিসের?”

“তুমি আমার কাছে কী যে ঢাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।”

“কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এটোটেই তো তোমার দানের দাম।”

“তুমি যখন বললে কর্তামা সম্মতি দিয়েছেন আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।”

“ধরাই তো পড়তে হবে।”

“মিতা, তোমার কচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পণ চলতে গিয়ে একদিন তোমার পেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না,—না না, কিছু বলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ে না। বিয়ে করে তখন গ্রহি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ে না।”

“বন্ধা, তুমি আজকের দিনের শুদ্ধাষের মতো কালকের দিনের কার্পণের আশঙ্কা কেন তুলছ?”

“মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে-রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও পটকা বাসে। তুমি তো সংসার ফাদবার মাহুষ নও, তুমি কচির তুষা মেটাবার জন্তে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্তেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে-মনে জান, থাকে তুমি সবদাই বল, ভালগার। ওটা বড়ো রেসপেক্টেবল; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া, সেই সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।”

“বন্ধা, তুমি আশ্চর্য নরম স্তরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।”

“মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভালোতে গিয়ে প্রকটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছে ঠিক তাই থাকো, তোমার কচিতে

আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না,— তাতেই আমি খুশি থাকব।”

“বন্ধা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশঙ্ক্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছে। তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মাহুঘের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্বাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।”

“আজ তুমি তার কোনটা?”

“যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা পাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, কচির ঢাকা-লগ্নন জালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো, বন্ধা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ?”

লাবণ্য চূপ করে রইল।

অমিত বললে, “বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাকে যেন তাদের কচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লগ্নন, দৌড়ে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলছে, অমিত রায় বদলে গেল। মাহুঘের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মাল্য গাঁপা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কা ধাক্কা, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় কাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ, বন্ধা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁপা পড়ল।”

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ-কথা মনে না-করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মূগ্ধ কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের কসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্তেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জন্ম আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উদ্ভাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চূপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, “আচ্ছা, মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের কুতূহল জন্তে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করার জন্তে এই মহত্মা কুতূহল

ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব-চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।”

অমিত বললে, “তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।”

“আমি চাই নে কবি হতে।”

“কেন চাও না?”

“জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। ভগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জ্বলন্তাই।”

“বন্ধা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে-বলার কী অর্থ। আমার দেপছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বল, ওই লোকটা আমার মনের কথার ভাগুরী। নিবারণ এগনও নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি,—ও প্রত্যেক বারই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর পাতা খাটতে খাটতে অল্লদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা,—কী করে পবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজ পেয়েছি ৷ ও লিখে—

ঝরনা, তোমার স্মটিক জলের

স্বচ্ছ ধারা,

তাহারি মাঝারে দেপে আপনারে

স্বর্ষতারা।

আমি নিজে যদি লিপভূম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকার, তোমার রাগা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে

দুলারে পেলায়ো তারি এক ধারে,

সে-ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো

কলধ্বনি ;

দিয়ো তারে বাণী যে-বাণী তোমার

চিরস্তনী ।

তুমি ঝরনা, জীবনশ্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা । সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারিও তোমার সংঘাতে স্তরে বেজে ওঠে ।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে

মিলিত ছবি,

তাই নিয়ে আজি পরানে আমার

মেতেছে কবি ।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে

ভাঙ্গা আনে প্রাণে পলকে পলকে,

মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি

নির্ঝরিনী,

তোমার প্রবাহে মনেরে ভাগায়,

নিঙেরে চিনি ।”

লাবণ্য একটু স্নান হাসি হেসে বললে, যতই আমার আলো থাক আর ধনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে-ছায়াতে আমি ধরে ঝাপতে পারব না ।”

অমিত বললে, “কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে আর কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে ।”

লাবণ্য হেসে বললে, “কোপায় ? নিবারণ চক্রবর্তীর পাতায় ?”

“আশ্চর্য কিছুই নেই । আমার মনের নিচের স্তরে যে-ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে ।”

“তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মতোই তোমার মনটিকে পাব, আর কোপাও নয় ।”

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে,— পাবার তৈরি ।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, লাবণ্য বৃদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায় । মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না । লাবণ্য যে-কথাটা বললে, সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে । অন্তরায়ার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ বা করে জীবনে, কেউ বা করে রচনায়,— জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে,

নদী যেমন কেবলই তাঁর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব? এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্তেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটার রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্তেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিষয়। এমন কেন হল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল, সেইখানেই মত্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি ঈশমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে-পাণ্ডনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি। এ-কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, “মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?”

“ঠিক বুঝেছি, মা।”

“অমিত ভারি চঞ্চল, সে-কথা মানি। সেইজন্তেই ওকে এত রেহ করি। দেপো না, ও কেমন তরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।”

লাবণ্য একটু হেসে বললে, “ওকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি পসে পসে না পড়ত তাহলেই ওর ঘটত বিপদ। ওর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওর ধাতের সঙ্গে মেলে না।”

“সত্যি করে বলি, বাছা, ওর ছেলেমাছুষি আমার ভারি ভালো লাগে।”

“সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমাছুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে?”

“দেখছ না, লাবণ্য, ওর অমন দুঃস্থ মন, আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেশে আমার বড়ো মার্য্য করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।”

“তা বাসেন।”

“তবে আর ভাবনা কিসের?”

“কর্তা মা, ঠর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।”

“আমি তো এই জানি, লাবণ্য, ভালোবাসা পানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।”

“কর্তা মা, সে-অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন নয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সম্বন্ধ থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্তে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।”

“তা, মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে পানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ,—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।”

“সংসার পাতবার জন্তেই যে-মানুষ তৈরি, তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন্তু যে-মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে-মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে-পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানায়েঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে, আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যে-রকম পায় সেই আর কি।”

“তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য?”

“বিয়ে করে ছুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্তে নয়। জান, কর্তা মা খুঁতখুঁতে মন যাদের, তারা মানুষকে পানিক-পানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্বীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাপবার জো থাকে না।”

“লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।”

“কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ঠর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ঠর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ঠর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরায়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে

ধরা পড়বে এই নিত্যস্থ সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ঠর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।”

• “তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?”

“স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই না।”

“তুমি কী চাও?”

“যতদিন পারি, না হয় ঠর কথার সঙ্গে, ঠর মনের পেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেপা দিয়েছে। না হয় সে, শুটি থেকে বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজ্ঞাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজ্ঞাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে স্ববোধের আলোতে দেপা দিলে, আর স্বধাতুর আলোতে মরেই গেল তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেপা চাই যে, সেটুকু সময় যেন বার্থ হয়ে না যায়।”

“সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে না হয় ক্ষণকালের মায়াকপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়ী?”

লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়ী বললেন, “তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক বই-পড়া মেয়ে, তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শরু হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের কাকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেপেছি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে—দেপলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরে গিয়ে দেপি, তোমার টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাদছ। এ তো কিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সাক্ষী দিয়ে আসি, তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ-কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে? তাই তো বলি ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে বসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।”

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে

অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, “তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল—সমস্তা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।”

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে—এও তো সূক্ষ্ম; যোগমায়ার মঠাকরুন এ-কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, “কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সহ্যেতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।”

যোগমায়া বললেন, “আজ আমার বোধ হচ্ছে কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।”

“না না, তা ব’লো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো,—কেবল বই পড়ব আর পাস করব এমন করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার চের হয়েছে। মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছে। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে ব’লো না, কর্তামা।”

বলে চোঁকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

১০

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল অমিত দিন পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্রের খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু-মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে,—রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর,—

তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ বোয়াম এই তিন ভুতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অল্প অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচীরের সঙ্গে, অব্যাত ছিন্নপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, “বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে?”

অমিত উত্তর করলে, “উমার ছিল নিরাহারের তপস্তা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত পাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাসবাবের তপস্তা,—শাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কত্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কত্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা,—এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছোতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও খণ্ডাসম্ভব সারতে হবে।”

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে কিন্তু যোগমায়াকে বাধা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো,—থেকে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে এই লক্ষীছাড়ার ‘পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বারবার বললেন, “মা লাবণ্য, মনটাকে পাষণ্ড ক’রো না।”

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে শব্দ নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নিচে কতক পোত অমিত একলা বসে একপানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নিচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দায়ের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই কেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দোকানের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, “এ কী কাণ্ড অমিত?”

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, “আমার ঘরটা আজ অসম্বন্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।”

“অসম্বন্ধ প্রলাপ?”

“অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্তে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারিদিকে এলোমেলো অশ্রবষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সৌ সৌ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেক্ট স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি,— ঘরের মিসগভার্মেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিকসের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।”

“মূলনীতিটা কী শুনি।”

“সেটা হচ্ছে এই যে, যে-ঘরওআলা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হ’ক তার শাসনের চেয়ে যে-দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।”

আজ লাবণ্যর পুরে যোগমায়া’র খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে-মনে তার মতিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। “এত বিত্তে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। শুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি। আর যদি চেহারার কথা বলি আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে ছুঁপ দিচ্ছে। বামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন? পোড়ারমুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।”

একবার যোগমায়া ভাবলেন অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, “একটু বসো, বাবা, আমি এখনই আসছি।”

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির “মা” বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওর মনে-মনে রাগ আরও বেড়ে উঠল।

বললেন, “চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।”

সে বললে, “কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।”

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের

মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, পাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে এল বৃষ্টি। বাইরে দমকা হাওয়ার দোঁরাছোঁ পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটকট করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সজোজাত বরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়েদের সময়টার সঙ্গে উর্ধ্ব্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণার মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশাস্ত হয়ে উঠল,—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি—জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হুহ করে কী যে হেকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ গুনতে আশ্রুক লাবণার কথা, অমনি মশু করে, বুক হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা ছুটেবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মার্ভে: রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মাস্তুলের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার গোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল, তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ঢেকে শবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিদ্ধুপারগামী পাণির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে, সেই কথাটির জন্তেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণা আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল, সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বৃকের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দার বেরিয়ে গিয়ে লাবণা খানিকটা ভিজ়ে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে কেললে, নিবিড় একটা নৈরাশ্রে; মনে হল ওর জীবনে যা জলবার তা একবার মাত্র দপ করে জলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্রান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ

চূপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের খারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উত্সাহ হল না।

যোগমায়া একটা চোঁকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীর্ঘ চোপ তার মুখে রেখে বললেন, “সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস?”

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, “এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ, কর্তামা?”

“যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বল না কেন? নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেপো না।”

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মূপ দিয়ে কথা বেরোয় না।

“এইমাত্র যে-দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্তকের মতো কার জন্তে এখানে ও পড়ে আছে? ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবান তা কি একটুও বুঝতে পার না?”

চেপ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, “আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ, কর্তামা? আমি তো ভেবে পাই নে আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে।” এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব? আর কেউ কি এমন করে জেনেছে?”

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল? তাকে আন্তে আন্তে বললেন, “মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেপো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে,—সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও,—একটুও ভয় করো না। যে-আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে-আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তাহলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো, মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।”

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজ়ে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিল্লি ফুলস্বাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো—সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে-কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয়, তার কারণ, একদিকে সংসারে সে মরে আর-একদিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবনাটা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন একদিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরাঁচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-একদিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের গবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে-বাড়ুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝড়ো হাওয়াটা গেছে ধেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “এ কী অন্তায় মাসিমা।”

“কেন, বাবা, কী করেছি?”

“আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন?”

“শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন?”

“শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্তেই আচ্ছ তুমি, আমার মাসিমা।”

“এমন ভেদবুদ্ধি কেন, বাছা?”

“নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা আগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।”

“দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে, অমিত ; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।”

“এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গাঙ্গে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জগ্গে ছন্দের ভাষা দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথু আর্নল্ড কাবাকে বলেছেন ক্রিটিসিজম্ অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই লাইফ্‌স কমেন্টারি ইন ভার্স। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি যেটা পড়তে যাচ্ছি সে-লেখটা কোনো কবিসম্রাটের নয়—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা

রিক্ত হাতে চাস নে তারে,

সিক্ত চোখে হাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিত্রের কাণ্ডালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আনবি যবে

মালা-বদল তখন হবে,

পাতবি কি তোর দেবার আসন

শূণ্য ধূলায় পথের ধারে ?

সেইজগ্গেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কাঁ। এই ভিক্ষে খবরের কাগজগুলো ? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সব-চেয়ে ভয় করি। কবি বলেছেন, ঢাকবার মানুষকে ডাকি, যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তুষার শরিক হতে ডাকি নে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে

বক্ষে ধরিস নিত্য-ধনে,

লক্ষ শিপায় জলবে যখন

দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মাতৃষের প্রথম তপস্যা দারিত্র্যের, নয় সন্ন্যাসীর নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কর্তার আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি এই কুটিরের নাম দেব মাসতুত বাংলা।”

“বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বা পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা।

এ-কুটিরও তোমার সে-সাধনা ভিজ়ে কাগজে চাপা পড়বে না। বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে-মনে নিশ্চয় জ্ঞান পেয়েছ।”

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, “তোমাদের মিলন অক্ষয় হ’ক।”

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমাযার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, “তোমরা একটু বসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।”

বলে গাড়ি করে ফুল ঘানতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুইজনে পাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। একসময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, “আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন?”

অমিত উত্তর দিলে, “কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে-কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মূলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সীতার দিয়ে অগাধ-জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেগানকার সমূহে আমিও কি সীতার কাটছি নে ভাবছ? সে-অকূল কোনোকালে কি পার হবে?”

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো

যায় নি নেয়ে সাহস করি,

ডুবি যদি তো ডুবি না কেন,

ডুবুক সব, ডুবুক তরা।

বগ্না, আমার জন্তে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?”

“হাঁ, মিতা, বৃষ্টির শেষে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌছোলে আমার জীবনে।”

“বগ্না, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ওইখানটা ছিল সব-চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল—তারই উপরে আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ

সেইখানটাই হয়েছে সব-চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি এ হচ্ছে ওই পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি, একে ধামায় কে।”

“মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে?”

“মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিশ্চয়। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম,—কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও!

O what is this ?

Mysterious and uncapturable bliss

That I have known, yet seems to be

Simple as breath and easy as a smile,

And older than the earth.

এ কী রহস্য, এ কী আনন্দরাশি !

জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।

তবু সে সহজে প্রাণে উঠি নিঃশ্বাসি’,

তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,

পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ওই করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। স্তর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিজাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিজাপতি কহে, কৈসে গোড়ায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না, তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি, কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে যাহূব-ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন,—হয়তো না তোমাদের ওই রবি ঠাকুরকে।”

লাবণ্য হেসে বললে, “রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।”

“বন্ধা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মনস্কন নেমেছে। ওয়েদার রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে এক-একদিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার কাটাতে কাটাতে মোটরে

করে একেবারে মোরাদাবাদে দিভুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোট্টে, সময়টাকে হাসতে হাসতে কেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।”

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমার্য সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, “মা লাভণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।”

এটা আর কিছু নয়, একটা অচুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেরেলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো এক সময়ে অমিত লাভণ্যকে কানে কানে বললে, “বন্ধা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।”

লাভণ্য বললে, “কী দরকার, মিতা।”

“তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতপানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবির প্রিয়র মুখ নিয়েই যত কথা করেছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা : ভালোবাসার যতকিছু আদর, যতকিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ওই হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোট্টো একটি কণার মতো ; সে-কণাটি শুধু এই, ‘পেয়েছি’। আমার এই কণাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে থাক না।”

লাভণ্য বললে, “আচ্ছা, তাই থাক।”

“কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।”

“আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।”

“আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।”

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল আগামী অজ্ঞান মাসে এদের বিয়ে। যোগমার্য কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাভণ্য অমিতকে বললে, “তোমার কলকাতার কেবলবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে বাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।”

“এমন কড়া শাসন কেন?”

“সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্তে।”

“এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি কিলজ্জ্বার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ এই ভরা-দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চমকে খেমে-বাওয়া লাইনটা—

চলি যবে গোলা যমপুরে

অকালে!

শিলঙ থেকে আমিই না হয় চন্ডুম কিন্তু পাঞ্জি থেকে অজ্ঞান মাস তো কস করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী করব জান?”

“কী করবে?”

“মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা, ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে, বন্ধা, রঘুবংশে অজ মহারাজা ইন্দুমতীর কৌ বর্ণনা করেছিলেন?”

লাবণ্য বললে, “প্রিয়শিষ্টা ললিতে কলাবিধৌ।”

অমিত বললে, “সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্ষ বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্তে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।”

“মিলনের আর্ট তোমার মনে কী রকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিখা করতে চাও আজই তার প্রথম পার্ট শুরু হ’ক।”

“আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেদেরই ঠকানো। কেননা শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।”

“দামের হিসাবটা শুনি।”

“রসো, তার আগে আমার মনে যে-ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ড হারবারের ওই দিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ করে ধনী-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।”

“আবার কলকাতার কী দরকার পড়ল ?”

“এখন কোনো দরকার নেই সে-কথা জান। বাই বটে বার-লাইব্রেরিতে,—
ব্যবসা করি নে, দাবা খেলি। আর্টনিরা বুকে নিয়েছে কাজে গরজ নেই তাই মন
নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীক আমাকে দেয়, তার বেশি আর
কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে,—জীবিকার
দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমার মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও
নয়, নরমও নয়, খাটুও নয়—কিন্তু ওই শক্তটাই সমস্ত আমার আশ্রয়, ওইটেতেই সে
আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্ত দরকার বুঝেছ তো ?
মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্তে।”

“বুঝছি। তাহলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে
হবে—দশটা-পাঁচটা।”

“দোষ কী ? কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।”

“কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনের ?”

“না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারো আনা ঠাকি। ইচ্ছে
করলেই ভূমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।”

“আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর ?”

“স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গছার ধার ; পাড়ির নিচে তলা থেকে উঠেছে খুরি-নামা অতি
পুরোনো বটগাছ। ধনপতি ষণন গছা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই
বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলার দ্বারা চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছাতলা-পড়া
বাধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-খরা, কিছু কিছু ধসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে
সাদার রঙ-করা আমাদের ছিপছিপ নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে
নাম লেখা। কী নাম বলে দাও ভূমি।”

“বলব ? মিতালি।”

“ঠিক নামটি হয়েছে, মিতালি। আমি ভেবেছিলুম, সাগরী, মনে একটু গর্বও
হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল।...বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু
একটি বাড়ি চলে গেছে, গছার দ্ব্যম্পন্দন বয়ে। তার ওপারে তোমার বাড়ি এপারে
আমার।”

“রোজই কি সীতার দিবে পার হবে, আর জানলার আমার আলো জালিয়ে রাখব ?”

“দেব সীতার মনে-মনে একটা কাঠের সীকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম
মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।”

“দীপক।”

“ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চূড়ায় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধ্যাবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে কিংবে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই সে-চিঠি পেতেও পারি, না-পেতেও পারি। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিক্ষেপে অভিসম্পাত দিয়ে বাট্টাও রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে অনাহৃত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।”

“আর তোমার বাড়িতে আমি?”

“ঠিক এক নিয়ম হলোই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসম্ভব হবে না।”

“নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তাহলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুরকা পরে যাব।”

“তা হ'ক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে-চিঠিতে আর কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।”

“আর আমার নিমন্ত্রণ বৃষ্টি বন্ধ? আমি একঘরে?”

“তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে; চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।”

“এইবার তোমার প্রিয়শিক্ষাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।”

“আচ্ছা, বেশ।” পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে—

“Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো তুমি

আমার বনকুমি

দবিন সাগরের সমীরণ,

যে-শুভধনে মম

আসিবে প্রিয়তম,

ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।”

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, “এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।”

• লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে বাচ্ছিল। অমিত বললে, “না, আমার এই নোটবইয়ে লেখো।”

লাবণ্য লিখে দিলে—

“মিতা, হুমসি মম জীবনং, হুমসি মম ভূষণং,
হুমসি মম ভবজলধিরত্নম্।”

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমূলকাঠই হ’ক আর বকুলকাঠই হ’ক, যখন জলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।”

লাবণ্য বললে, “নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?”

অমিত বললে, “সজ্জাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওরা উঠল ঝিরঝির করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল শ্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিশি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধ্যাবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতে কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিচ্ছিয়ে বসেছ, সামনে রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ো মালা, চন্দনের বাজিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পূজোর সময় অন্তত দু-মাসের জন্তে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দু-জনে দু-জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে।—এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত?”

“মেনে নিতে রাজি আছি।”

“মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে, বন্ধা।”

“তোমার ঘাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।”

“প্রয়োজন নেই তোমার?”

“না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে।

কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহ্যল্য। কিন্তু আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছে দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সহিতে পারবে, সেইজন্তে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।”

অমিত চোঁকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না, বন্ধা, থাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আকস্মিক উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকবে আমি চিদাকাশে কাছে-দূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় ঝাঁপাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পূর্ব দেওয়ালে একখানা আয়নাওআলা দেওয়াল, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা যোদ্ধুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সাকুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই ঝাঁপাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দুহাত তকাত নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিতহস্তে, তাতে লেগা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিরা নীরবে

গুণো দক্ষিণ হাওয়া,

প্রেমসীর সাথে যে-নিমেষে হবে

চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনচ্ছে বন্ধা?”

“কিছু না, মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে?”

“আমার বন্ধু নীলমাধবের বাতা থেকে। তার ভাবী বধু তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করে ওই ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিকসে এম এ. পাশ করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিণে বাতাসও বয়, কিন্তু ওই কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধ্য হবে না।”

“তোমারও ছাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধু কি চিরদিনই নববধু থাকবে?”

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, “থাকবে, থাকবে, থাকবে।”

যোগমায়া পাশের দর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী থাকবে, অমিত ? আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।”

“অগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধু দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাত্ম পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাকবে নববধু।”

“একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।”

“একদিন সময় আসবে, দেখাব।”

“বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ যেতে চলো।”

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, “কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেশ করছে আমি পাসিয়া হয়ে গেছি।”

“আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব ?”

“খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের ? তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর পাসিয়া হওয়া নয়। যে-বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল, এ যে যুগ-বদল তার মাঝখানে একটা কল্লান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নৃতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অল্পমতি দাঁও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।”

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নিচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ঝাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটু-খানি ছুটি পেয়েছে; তার অঙ্কলি ভরিয়ে নিয়েছে অন্তর্যবের শেষ আভাস। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার যুগল উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চূনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ঝাঁকে ঝাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নান্ন রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাভণ্য মুদ্রণের বললে, “চলো এবার।” কেমন তার মনে হল এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাভণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে, ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, “কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আসব না।”

“কেন আসবে না?”

“আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে ধামল—ইতি প্রথম: সর্গ:, আমাদের সময়ে বয়ে স্বর্গ।”

লাভণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে, বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, “বন্ধা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তাহলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।”

লাভণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

“তোমারে দিই নি স্বপ্ন, মুক্তির নৈবেদ্য গেছ রাপি’

রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,

নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্তরাশি,

নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ভ হাসি,

নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি,

ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।”

“বন্ধা, বড়ো অশ্রয় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল? তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।”

“ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, দ্বন্দ্বিতা আসে না—এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?”

“কিন্তু আমি জানতে চাই এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়?”

“রবি ঠাকুরের।”

“তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।”

“বইয়ে বেরায় নি।”

“তবে পেলে কী করে?”

“একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের বাগ, এদিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস! সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।”

“আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।”

“সে-সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।”

“তাকে দয়া করেছ?”

“করবার অবকাশ হল না, মনে-মনে প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।”

“যে-কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।”

“হ্যাঁ, তারই কথা বই কি।”

“তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল?”

“কেমন করে বলব? ওই কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া

এনেছ অশ্রু-জল।

এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া

দুঃসহ হোমানল।

দুঃখ যে তার উজ্জল হয়ে উঠে,

মৃদু প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে,

এ তাপে শসিমা উঠে বিকশিয়া

বিচ্ছেদ-শীতল।”

অমিত লাভণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, “বন্ধা, সে-ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল? জঁঝা করতে আমি ঘুণা করি, এ আমার জঁঝা নয়—কিন্তু কেমন

একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ওই কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।”

“একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতা ছুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরও অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্তেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।”

“সে-বিদায় আর এ-বিদায় কি একই?”

“কেমন করে বলব? কিন্তু এ-তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে-কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাঁড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।”

“বন্ধা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্তে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।”

“দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্তরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো পবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অল্প পাচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।”

“তাহলে আমারও আশা আছে, বন্ধা। আমার বাজারদরের ছোট্টো একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মাঝি নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।”

“আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।”

“রাগ ক’রো না, বন্ধা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আঙড়েতে পারব না।”

“রাগ করব কেন?”

“আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—”

“তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্তে।”

“সর্বনাশ! তার বই! সে-লোকটার অল্প অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—”

“ভয় ক’রো না, মিতা, তুমি তাকে যে-ভাবে বোঝ আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।”

• “কেন?”

“আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঙ্কলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলকেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।”

“আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড়ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা পারাপ হয়ে গেল।”

“কিছু পারাপ হয় নি। হাওয়া ঠিক আছে।”

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদর সুর লাগিয়ে পড়ে গেল—

“সুন্দরী তুমি শুকতারার
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শব্দরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ে দিক্‌দ্রান্তে।

বুঝেছ বক্সা, টাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনাতর রাত পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অন্ধরে মেলে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বন্ধের পরে
আধেক আলোক-রেখা রছ।

ওর এই আধখানা জাগা, ওই অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্তে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া। গ্র্যাণ্ড।

আমার আসন রাখে পেতে
নিজাগহন মহাশূন্য।
তরী বাজাই স্বপনেতে,
তন্ত্রা ঝঁঝ করি স্তম্ভ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বজ্রভা বেশি ; যে-নদীর জল মরেছে তার
মধুর স্রোতের ক্রান্তিতে জ্বলন্ত জমে, যে স্বপ্ন সে নিজেকে বহিতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়।
তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর ধেমের আসে বারে বারে
ক্রান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্রান্তিতেই কি এর শেষ ? এর দিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার
আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল—

সুন্দরী ওগো শুকতারার,
রাত্রি না যেতে এস তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারার
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূর্তী
তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে—

নিশীথের তল হতে তুলি
লহ তারে প্রভাতের জল।
আঁধারে নিজেরে ছিল তুলি,
আলোকে তাহারে করো ধল।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অপিহ্ন সেধা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়ার
তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের
গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারার তাকে
প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোয়ার আছে, তাই
প্রত্যয়ের একটা উজ্জল গৌরব আছে, তোমার ওই রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-
পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।”

“রাগ কর কেন, মিতা ? রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না এ-কথা বারবার বলে লাভ কী ?”

“তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—”

“ও-কথা বলো না, মিতা । আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারও সঙ্গে আমার মিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয় সেটাতে কি আমার দোষ ? না-হয় কথা রইল; তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তাহলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ে, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না ।”

“কথাটা অজ্ঞায় হল যে । পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে এইজন্তেই তো বিবাহ ।”

“রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না । রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই ।”

“ভালো করলুম না তর্ক তুলে । আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধ্যাবেলার সুর নিগড়ে গেল ।”

“একটুও না । যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে-সুরটা খাটি থাকে সেই আমাদের সুর । তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই ।”

“আজ আমার মুখের বিশ্বাস ঘোচাতেই হবে । কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না । ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে । প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোক্সেসারি করেছিলুম ।”

লাবণ্য হেসে বললে, “আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজি বাড়ির বুলডগের মতো—খুঁতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই বেউ বেউ করে ওঠে । খুঁতির মহলে কোন্টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না । বরঞ্চ ধানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে ।”

“তা মানতেই হবে । পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয় । অধিকাংশ স্থলেই ওটা করমাশে তৈরি । ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে । সেই অভ্যাসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমন সাহসের অভাব ঘটে । থাক গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জমায় ।”

“না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে । আজ আমাদের এই সন্ধ্যাবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই । আর-কারও নয় ।”

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, “জয় নিবারণ চক্রবর্তীর। এতদিনে সে হল অমর। বক্তা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারও দ্বায়ে সে প্রসাদ নেবে না।”

“তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে?”

“না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।”

“আচ্ছা কানমলার কথা পরে স্থির করব, এখন শুনিয়ে দাও।”

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

কত ধৈর্য ধরি

ছিলে কাছে দিবসশরীরী।

তব পদ-অঙ্কনগুলিরে

কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগা-পথের ধুলিরে।

আজ যবে

দূরে যেতে হবে—

তোমাতে করিয়া যাব দান

তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে

এ জীবনে

হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,

শূন্যে গেছে চলি

হতাস্রাস ধূমের কুণ্ডলী।

কতবার ক্ষণিকের শিখা

আকিয়াছে ক্ষীণ টিকা

নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।

লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিরহীন কালে।

এবার তোমার আগমন

হোম-হত্যাশন

জ্বলেছে গৌরবে।

যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।

আমার আহুতি দিনশেষে
 করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে ।
 লহ এ প্রণাম
 জীবনের পূর্ণ পরিণাম ।
 এ প্রণতি'পরে
 স্পর্শ রাখো দ্রোহ-ভরে,
 তোমার ঐশ্বর্যমাকে
 সিংহাসন বেধার বিরাজে,
 করিয়ে আছান,
 সেধা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান ।

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাছে মন দেওয়া আজ লাভণ্যের পক্ষে কঠিন । সে বেড়াতেও যায়
 নি । অমিত বলেছিল শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে
 দেখা করতে চায় না । সেই পনটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর । কেননা,
 যে-রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে । মনে তাই লোভ
 ছিল খণ্ডেট । সেটাকে কবে দমন করতে হল । যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে
 তাঁর আঙ্গিকের জন্তে কিছু স্নান তোলেন । তিনি বেরোবার আগেই লাভণ্য সে-জায়গাটা
 থেকে চলে এল যুক্যালিপটাস-তলায় । হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে
 এবং অন্তঃকরণকে ভোলাবার জন্তে । তার পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা
 ওলটানো হয় না । মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ
 হয়ে গেল । আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌপ্যের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ
 ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে । মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে
 আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না । রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে,
 তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে ।
 লাভণ্য তাই ভাবছিল ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি ।
 আজ সেই অসমাপ্তির স্নানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র
 হাওয়ার মধ্যে ।

এমন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুমকাম শবে ঘরে ঢুকেই মাসিমা মাসিমা করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে তাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর ব্রহ্মসক্ত মনকে তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যাধার বোঝা নিয়ে তাঁর সকাল-বেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সত্ত্বাপাতী ফুলের মতো झুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাভণ্যকে ডাকেন নি, বুঝছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাভণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এদিকে যোগমায়া তাঁড়ারঘর থেকে ক্ষুণ্ণপদে বেরিয়ে এসে বললেন, “কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি?”

“ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রঙনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা। সেখানে এক টেলিগ্রাম।”

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “পবর সব ভালো তো?”

লাভণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, “আজই সন্ধ্যাবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্রি, আর তার দাদা নরেন।”

“তা ভাবনা কিসের, বাছা? শুনেছি ষোড়শোড়ের মার্ঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না?”

“সেজন্তে ভাবনা নেই, মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাক করে হোটেলের জায়গা ঠিক করেছে।”

“আর ঘাই হ’ক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ওই লক্ষীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খাপামির জন্তে দারিক করবে আমাদেরই।”

“না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট। ওই নয় আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অভিসন্ধ্যা কামরায়।”

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাভণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে-সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার

মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলের যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাভণ্য বুঝলে যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃষ্ট উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃষ্ট হবে না।

লাভণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, “আমি হোটেলেরই বাই, আর জাহান্নমেই বাই কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।”

অমিত বুঝেছে শহর থেকে আসছে একটা অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টি। মনে-মনে নানা প্র্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা-সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল; লাভণ্যও ভাবলে অমিত ওকে নিয়ে বোনদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাভণ্যর কাছে বিশ্বাস ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাভণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?”

লাভণ্য একটু ঘেন কঠিন করে বললে, “না, সময় নেই।”

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, “যাও না মা, বেড়িয়ে এস গে।”

লাভণ্য বললে, “কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোর বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অজ্ঞায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর তিলেমি করা হবে না।” বলে লাভণ্য ঠোট চেপে মুখ লুক্ক করে রইল।

লাভণ্যর এই জ্বলের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, “আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্তে সব ঠিক করে রাখা চাই।”

এই বলে চলে যাবার আগে বারান্দায় একবার তুচ্ছ হয়ে দাঁড়াল। বললে, “বন্তা, ওই চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ওই বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক, নিশ্চয় ভেবেছে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকবে। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সম্ভান তো পেয়েইছিলুম, সে সম্ভান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ হুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।”

লাভণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, “আর-কারও কথা অত

করে তুমি ভাব কেন? না হয় আর সবাই জানতে পারলে। ঠিকমতো জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।”

এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, “বন্ধা, ঠিক করে রেখেছি, বিয়ের পরে ওই বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গন্ধার খারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ওই বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।”

“ও-বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ, মিতা। আবার একদিন যদি চুকতে চাও দেখবে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্ব্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি, সেটা হচ্ছে ত্যাগের।”

“বন্ধা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি, তৈরি জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্তেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ওইটেকেই বলে এভোলুশন। একটা অনাসৃষ্টি ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ওই ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই, ওরা কি একজন মাত্র? সেইজন্তেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে,—সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেগা—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে

রাত্রি যবে

উঠিবে উন্ননা হয়ে প্রভাতের রথচক্রববে।

হায় রে বাসরঘর,

বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দণ্ড্য ভয়ংকর।

তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,

মালাবদলের হার যত দেখে ছিন্ন ছিন্ন করে,

তুমি আছ ক্ষয়হীন

অহুদিন ;

তোমার উৎসব

বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।

কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল

শূন্য করি তব শয্যাভল ?

যায় নাই, যায় নাই,

নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই

তোমার আস্থানে

উদার তোমার দ্বার পানে ।

হে বাসরদ্বার,

বিশে প্রেম সূতাহীন, তুমিও অমর ।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না । বন্ধা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ওই দরজায় যা দেব, দরজা খুলবে না ?”

“মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না । তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে, তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী ? কিন্তু তোমার ওই কবিতার মধ্যে এগনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু ক’রো না, অন্তত তার মরার জন্তে অপেক্ষা ক’রো ।”

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্ একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাভণ্য তা বুঝেছিল ।

অমিতও বৃষ্টিতে পেরেছে কাব্যের দৃশ্য কাল সঙ্কোবেলায় বেধাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে । কিন্তু সেইটে যে লাভণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না । একটু নীরসভাবে বললে, “তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল পরিদর্শন । ওদিকে লক্ষীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি ।”

তখন লাভণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, “দেখো, মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার । যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না ।” এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্তে দ্রুত অন্য ঘরে গেল ।

অমিত কিছুক্ষণ শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । তার পরে আশ্তে আশ্তে যেন অন্তমনে গেল যুগ্মালিপিটাস-তলার । দেখলে সেখানে আশ্রমটোর গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো । দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যাধি চেপে ধরলে । জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব-চেয়ে সুরুশ । তার পরে দেখলে ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের ‘বলাকা’ । তার

নিচের পাতাটা ভিজ়ে গেছে। একবার ভাবলে কিরিয়ে দিবে আসি গে, কিন্তু কিরিয়ে ছিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোট্টেলে ঘাব-ঘাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল পাছতলাটাতে। রাত্রে ভিজ়ে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজ়ে দিয়েছে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চারদিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুঁদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আন্তে আন্তে বেলা চল যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কমে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা ইপিমে উঠল, চোপ এল জলে ছলছলিয়ে। কাছে এসে বললে, “মিতা, তুমি কী ভাবছ?”

“এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।”

“মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তা তোমার উলটো ভাবনাটা কী রকম শুনি।”

“তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলায় উদাস-করা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ওই পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলাওআলা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হ'ক, বন্ধা, তুমি আমাকে বন্ধঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।”

“ভায়মণ্ড হারবারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর-বেচারিও গেল। তা যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কী রকম করবে? দিনান্তে তুমি এক পাছশালায় ঢুকবে, আর আমি আর-একটাতে?”

“তার দরকার হয় না, বন্ধা। চলাতেই নতুন রাপে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।”

“হঠাৎ এ থেরালটা তোমার কেন মনে হল, মিতা?”

“তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একপানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদওআলা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পঞ্চলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়, আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।”

লাবণ্যর বৃকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কণাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, “শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব পবনটা শুনেই ইচ্ছে করে।”

“এক সময়ে সে খেপেছিল আকগানিহানের প্রাচীন শহর কাগিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল, সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজান্ডারের যবনযাত্রা। খুব কবে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকাহুন অভ্যাস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন তাঁদের কাছে পরিচয়-পত্র দিতে, ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে হিমালয়ের পূর্ব-প্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খাপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোঁওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের গুঁথি পড়তে, মানব-বিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান?”

“কী, বলো।”

“প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ ঠাকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলাম, নানা কথার হল প্রায় রাত দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল, একটা ফুলস্ব জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল, নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কণাটাকেই বৃষ্টি পথ চলতে চলতে ও পায়-পায়ে খইয়ে দিতে চায়।”

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিষ্টত্বের ঝোঁক এল, ছুয়ে পড়ে দেখতে লাগল, বাসের মধ্যে সাদার-হলদের মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো শুনে দেখার অক্ষরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, “জান বসন্তা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।”

“কেমন করে?”

“আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু-মাস ধরে মনে-মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ভেঁকে বললুম, এস বধু, ঘরে এস। তুমি আজ বধুসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না, বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।”

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণা হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, “মিতা, আর নয়, সময় নেই।”

১৪

ধুমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুন্দ বাঙালি জানে। গভর্নমেন্ট আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকাভাগাগগনে কোন্ গ্রহ রাজ্য হৈল কে বা মন্দির। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফাস্ট ম্যাগনিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অন্তসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয়নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখো—আর্টনি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধুমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে-গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অন্তর্ভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই তাতে ধুমকেতুর ল্যাজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ষাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা বধু উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুপট থাকে

এইটাই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুরি সেটা বৃষ্টিতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিস্তার অন্তর্গত। চুরিবিস্তার মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেণবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অঙ্কের শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে “অমিত রায়ের অমিতাচার।” মুখে সব-চেয়ে নিশ্চয় করেছে যারা, মনে সব-চেয়ে রসভোগ করেছে তারা। যুক্ততের বিকৃতি-শোধনের জন্তে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতি বিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুক্তিধমাকৃত অত্যাধিক উদ্গারে সিসি-লিসিমহলে কোতুকে কোতুহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অসুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্রের দাশ্য নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে-মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষাত্মক ধনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতি-সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাঙ্গামটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গহিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তি-নিরূপণে অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি,—কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তার দাহরেশা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের শ্রোতে অমিতর খুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায় টেনে ডাঙার তোলা আশু দরকার। এ-সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিশ্বের যে আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল ঘুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্ত ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্তেও; বিভ্রাটের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা

যায়। এই জন্তে আট-সরস্বতীর অঙ্গুলরণে যুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজ্ঞদারিতে পরিপক্ব বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে কলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। করাসি ছাঁচে সে তার গৌণের দুই প্রত্যঙ্গদেশকে সমস্তে কণ্টকিত করেছে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সখ্য অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরও ভালো করবার মহার্ঘ্য সাধনায় তার আয়নার টেবিল পারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-খোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুলা হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোস্টে করাসি খোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো—এ-সব দেখে ওর অভিজাতা সম্বন্ধে দ্বিধাক্রি করতে সাহস হয় না। যুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজেন্সি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা, এমন সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কপূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর ম্যাড-বিকীর ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্থরে এই রকম গদগদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুঙ্খ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কাষদাকারখানার বকষম্পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা,—বিলিতি কৌলীশ্চের ঝাঝালো এসেম। সাধারণ বাড়ালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অঙ্গকরণের উন্নতশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আত্মলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল দ্বিধ, এখন মনে হয় সে যেন থাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধখোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার-বার বঁকে বঁকে তার মধ্যে ঝাঁকা অঙ্কুরের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অগ্র একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো

চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে ধরের উদ্ভিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জিতনখররমণীর দুই আঙুলে চেপে সিগারেট ধার সেটা বতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব-চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্ভূত করে সেটা ওর সমুচ্চ খুঁওআলা জুতোজোড়ার ফুটল ভদ্রিমার ; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্তৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দস্ত পদোন্নতির কিছুত বক্রতার ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ক্রটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনও আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেখের ডিগ্রি এখনও পায় নি, কিন্তু ডবল প্রমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলনবলন টগবগ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনার দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবধানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। খুঁওআলা জুতোর যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঁকি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনও আলঙ্কার্য অভিযুক্ত ; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যাস, অথচ এখনও এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা ; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান ধাবার আসক্তি এখনও প্রবল ; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না, ক্রিস্টমাসের প্লাম্ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওআলীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সন্ধ্যাে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাঘণ্য গবর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্তেই তার “স্পেশাল ক্রিয়েশন”। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কবে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপট হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চারজোড়া চক্রে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্তে মেয়েদের সন্ধ্যাে বিচারবৃত্তিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরোট নির্বোধ করে। তাই, স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয়-মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত কুসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কী রকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ার অমিতকে কিছুই

জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পৌচ গ্রাম্য রং। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রথম নাগরিক, চাঁচা মাজা বকবকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ার রংটা কিছু মদলা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অন্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিম্নের কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, “দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠেছ, যাকে বলে গ্রীন, এধানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিং নয়।”

অমিত ওঅর্ডসওঅর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেখে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন “mute insensate things.”

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগলভ্যতার সুপট, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল লাভণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায় সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোকা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ডেউ থাকছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয় কাঁড়ো হাওয়ার যে-কলাগাছের পাতাগুলো কালি কালি হয়ে বুলছে তারই মতো শতদীর্ঘ ভাবখানা। আরও ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাল্লার লাভণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিরে যায়। বলে, খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি। খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল তা অন্তরের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবস্থার মতো ভাব করত যেন হাওয়ার স্ফূটকরতা ছাড়া শিলঙে আর

কিছু আছে এ-কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে-মনে হাসে, কেটি মনে-মনে অলে। নিজের সমস্তটাই অমিত্য কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাক্ষু লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীদুগলের কাছে বলে, “চলেছি এক অলপ্রপাতের সন্ধানে।” কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্ অভিমুখী, তা নিয়ে অল্পদের মনে যে কিছু ঝোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক আরগায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেছে। মেয়ে দুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাবায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কোঁতুহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত্য বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আশ্রয়ভীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাক্ষু দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে আর ঘেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এদিকে নরেন গেছে ষোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্তে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদি চাড়া অন্তে কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমারার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেল না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন লিফ্টারী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না; এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টকটক করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, “দুঃখিত।”

লাবণ্য চোঁকি ছেড়ে উঠে বললে, “কাকে চান আপনারা?”

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রণব কাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, “মিস্টার অমিত্যের এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এসুম।”

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিত্যের কোন্ জাতের জীব। বললে, “তাকে তো আমরা চিনি নে।”

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ-ঠাঠাঠা ঘরে গেল, মুখ পড়ল

একটা আড়হাসির রেখা। কেট ঝাঁজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, “আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him।”

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, “কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে থবর পাবেন।”

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার টাচার?”

“হাঁ।”

“নাম বুঝি লাবণ্য?”

“হাঁ।”

“গট ম্যাচেস?”

হঠাৎ দেশলাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেয়ে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, “দেশলাই।”

সুরমা দেশলাইয়ের বাস্তু নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “ইংরেজি পড়?”

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, “গবর্নেন্সের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানার্স শেখে নি।”

তার পরে দুই সবীতে টিগুনী চলল। “ফেমাস লাবণ্য! ডিগ্রীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাডায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এধার থেকে ওধার। সিলি। মেন আর ফানি।”

সিলি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিলির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে অমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। একদিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্যদিকে ওই অদ্ভুত ধরনে কাপড়-পরা গবর্নেন্স। মুখে মাখন দিলে গলে না, ঘেন একতাল ভিজে স্নাকডা, কাছে বসলে ঘনটাতে বামলার বিস্মুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে?

“সিলি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাটে। কোন্ এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে প্রেমল।”

এই বলে টেবিলে অ্যালজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রূপোর শিকলওআলা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেনসিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়

সিসির বশেষ্ট রাগ হয় না, এমন কি, ভিতরে ভিতরে একটু মেনে দেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী হেকি এঙ্গেলদের 'পরে। দাশার সবুজে সিসির এই সর্কোভুক ঔদাসীন্ডে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে কাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাধা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল কাঁকড়া চুলে দুই চোখ আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায় ট্যাবি নামধারী কুকুর। সে একবার জ্ঞানের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্খিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম স্ত্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, “নটি ডগ।”

কেটি চোঁকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়া'কে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আকোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। গুরু ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করেছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়া'কে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, “আমি সিসি, অমির বোন।”

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, “অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই, মা।”

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, “এস, মা, ঘরে বসবে এস।”

সিসি বললে, “সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।”

যোগমায়া বললেন, “এখনও আসে নি।”

“কখন আসবেন জানেন?”

“ঠিক বলতে পারি নে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।

কেটি তার স্বহানে কসেই তীব্রতায় বলে উঠল, “ঘে-মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালেই জানেই না।”

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে। এ-ও

বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিঙ্গ পরিহার করে বললেন, “তুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।”

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাবায় বললে বোঝায়, “লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।”

আসল কথা, গোড়াতেই লাগণাকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে-মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাভীর্ষ তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চোঁকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত,—একটু সে বিরোধ নয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীক, অকৃত্তিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজ্ঞান কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখে ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রুচতাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রুচতার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের,—সে কেটিকে মনে-মনে বতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেয়ে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখোরা আপত্তি লুকিয়ে ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া ক’রে ভাঙতে হবে। চোঁকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্তে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। ভবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পান্চাত্যিকতার যাদের ভ্র এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত—*that much for it!*

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বোরয়ে এল মাথায় ছিল ক্রেন্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিভি কোর্ড। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধূতি আর শাল। এই বেশাঙ্গেরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেলফ, একটি কাপড়ের তোয়াক, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেশারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেয়ে

এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাভগার শাসন কড়া, সুস্থমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে, বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পানসভার পূর্বে এ-বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে কেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাভগ্যাকে পরাবে তার সমস্ত অমুঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ-দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে লাভগ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে—একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে কিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে রেখেছ,—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ-কথাও মনে করে এসেছিল যে, ওকে বলবে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচূলালিটি;—কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নখর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে?

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা স্নান, আলোর চেহারাটা বেলা পাচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভ্র ইশারার আকাশের প্রতিবাদ করে। যেমন বহুদিনের জঁরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর ধার্মমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের বখেটে আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দার যে-কোণটার বসে লাভগ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাত্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে-জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাঞ্ছিত উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনও তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাভগ্যাকে বলেছিল নিয়মপালনটা মাসুবেয়, অনিয়মটা দেবতার; মর্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃততে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্ত্যেই দেখা দেয় তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাভগ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাভগ্য মনের

মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে আলিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিশ্রাৱ চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সংবর্ধনা করবার জন্তে আবার অসংযত হয়ে উঠল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সম্ভাব্যপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে “মাসি” বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ-সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, “মাসিমা, লাবণ্য কোথায়?”

“কী জানি, বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।”

“এখনও তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।”

“বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।”

“চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।” যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু টেচিয়ে বলে উঠল, “অপমান। চলো, কেটি, ঘরে যাই।”

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, “কোনো ফল হবে না।”

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বললে, “হতেই হবে ফল।”

আরও খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, “চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।”

কেটি বারাগুয় ধরা দিয়ে বসে রইল। বললে, “এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।”

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটু নিলিগু শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল।

একমুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথার রক্ত চন করে উঠল, লাগ হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাগি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, “মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিতাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।”

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোরা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুকুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে বৃদ্ধবোধণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্ভত নব্বর ও ফৌসফৌসানিতে বৃদ্ধের আশুকল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস গর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সঙ্ক করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগের উদ্দেশ্যে। কুকুরটা কেই কেই করে অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগা নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু ধামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, “সিসি, এঁরই নাম লাবণা। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে, আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতার অজ্ঞান মাসে।”

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, “আই কনগ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে, রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।”

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমতো হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুললে কথাটার খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুললে না।

অমিত তাকে বললে, “আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ? আমি বলেছিলুম বস্ত্র মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ;—আমার কোন কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাণ্ডাভাবে পারে না।”

কেটি শাস্তবরেই বললে, “কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিভ হল, এবার আমারও যাতে ছার না হয়, সেটা করো।”

“কী করতে হবে, বলো।”

“নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যানরা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ-দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো না, ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনা হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose।”

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, “মনে পড়ছে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোন পার্শিয়ান কিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসেছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়? মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।”

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, “অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে, কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, কস করে বলে ফেললেন, অমিটকে জানেনই না। তবু সান ডে স্কুলের বিধানমতো ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শত্রু পক্ষের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন, আর অজ্ঞানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন, এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো, সিসি, কী অদ্ভায়।”

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে ঝোণ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বললে, “অমিট তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সাক্ষ্য থাকবে না। এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। একমুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার মেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাঁছাড়ে কি একে বাজিতে ধোয়াতে হবে?”

সিসি বললে, “বাজি রাখতে গেলে কেন, ভাই?”

“মনে-মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মাহুকের উপর ছিল বিশ্বাস।

অহংকার ভাঙল,—এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আশ্বরে আংটি দিয়েছিল কেন? সে-দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাধন ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।”

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এস, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি মুবক ছিল কেটির প্রণয়মুখ্য। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতেরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার দৈর্ঘ্য হারিয়ে কেলেছে। সেইক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে, তার মধ্যে অনেক কথাই উহা ছিল কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night

And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে-মনে বলেছিল, “মন আমা,” ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে, বধু।

আজ অমিতের মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না, কী বলবে।

কেটি বললে, “বাক্তিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক, অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।”

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই ক্ষতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা :

শিলঙে কাল রাতে এসেছি। যদি দেখা করতে অসুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই কিরব। তোমার কাছে শান্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় ক'রো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে-অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার ককণ ভীকৃত। ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিচার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধৃত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুম্বতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে-মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল :—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক কেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত বাধিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমতে ঝেঁচে রইল? আপনাই আন্তরিক মাহাত্ম্য।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে,

তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছি কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে কিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, “বন্ধা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।”

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল, ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, “চলো।”

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে তাতেই মনের কথা ঝেঁটুঝেঁটু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুণ পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আগনার শব্দ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতিশুকুমার সবুজের আভা আন্তে আন্তে নুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে ধেমে সেইদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আন্তে আন্তে বললে, “একদিন একজনকে যে-আংটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে-আংটি খোলালে কেন?”

অমিত বাধিত হয়ে বললে, “তোমাকে সব কথা বোকাব কেমন করে, বন্ধা। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?”

লাবণ্য বললে, “তাদের মধ্যে একজন স্রষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।”

অমিত বললে, “কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে-আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দারিদ্র্য কেবল আমার একলার নয়।”

“কিন্তু, মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে-কারণেই হ'ক আগে তোমার মূর্তী আলগা হয়েছে তার পরে দেশের মূর্তীর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দেশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।”

“বলো, নিশ্চয় রাখব।”

“অস্তুত হৃদ্যধানেকের জন্তে তোমার দলকে নিয়ে ভূমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এস। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার ওকে আমোদ দিতে পারবে।”

অমিত একটুখানি চূপ করে থেকে বললে, “আচ্ছা।”

তার পরে লাবণ্য অমিতর বৃকে মাথা রেখে বললে, “একটা কথা তোমাকে বলি, মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে-অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে

তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ে না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।”

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াক্ষের এই পৃথিবী যেমন অন্তরশ্মি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শাস্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত কিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই যুগ্মালিপটাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, বানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, “ঘর খুলে দেব কি? ভিতরে বসবেন?” অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, “হ্যাঁ।”

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেলফ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেখাকা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেনসিল টেবিলের উপরে। পেনসিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রণয় করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে-মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্ধ্যমে বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটির। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন কি, যোগমায়া তাঁর কেশরাশিও কিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন গুনতে পেলে, শাস্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান, বাছা। সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের স্ত্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সাধন পেল না।

শেষের কবিতা

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনে অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিস্ত্রির বাইরেকার রংটা ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণাস্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মাহুষ। সে-মাহুষটিও একে একে আপন উপকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে কল ধরবে আশা করে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড়ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নিরঙ্কুশতা, যে-মেয়ে একদা কিনকিনে শাস্তিপুত্র শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামাশেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিছতে ডাকে “কেয়া” বলে। এ-কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের “নিরুদ্ধেশ যাত্রা।” কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিত্বের মাঝদরিরায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অশচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতী এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতীকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সঙ্কেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না, যতী বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতীকে ডাক পাড়ে না। যতীর বয়সে এ-কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর “নিরুদ্ধেশ যাত্রা”র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির আরণ্য হওয়া অসম্ভব।

যতী আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গান্ধে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, “অমিতদা, শুনলুম, মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?”

অমিত একটুখানি চূপ করে থেকে বললে, “লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে?”

“না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চূপ করে আছি।”

“খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে।”

যতী হেসে বললে, “এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।”

“দেখো, যতী, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিকশনারিতে যে-কথার এক মানে বেঁধে দিই মানবজীবনের মধ্যে মানেটা স্মৃত্যুমান হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।”

যতী বললে, “অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।”

“আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।”

“তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না।”

“সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহলেও আর-একটা কথা গিয়ে পড়বে, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরও বেশি জ্যাস্ত।”

“তাহলে অমিতলা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব আর মানেটা ধীরে তাড়া করলে ভাইনে, আর ভাইনে তাড়া করলে ধীরে মারবে দৌড় এমন হলে তো কাজ চলে না।”

“ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মূণ ফুটেছে। সংসারে কোনো-মতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাটি, কথাটাকেই জাহির করি; উপায় কী? তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হ’ক চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।”

“তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই থতম করতে হবে?”

“এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয় তাহলে থতম করতে দোষ নেই।”

“ধরে নাও না প্রাণের গরজেই।”

“শাবাশ, তবে শোনো।”

এইখানে একটু পানটাকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতী আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অস্থান করা যেতে

পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাধে সাহিত্যালোচনা এবং সারাছে মোটের করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বাঙ্গকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, “অন্নিজেন একভাবে বয় হাওয়ার অদৃষ্ট থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অন্নিজেন আর-একভাবে করলার সঙ্গে যোগে জলতে থাকে, সেই আশুদন জীবনের নানা কাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ ?”

“সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।”

“যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।”

“তোমার কথা ঠিক বুঝছি, কি না, সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর একটু স্পষ্ট করে বলো, অমিতজা।”

অমিত বললে, “একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।”

“কিন্তু বিবাহে তোমার ওই সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না ?”

“জীবনে অনেক সুযোগ ঘটেতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মাহুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো,—যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সে-ও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।”

“কিন্তু—”

“কিন্তু তুমি থাকে মনে কর রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে ! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাব্দ ছাচে ঢালানি করে জোপাতে হবে না কি ? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাব রোম্যান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে ধেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোমান্টিক ! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাছুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার

মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের কাঁকা রাস্তায়। জয় হ'ক আমার লাভণ্যর, জয় হ'ক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হ'ক অমিত রায়।”

যতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, “দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়—কথাগুলো লঙ্ঘিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জ্বল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাভণ্যর সঙ্গে আমার যে-ভালোবাসা, সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে মীতর দেবে।”

যতী একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, “কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?”

“যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।”

“কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—”

“তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাভণ্যর কাছে তিনি স্বর্গী।”

“তা হ'ক, শ্রীমতী লাভণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।”

“নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌছিয়ে দেবে?”

“দেব।”

অমিতর এই চিঠি :

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে ধামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে—অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ-কথাটা তোমাকে জানাবার জন্তে :

তব অন্তর্ধানগটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলঙ্কারলোকে তোমার অন্তিম আগমন ।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমগ্নি ;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি ।

জীবন আধার হল, সেইক্ষেপে পাইতুম সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান ।
বিচ্ছেদের হোমবহি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে ।

মিতা

তার পরেও আরও কিছুকাল গেল । সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের
অন্নপ্রাশনে । অমিত গেল না । আবামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো
তুলে দিয়ে বিলিরম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে । এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা
এক চিঠি তার হাতে দিলে । চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের
পবন । বিবাহ হবে ছ-মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে । অপর পাতে :

কালের যাত্রার ধনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আধারের বন্ধ-কাটা তারার ক্রন্দন ।

ওগো বন্ধু,

সেই ধাবমান কাল
জড়িয়ে ধরিল মোরে কেলি' তার জাল,—
তুলে নিল ক্ষতরথ
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে ।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চকল বেগ হাওয়ার উড়ায়
আমার পুরানো নাম ।

কিরিবার পথ নাহি ;
 দূর হতে যদি দেখ চাহি
 পারিবে না চিনিতে আমায় ।
 হে বন্ধু, বিদায় ।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
 বসন্ত-বাতাসে
 অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
 বরা বহুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
 সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
 তোমার প্রাণের প্রাস্তে ; বিশ্বতপ্রদোষে
 হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
 হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি ।
 তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
 সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
 সে আমার প্রেম ।
 তারে আমি রাখিয়া এলেম
 অপরিবর্তন অর্থা তোমার উদ্দেশে ।
 পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
 কালের যাত্রায় ।
 হে বন্ধু, বিদায় ।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি ।
 মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
 যদি স্রষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
 হ'ক তব সম্ম্যাবেলা,
 পূজার সে থেলা
 ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যাহের স্নানস্পর্শ লেগে ;
 তুমার্ত আবেগ-বেগে
 ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে ।

তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
 যে ভাব-রসের পাত্র বাগীর কুশায়,
 তার সাথে দিব না মিশারে
 যা মোর খুলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
 আজ্ঞা তুমি নিজে
 হয়তো বা করিবে রচন -
 মোর স্বত্বটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
 তার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
 হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
 আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
 মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
 শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
 উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
 সে-ই ধন্ত করিবে আমাকে।
 স্তম্ভপক্ষ হতে আনি'
 রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
 যে পারে সাজাতে
 অর্ঘ্যধালা কুম্ভপক্ষ রাতে,
 যে আমারে দেখিবারে পায়
 অসীম ক্ষমায়
 ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
 এবার পূজায় তানি আপনারে দিতে চাই বলি।
 তোমারে যা দিয়েছিলাম, তার
 পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
 হেথা মোর তিলে তিলে দান,
 করণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
 স্বপ্ন-অঙ্কলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,
 হে ঐশ্বর্যবান,
 তোমারে যা দিয়েছিহু সে তোমারি দান ;
 গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
 হে বন্ধু, বিদায় ।

বন্ধু!

২৫ জুন, ১৯২৮

ব্যালাক্লয়ি, বাঙ্গালোর

প্রবন্ধ

রাজা প্রজা

রাজা প্রজা

ইংরেজ ও ভারতবাসী

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire ; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion ; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed ; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself :

Matthew Arnold

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলঙ্কার প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোনো ছিদ্র থাকে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্বলতা সেইখানে তাহার স্বেহও বেশি। ইংরেজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঐক্যতাকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দৈপায়ন সংকীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ “জন”-পুংগব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন স্নান্যের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবধানা এই যে, টেকি যেমন স্বর্গেও টেকি, তেমনি ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ, কিছুতেই তাহার আর অন্ত্রাধা হইবার জো নাই।

এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অমুচর-আশ্রিতবর্ণের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বৃদ্ধিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরেজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলঙ্কার একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরেজ সে ছিন্ন যত্নপূর্বক রোধ করে, যেখানে যত পথঘাট আছে সর্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে একটি নৈতিক বিশ্ব আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দম করিয়া তুলিতেছে—কখনো কখনো অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশত কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন এক জন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্তক্ষেত্রময় হই হই করিয়া বেড়াইতেছে পাছে পাশিতে শস্তের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়। পাশি পলাইতেছে বটে কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো পেয়াল নাই।

আমাদের কোনো শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওআলার যে কোনো লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরেজ সর্বত্রই ইংরেজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্ল্যান্ডের সহিত ইংরেজের যে-সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে-সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে ইংরেজের সহিত ইংরেজি শিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।

আমরা যে, সকল জায়গায় সুবিচারপূর্বক পাটকেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই চেলো মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অগ্নায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ণায় কোনোটা অগ্নায় হইতে পারে; আসল বিচার বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? শাসনকর্তা ধবরের কাগজের কোনো একটা প্রবন্ধবিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্যন্ত জেলে দিতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে-সমস্ত ছোটো ছোটো কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কী প্রতিকার করা হইল?

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যোগে ইংরেজরাজের আর সর্বত্রই গতিবিধি আছে কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয়তো সে-জায়গাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরেজের মেরুদণ্ড কোনোখানেই ঝুকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরেজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অগ্রিম সমালোচনা চলিতেছে ইহার সহিত “পীপলের” কোনো যোগ নাই;—এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওআলার বুদ্ধগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভালো; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে চতুর লোকে রং করিয়া দিয়াছে। তবে তো আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে-চতুর লোকটাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ওইটেই ইংরেজের দোষ। সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনোক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না;—যে-পরিমাণে দূরে থাকে যায় সেই পরিমাণেই নিফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ তো জড়ময় নহে যে, তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা ক্ষয় আছে এবং সে-ক্ষয়টা সে তাহার জামার আঁতুনে বুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয় তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রাখা করিতে চাহে তাহাদের অস্ত্রাস্ত্র অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরেজের বিস্তার ক্ষমতা আছে কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লেবে গিয়া পেনগ থাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া অল্পগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগপূর্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীরমনের নিকট হইতে বখাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহার দয়া করে না উপকার করে, ঘেহ করে না রক্ষা করে, শ্রদ্ধা করে না অথচ জায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শশু উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে? এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার কল ফলে না?

আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরেজকৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহার মনের মধ্যে কিছুতেই আনন্দপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোনোক্রমে তাহার কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্তায় ইংরেজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরেজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না, অবশেষে যখন বমনোদ্বেগ হয় তখন চোপ রাঙাইয়া হৃৎকার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গৃঢ় মনঃক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয়তো যেখানে পাচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্রভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অমুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপর পক্ষ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অমুষ্ঠানমাত্রেরই আপস ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুস্থস্থলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড়ো বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই গবর্নেন্ট ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না; সে আপনার বৃহৎ অভিজ্ঞত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলি কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনোটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না—যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মতো কোনো একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্নেন্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃতপক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপ সংকটে পড়িতে হয় ইলবার্ট বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সংপক্ষে এবং স্ফূর্তিপূর্ণ রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল

করিয়া লাইন পাতিতে হইবে। ধৈর্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায় তার পরে ক্ষতবেগে চলিবার সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজ্যপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই; এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার যুক্তি দ্বারা প্রস্তাববিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্বাংশে দুর্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্ণমেন্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্বদাই ডিপ্লমাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সথাপেক্ষা আবশ্যিক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্তায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না শস্তুরবাড়ি যাইতেছি তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শস্তুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সেন্থলে পুষ্করিণী ঘুরিয়া যাওয়াই ভালো। আমাদের রাজনৈতিক শস্তুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা সরটা মাছের মুড়াটা আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লজ্জন করিলে চলে সেখানে লজ্জন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভালো।

ডিপ্লমাসি অর্থে যে কপটচরণ বৃত্তিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম এই, নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সেদিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা দূরো দিবার, বাহবা লইবার, এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুশি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল

তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভংসনার পর সংগত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্নমেন্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন একটা অসদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কর্তব্যাপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভালো হইতেছে না। গবর্নমেন্টও বাহ্যত যেমনই হউক, মনে মনে যে এ-সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কী? ব্রিটিশ চরিত্র, হাজার হউক, মনুষ্যচরিত্র তো বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব-প্রথম সংকট বর্ণনাইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধূইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণসম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড়ো কঠিন। শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রংটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরেজি তর্জমা এবং এনসাইক্লোপীডিয়া হইতে এ-সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাশ্রয়্য করিতে চাহি না—কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেতরূক্ষে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের স্নায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অন্তঃসন্ধানতঃ পূর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির স্নায় নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই স্ত্রীমা-প্রকৃতিতে হয়তো রাত্রির মতো একটা গভীরতা, মাধুর্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং স্নানিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাক্ষের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ-কথা বলিয়াও কোনো ফল নাই যে, কালো গরুতেও সাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ-সকল ওরিয়েন্টাল উপমা-তুলনায়—কথাটা এই যে, কালো রং দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ-অভ্যাস-আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলই প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সঙ্গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে, তাহাকে যে জিন-বনাতির দ্বারা না মুড়িলেও অন্ত উপায়ে রক্ষা করা যায় সে-সমস্ত ভর্তুকা মিস্যা। ইহা তর্কের কথা নহে সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংশ্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু

ওই সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। স্বর্ণ শীমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেঠেন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘকালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরেজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধুলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এই জন্ত যে-দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে-দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে-জাতিকে শাসন করিতেছেন সে-জাতিকে ভালো না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের দ্বায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে থেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত বাওরা, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক তো, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরেজের স্বভাবতই অকটিকর, তাহার উপরে আরও একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানসমাজ এ-দেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। যদিও বা কোনো ইংরেজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহনশীলতায় বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদেরকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরেজসমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতিসমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলজ্বা বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজদুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেঠেন করিয়া রাখেন।

ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা ই সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সেজন্ত তাঁহাদের কী দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্টদোষ। বিধাতা আমাদের সর্বংশেই তাঁহাদের কটিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাঁহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরেজেরা যে-ভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলাকহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে-সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে-সমস্ত কুসংবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্ত

কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বহুমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরেজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিবিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরেজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল এবং ইংরেজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতি ইংরেজ আসিয়া দেখে যে, আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা-ভ্রাতা-স্বীপুত্রপরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট, কর্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালি কর্মচারিগণ কতদিন শূণ্যভীর নিবেদন এবং স্মৃতিধিকারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কী অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে, সে-অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধূতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাধানো বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রুঢ় লাহুনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিশ্বস্ত হইয়া সে কি একমুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ভুলাইতে পারে? আমরা কি ইংরেজের মতো স্বতন্ত্র, সংসার-ভারবিহীন? আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহ উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্লনাচক্ষে উদিত হয় ইহা আমাদের বহুগের অভ্যাস।

কিন্তু সে-কথা ইংরেজের বুঝবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে, ভীকৃত্য। নিজের জন্ত ভীকৃত্য ও পরের জন্ত ভীকৃত্যের প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোনো কথার স্মৃতি হয় নাই। স্মৃত্যায় ভীক শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসংবলিত দৃঢ়বহুমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরেজি ধবের কাগজ আমাদের প্রতিফলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা কটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ছোটাহাজরি। অঙ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিজ্ঞপাস্ত্রক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের বিশেষত শিক্ষিত “বাবু”দের প্রতি ইংরেজের অকুচি উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরিবধানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কী প্রতিশোধ লইতে পারি। আমরা ইংরেজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম? আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরেজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদের কাছে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দন করিবার ছোটো বড়ো কতপ্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর-মকদ্দমের লোকের অবিদিত নাই। ইংরেজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরেজি কাগজ ভারতশাসনকার্য দূর করিয়া তুলিতেছে। আর আমরা ইংরেজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ-পৰ্যন্ত ভারত-অধিকারকার্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরেজের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয় তখন এখনকার তো আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপভব করিতে পারিত তাহাদের নথদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্যের জন্তই সৈন্ত পাওয়া ক্রমশ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরেজ “সিডিশন” দমনের জন্ত সর্বদা উজ্জত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোনো অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ উহা অতিসাবধানতামাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরেজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজ্যকার্যের বাস্তবিক বিষয় ষটা সম্ভব। বরং উদাসীন-ভাবেও কর্তব্যপালন করা যায় কিন্তু আন্তরিক বিষেব লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্য-কর্মতার অতীত।

তথাপি, অমাহুযিক ক্ষমতাবলে সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরহিত বিষয় প্রজ্ঞাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম আপনার সম-ঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অস্তু যতপ্রকার সুবিধা থাক সে অভিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান, আমাদের পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসন্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসন্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরেজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হা করিয়া ভাবি ইহার ময়দানবের বংশ—ইহার এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিন্তমনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সত্তায় কিনি এবং মনে করি ইংরেজের মুস্ককে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিশ এবং উকিলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের এক ভাগ যে রূপে নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে এমন কি, মনের গভীরতর মূলে ভার বোধ হইতে থাকে। খাওয়ার এবং পাকরস মিশিয়া তবু আহার পরিপাক হয়, ইংরেজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে লাভমাত্র কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে জোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরেজের সকল কাণ্ডের ফল-ভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরন্তর হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য শাসন করিয়া ধর্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোনো মাহাত্ম্য এবং কোনো সুবিধা নাই? বর্তমান কালের ভারত-রাজনীতির সেই কি সর্বাণেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে তো দেখানো গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্দহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্তমান। কোনো কোনো

সহস্র ইংরেজও সেজ্ঞান অনেক সময় চিন্তা ও দুঃখ অহুভব করেন। তবু বাহা অসন্তব বাহা অসাধ্য তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া কল কী ?

কিন্তু বৃহৎ কার্য মহৎ অহুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে ? এই ভারতজয়-ভারতশাসনকার্যে ইংরেজের যে-সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সেগুলি কি সুলভ গুণ ? সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন ? আর পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্ত যে দুর্লভ সহদয়তাগুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে ?

ইংরেজ কবিগণ গ্রীস ইটালি হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ-পর্যন্ত মহাত্মা এডভিন আর্নল্ড ব্যতীত আর কোনো ইংরেজ কবি কোনো প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ গুনিয়াছি নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোনো কোনো বড়ো কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজের যতটা অনাস্বীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরেজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই আধুনিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে রাডইয়ার্ড কিপ্লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরেজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অহরহু ভক্ত ইংরেজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এডমণ্ড গস বলিতেছেন :

“এই সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো বোধ হয়। চারিদিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা,—অধ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড—সেখানে কেবল কালো আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজবর্ণ টিয়াপাখি, চিল এবং কুস্তীর, এবং লম্বা শাসের নির্জন ক্ষেত্র। এই মরুসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাণুরুষ বিধবা মহারানীর কার্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্ষর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।”

ইংরেজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্রে বিবাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ তো এমন নয়। কিন্তু ইংরেজের ভারতবর্ষ কি এত তদ্বাত।

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ ক্রী পরিমাণে বাড়াইয়া হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা ক্রী পরিমাণে পূরণ করিতেছে এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোকটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোলবিচালি জোগাইতে কোনো আশঙ্কা নাই, এই অশ্রাব্য সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে-পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাশ্রয় করে সেজন্য শিং ছুটা ঘণিয়া দিতে ঐদাসীন্দ্র নাই এবং দুই বেলা দুম্ব দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলিকে একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তত্ত্ব স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাঙ্ঘল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজি উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু শ্রবের কত প্রভেদ। তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাতৃত্ব। কত বারংবার করিয়া বলি হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনও মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে-স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগা ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে-কথার কোনো আভাসমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাকটিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সর-দরে, টাকার দরে সিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিক-পত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুদ্ধ পাঠই অভ্যাস করাইবেন? ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে ক্রাদান্বিত গাভীটি আজ দুখ দিতেছে কালে গোপকূলের অথবা বংশবৃদ্ধি ও স্খলবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুদ্রটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষু দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিরের নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মানুষল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মানুষলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি। যেমন রৌদ্র তেমনি মূল্য। কেবলই পাখার ব্যাভাস এবং বরফজল না থাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ প্রীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং বরফ সর্বত্র স্থলভ নহে। ভারতবর্ষ

ইংরেজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোবাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরেজকে কী দিতে পারে।

• হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না ; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার জট না হয়। তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো ; বসবসের পূর্ণা টাঙাইয়া জল সেচন করো, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে স্থস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোলো, তোমার সিদ্ধকটা খোলো, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় করো, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ির নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, কংকার সহকারে দু-কথা পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেছ ; কাজ নাই বকাবকি করিয়া ; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক।

ইংরেজ রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবির উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয়স্বপ্ন আবুল কজলের নিকট রাজ্যের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তিগণ সে চেষ্টা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সুখান্তের দিক হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাং মন্দিরকে, একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং স্নায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সকল হউক প্রার্থনা করি। আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে ; বল, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোনো জট হয় নাই কিন্তু এখনও এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া

শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অস্ত্রপূরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রী-সভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বধাতুভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করে না,—কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম, না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু এক জন মহাদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যাচ্ছ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন—একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরও কঠিন এইজন্য, যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা-প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে-পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া কেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলাকহা করি? আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরেজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে ষণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরেজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ ভ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা শাসনের দ্বারা এক করা যায় না—অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালোবাসিতে হয়—আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিশ মোতাইন করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শাস্তি স্থাপন করার দুর্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আকবরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না এবং স্বধাতুভূমির কবিগণ অলৌক অহংকার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত সুগভীর আক্ষেপের সহিত স্বজাতিকে লাহনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিত-

বর্গেরও উপকার হয়। ইংরেজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব জাত্যাহংকার কি যথেষ্ট নাই, কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন? এখনও কি নব্রতশিক্ষা ও প্রেমচর্চার সময় হয় নাই? সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোধণ করিয়া এখনও কি ইংরেজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মতো অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ-সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেইজন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মতো দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ-সম্বন্ধে দুই-এক কথা আমাদেরকে মাঝে মাঝে স্মরণিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে কিছুদিন হইল ডক্টরভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন, নব্য বাঙালিদের অনেকগুলো ভালো লক্ষণ আছে কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি সিমপ্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যে-ভাবে কথাগুলো বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরেজের কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের স্তায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন “তৃষার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল” আমাদের রাজা তখন “তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল।” আধখানা বেল সময়বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই একসঙ্গে দূর হয় না। ইংরেজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্ণর্মেণ্ট অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয় কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের স্তায় তদ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশদেশান্তরের সকলপ্রকার ভোজ্য এবং সকলপ্রকার পানীয় অপঘাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাক্সানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রাস্তবর্তী ওই বিদেশী বাঙালিটির এমন বৃত্তান্ত কাঙালের মতো ভাবখানা কেন?

কিন্তু স্পেক্টেটর স্মরণিয়া হস্ততো খুঁধী হইবেন, অতিদুঃখাপ্য তাহাদের সেই সিমপ্যাথির আড়ুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ উর্ধ্বে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে কিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী স্কুথিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মজ্জুস্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—তোমরা এতই কি জেষ্ঠ। তোমরা না হয় কল

চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিজ্ঞার ক'খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদেরকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অল্প মৃত্যুবশত, হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের যুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বালালীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি করো, আপিস করো, দোকান করো, নাচো, খেলো, মারো, ধরো, হটোপাটি করো এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সাস্থ্য দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে তদ্বারা সে জানে যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশ ভারবাহী মৃঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রায় নহে। তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্যের আলোক-উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্যের দ্বারা প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি দ্বারা শ্রামলা শস্তশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে, বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদেরকেও ইংরেজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। বোধ করি তাহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরেজ সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অল্প ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তিতর্কবিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অন্ধণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্বাতিশ্রুতি-কাব্যপুরাণ-ইতিহাসদর্শনের প্রাচীন

গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদের মনে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অন্ধকারে আলোময় বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

একপ্রকারের কালি আছে যাহা কাগজের গারে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনরায় রেণায় রেণায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালিতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় আবার শুভ দৈবক্রমে নব-সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্থাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা তো সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্থাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি,—যদি পূর্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাধীন দেহ সভ্যতার জলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্তি হওয়াই সঙ্গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বর্তমান সমস্তার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবনা এই :

ইংরেজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অমিলকাটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যিক। যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং দৃষ্টি চিরাভ্যাসক্রমে ইংরেজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গি, এমন কি, ভাষাটা পর্যন্ত ইংরেজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় এ-কথা সম্পূর্ণ শ্রেয়ের নহে। বাহ্য অমিলকাটা লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরেজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় আমরা তোমাদেরই মতো, এবং যেখানে অগ্রতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেন তেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বোধ

ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে-পৰ্যন্ত না পৃথিবীতে দরজির দোকান বসিয়াছিল সে-পৰ্যন্ত তাঁহাদের বেশভূষা অলীকতা-নিবারিণী সভায় নিন্দার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মতো দরজির এস্টাব্লিশমেন্ট এখনও খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে না এবং তাহার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতারূক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরেজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরেজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, একজ্ঞ কেবলই তাঁহাদিগকে পর্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেট-শাস্ত্রে একটু ক্রটি হওয়া, ইংরেজি ভাষায় স্বল্প স্থলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অমুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অলীকতা—ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরেজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরও বেশি জাজ্জল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং ক্রটিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরেজের মনটা অভ্যাসকূহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অজ্ঞায় প্রতারণিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান যুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমতো দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া যুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোনো ক্রটি খুঁজিয়া পায় না কিন্তু তথাপি যুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দার প'ড়োড়িকে বিলাতি বেশভূষা-আচারব্যবহারের অঙ্গকরণ করিতে দেখিলেই বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্বৃত্ত কুক্রটি, এই হাস্তজনক অসংগতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু যুরোপ এই ছদ্মবেশী এশিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধাসম্বোধ না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি যুরোপের সহিত অন্ত সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর একাত্মা হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসংগতি নামক গুরুতর ক্রটিদোষ ঘটিবে না ?

এই তো গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় থাক,

মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরেজের সহিত অনৈক্য তো আছেই আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরেজের মতো হইয়া ইংরেজের নিকট মান কাঙ্ক্ষিতে যাই তবে আমার যে-ভ্রাতারা ইংরেজের মতো সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সংকোচ বোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লক্ষ্য অন্তর্ভব না করিয়া থাকিবার জো নাই। আমি যে নিজস্বগণে 'ওই সকল মাহুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রজাতিবৃত্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থ এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরেজের কাছে একরকম করিয়া বলা যে, সাহেব, ওই বর্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর আমি যখন কতকটা তোমাদের মতো চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড়ো আশা আছে যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিংবা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়?

কর্ণ যখন অশ্বখামাকে বলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কী যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বখামা বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ সেইজন্যই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না? আচ্ছা, তবে আমার এই পইতা ছিঁড়িয়া কেলিলাম।

সাহেব যদি শেকহাওপূর্বক বলে এবং এম্বোয়ার যোজনাপূর্বক লেখে যে, আচ্ছা তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মতো তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন কি, তুমি দেখা করিলে এক-আধবার তোমার "কল রিটার্ন" করা যাইতেও পারে—তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না, বলিব—ইহারই জন্য আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া কেলিয়া দিলাম। যতক্ষণে না আমার সমস্ত স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রং মাণিয়া এক্কেপশন সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি তো বলি সেই আমাদের একমাত্র ব্রত; সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অমুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে-সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি সহজ উপায়ে কোন্‌ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে। বড়ো কঠিন কাজ সেইজন্য অল্প সমস্ত কেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে; জ্ঞান গর্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অথবা অমুকরণ করিয়া অকালপক হইয়া যায়। সে মনে করে সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে। তাহার আর রীতিমতো শিক্ষার প্রয়োজন নাই—বিনয় তাহার পক্ষে বাহ্যিক।

পাণ্ডুরা পূর্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসারে উদ্যোগপর্বের পূর্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্মাণ-জ্ঞাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বড়োই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক অবস্থাতেই অধীরভাবে ভিন্ন ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্বল অপরিপক শরীরের পুষ্টিসাধন বড়ো কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি দ্বন্দ্ব ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অঙ্কুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বৃন্দবৃদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদ্যোগ লইয়া উন্নত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতার স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র স্তূপ হইলে উদ্বেগের মহাবসফল আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধুমধাম এবং প্যাতিটী বথেষ্ট পরিমাণে

হইলোই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিহৃষ্টি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিঃশব্দ হইয়া আসে ; বৈধসাহ্য্য অমসাহ্য্য নিষ্ঠাসাহ্য্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না ।

এই দুর্বল অপরিণত শতাব্দীর চরিত্রটা লইয়া আমরা কী সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিশ্বয় এবং ভাবনার বিষয় ।

একপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায় । একটা কোনো আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চূপ চূপ, ইংরেজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কী মনে করিবে ?

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি । ভারত-বর্ষায়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না ; অবজ্ঞাভরেই হউক বা যে-কারণেই হউক তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না । তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো—বিদেশে থাকিয়া জার্মান যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অমূল্যলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরেজ তেমন করে নাই । ইংরেজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণ ই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই ।

অতএব ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম । এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরেজকে ইংরেজি ভাবেই মুখ করিতে চেষ্টা করিতেছি । মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি । জানি যে, ইংরেজ পীপল নামক একটা পদার্থকে জুজুর মতো দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জড়ো করিয়া পীপল সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরেজকে ভয় দেখাই । পরস্পরকে বলি, কী করিব ভাই, এমন না করিলে উহার যদি কোনো কথায় কণপাত না করে তবে কী করা যায় । উহার কেবল নিজের দস্তরটাই বোঝে ।

এইরূপে ইংরেজের স্বভাবভঙ্গ্যই আমাদেরিগকে ইংরেজের মতো ভান করিয়া আড়ম্বর করিয়া তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয় । কিন্তু তবু আমি বলি, স্বগোপন্য ভালো কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না । না সাজিলে কুতারা যদি আমাদেরিগকে একটুখানি অধিকার বা আধটুকরা অঙ্গগ্রহ না দেন তো নাই দিলেন ।

কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ-কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড়ো ভয় আছে। আমরা যুগপাত্ত, কাস্তপাত্তের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক আত্মীয়অপূর্বক শেকছাও করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড়ো কঠিন। আমরা দুর্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁষি, সাহেব যদি অমুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্ত বর্ষণ করে তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড়ো বেশি—এত বেশি যে, সে-অমুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমার ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরেজি মন্দ বল না; তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইয়া উঠে। যে বহিঃশ্রেণী ইংরেজের অমুগ্রহদৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিকা সাধনে প্রবৃত্তি হয়; যেদিকটা যুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সেদিকটা অঙ্ককারে অন্যদের আবর্জনায়া আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেদিকের কোনোরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মামুষকে ঘোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড়ো স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতার তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব আর ওই যে রাঙা সাহেব টমটম হাঁকাইয়া আমার সবাক্কে কাঁদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টমটম ধামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটির পদার্পণ করিয়া বলে, “বাবু তোমার কাছে দেশালাই আছে?” তখন ইচ্ছা করে দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক ভাইটি মাঠাকরুনকে প্রণাম করিবার জন্ত আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুংসিত দৃষ্টিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে; পাছে সেই বর্ষরের সহিত আমার কোনো যোগ কোনো সংস্রব কোনো স্পন্দন ঐক্য বড়ো সাহেবের কল্পনাপথে উদ্ভিত হয়।

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁষিব না তখন অহংকারের সহিত বলি না, বড়ো বিনয়ের সহিত বড়ো আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্বেই আমার সর্বাঙ্গের সর্বনাশ হইবে—আমি আর নিভুতে বসিয়া আপনায় কর্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্বদাই উড্ড উড্ড করিতে থাকিবে এবং

আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়োই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। বাহাদের জন্ত জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরেজ-তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসক্তপ্রসক্ত বন্ধুত্বপ্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া কল করিয়া একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজ-সমাজের একটু জাগমাত্র পাইলে, এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে-গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এমন স্থলে, এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্বনাশী অমুগ্রহমণ্ডকে অপেরমম্পর্শং বলিয়া সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য।

আরও একটা কারণ আছে। ইংরেজের অমুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিঃস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং অর্থহীন কেবল সম্মানবর্ষণে শাস্ত হয় না। আমরা অমুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অমুগ্রহ নহে সেই সঙ্গে কিছু অন্নও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেকহাও নহে চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মতো আনাগোনা করি তো তৃতীয় দিনে ভিক্ষকের মতো হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সঞ্চয়টা বড়োই দীন হইয়া পড়ে। এদিকে অভিমান করি যে, ইংরেজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না ওদিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরেজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অমুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেল-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে তো আমাদের দেশান্তর কোনো সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তাল। তবে আজ হঠাৎ ওই যে লোকটা পাগড়ি-চাপকান পরিয়া শঙ্কিতগমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভ্যস্তের মতো অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে তাবিয়া পাইতেছে না এবং পতমত থাইয়া কথা কহিতেছে উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মূখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে?

যাহার অবস্থা দীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ইংরেজ এ-দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে তাহার অনেকটা কি আমাদেরই

হীনতাবশত নহে? সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংশ্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরেজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব সকল দিক পথালোচনা করিয়া রাজ্যপ্রজার বিষমভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যসকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব অন্তর হইতে লাজনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে-সামান্যটুকু ছিল সে সামান্যও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্ত্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে, আশা করিব সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা প্রভাবচিন্তা ইংরেজের প্রসাদচিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহু আশ্রয়ালন বাহু যশ-প্যাতি পরিহার করিয়া ইংরেজ-আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, নিবিষ্টমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবৃত্ত সঞ্চয় করিবে, জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যচরণ সত্যাহুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান উর্ধ্বে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহবার পয়ের কাছে মান যাচুগ্রা করিতে যাইবে না এবং ধর্মো রক্ষিত রক্ষিতঃ এই কথাটির শৃঙ্গভীর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করিবে। এ-কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল যে-দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়; যদি ছাটকোট পরিয়া ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরেজের ধারস্থ হইয়া, ইংরেজিতে নিজেকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তর্জমা করিয়া কোনো সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে ছাটকোট ধরিবে, সন্তান-দিগকে বহুচেষ্টায় বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা-ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবানমহলে বেশি আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য।

—/ দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে বোধনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরেজি কলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভাবার শিক্ষার

মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি ; ইংরেজের কাছে আদর হুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মহত্ত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব ; অস্ত্রের নিকট হইতে ঝাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কাৰ্যসিদ্ধি ।

শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস স্থাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে-আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুদূরে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিকার নৃশ্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষার আমাদের গিকে আশ্রয় করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোপ বুজিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা ।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই ; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরেজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মস্ততা হইতে মূঢ় জনশ্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সমস্তে রক্ষা করিতেছেন ; কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না । তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন ; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন । তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন ; এবং বহুলক্ষী তাঁহার প্রতি ব্ৰহ্মদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাধি কথায় তাঁহাকে কোনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্বেগসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয় । অসাধ্য বটে, কিন্তু এ-দেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত ।

রাজনীতির দ্বিধা

সাধারণত জাতিগত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনেক বড়ো বড়ো গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা ক্ষুণ্ণি পায় অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা ক্ষুণ্ণি পায় না। এমন অনেক দেখা যায় যাহারা আপনাদের সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মতো মৃদুস্বভাব তাঁহারা নিম্নশ্রেণীরদের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুস্তীর এবং আকাশের স্ত্রেনপক্ষি বিশেষ।

যুরোপীয় জাতি যুরোপে যত সভা, যত সদয়, যত জায়গার, বাহিরে ততটা নহে এ-পৰ্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খ্রীষ্টানদের নিকট খ্রীষ্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অল্প গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহারা ই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখ্রীষ্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অল্প গাল ফিরাইতে বলে এবং অখ্রীষ্টান যদি দুর্বৃত্তবশত উক্ত অল্পরোধ পালনে ইতস্তত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্পফাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্তক্ষেত্র হইতে শস্ত কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভাগুলি হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলি কাটিয়া বাবুচিহ্নানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভা খ্রীষ্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অষ্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদাক্ষণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় মাটাভিল যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখ্রীষ্টানের গালে খ্রীষ্টান চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খ্রীষ্টানের হাতে। ট্রু নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশঙ্ক হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন একরূপ আশা দিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন সভা জাতি যাহাকে আপনাদের অপেক্ষা অল্প সভা জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই সভ্যতাটিকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি,

ইরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অঙ্ককার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে এবং সেখানে যে আদম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাভিলি তাহার অপেক্ষা নিকটতর নহে।

কিছু সমসংকোচে বলিলাম নিকটতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্ষর লবেঙ্গুলা ইংরেজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরেজদের ক্রুর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জার গ্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরেজের পক্ষেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোনো ইংরেজ যে সে-কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরেজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরেজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে ধর্মনীতি আজকাল বড়ো বেশি ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁতখুঁত করিলে কাজ চলে না। ইংরেজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লক্ষ্যে সে উন্নয়ন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অগ্রায় করিতে হইবে। নরমান দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহার সূক্ষ্ম সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরেজ বংশধর ভিন্নজাতির প্রতি জ্বরদন্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্বল রুগপ্রকৃতি। কিসের ম্যাটাভিলি, কেই বা লবেঙ্গুলা, আমি ইংরেজ, আমি তোমার সোনার ধনি, তোমার গোন্ধর পাল লুণ্ঠিতে ইচ্ছা করি ইহার জন্ত এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো-একটা দুঃস্থপনা ধরা পড়িলেই বা এত উল্টোভাবে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন।

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায় বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুঃস্থ লুঙ্গ বালক নিজের অপেক্ষা ছোটো এবং দুর্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্তে মুণের মধ্যে পুরিয়া বসে, হস্তমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অচ্যুতপ্ত হয় না। এমন কি, হয়তো ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন ধামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্তান্ত বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয় এবং যদি ধরা পড়ে তো কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ধরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোনো দরিদ্রপন্নীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ নীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার

একমাত্র উপজীব্য ঋণ্যগুটুকু দেখে চারিদিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পাণ্ডুদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোকরাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু স্বীকার করে না যে, ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতন কালের চৌধুবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণব্যাপারের মধ্যে পূর্বকালের সেই নির্লজ্জ অসংকোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের সহজে নিজের চেতনা জন্মিয়াছে সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্ত বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্বের মতো তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে একরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্বদা ঘটয়া থাকে। দস্যু বিস্তার জন্মে কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না—অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এদিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইস্ট খেলে, স্ট্রীসমাজে মধুরালাপ করে, কেহ সন্দেহমাত্র করে না যে, এই সাদা কামিজ কালো কোর্তার মধ্যে রবিন হুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

যুরোপের বাহিরে গিয়া ইহার সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির আবরণমুক্ত সেই উৎকট রক্তমূর্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যুরোপের সমাজমধ্যেই যে-সমস্ত ভয়াচ্ছাদিত অশ্রার আছে তাহাদেরও উদ্গার বড়ো অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিই বাড়িতে পারে কিন্তু বলের বলই কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এ-সব কথা শুনিতে বেশ—কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভু প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্বল নব শতাব্দীর সূকুমারহৃদয় শিশু সেন্টিমেন্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা কি। এখানে সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উল্লঙ্ঘ্য তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য।

এইজন্ত আমাদের কর্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতি হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের ধ্বংস হয়—আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায় ইহাই লইয়া সূতীত আক্ষেপ

করে। তাহার। বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে-কাজটা করিতে চাই ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ত দিতে হয়। যখন দস্যু ব্লেক সমুদ্রদিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইব ভারতভূমিতে ব্রিটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল তখন নীতির কৈফিয়ত দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরেজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অশুভ দোর্দণ্ড বলের বয়সে কিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা ঘিরা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিদেন, গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্বৃত্ত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়েরই চম্পবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনই সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বসী হইতে চায় তখনই সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরেজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।

আমরাও সেইজন্য ইংরেজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সেজন্য ইংরেজ প্রভুর। কিছু রাগ করে। তাহার। বলে, নবাব যখন যথেষ্টাচারী ছিল, বর্গি যখন লুটপাট করিত, ঠগি যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত তখন তোমাদের কনগ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়। কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোনো ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মারহাট্টা এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারও মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কনগ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরেজের মধ্যে অশুভ বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্মের কাহিনী বলিলে যদি বা সে না মানে তবু তার একটা ধর্মসংগত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভালো জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অভাব যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহ্যিক/বিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাহার। যথার্থপক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ

করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ক্রটির জন্ত নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়

• এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নাই ওদিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না এ এক বিষম সংকট। জাতির পক্ষে নিজের জীবনরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অগ্ন্যাচারণ করিলে যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে নিজের ধর্মের আদর্শ ক্রমশ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্মকে সর্বগ্রন্থে বলবান না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া থাইতেও হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতিসহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক মোটাবেত্তনের ইংরেজ কর্মচারীকে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজ্যকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মানুষল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাক্সশিয়রের কিঞ্চিৎ অনুবিধা হয় তবে তুলার উপর মানুষল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পবলিক ওয়ার্কস কিছু খাটো করিয়া এবং দুভিক্ষ-ফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপরদিকে ল্যাক্সশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এদিকে আবার পঞ্চবিংশতিকাটি হতভাগ্যের জন্ত যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্মনীতি এমন সংকটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনৌড় পক্ষিসমাজের স্তায় সভাস্থলে কর্ণধার কলকলধ্বনি উদ্ভিত হয়, ইংরেজ ভারি চটয়া উঠে।

যখন কাজটা স্তায়সংগত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে অথচ না করিয়াও এড়াইবার জো নাই সেই সময়ে ধর্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোনো যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘৃণি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে ধর্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক ধরিয়া যায়।

ভারত-মন্ত্রিসভার সভাপতি এবং অনেক মাতঙ্গর সভা ভাবগতিককে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে সমস্ত ইংরেজ-রাজ্যের মূণ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় স্তায়-অস্তায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিকিবেও না। ল্যাক্সশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য ল্যাক্সশিয়রের লাভও তেমনি

সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত-মন্ডিসভার ল্যাক্সিশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাক্সিশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন? কমলি নেহি ছোড়তা—বিশেষত কমলির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন পাস করিয়া শেষকালে আবার দ্বারে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্তী হইলেও মান থাকে না, এদিকে আবার কৈক্ষিয়তও তেমন সুবিধামতো নাই। নবাবের মতো বলিতে পারি না যে, আমার যে-অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব, ওদিকে স্তায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবার অলঙ্ঘ্য বিষ—অথচ এই সংকটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে।

এইরূপ সময়টার আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদেরকে শাসায় এবং গবর্নেন্ট যদি বা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সংকোচ বোধ করে, ছোটো ছোটো কর্তারা কোনো সুযোগে একবার আমাদেরকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো শৃঙ্খলবদ্ধ কুকুরের মতো দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারতর প্রয়োগ করিতে থাকে। ভালো, যেন আমরাই চূপ করিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে ধামাও দেপি। তোমাদের মধ্যে ঘাঁহাটা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন, তাহাদিগকে নির্বাসিত করো, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে স্তায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া দ্বন্দ করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো বা তাহার জয় হয় কখনো বা তাহার পরাজয় হয় কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড যখন ব্রিটেনিয়ার নিকট কোনো অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে যুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরেজের ধর্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্ত ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরেজের রাজকাষে ল্যাঠা বিস্তার বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যতদিন ইংরেজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের স্মৃতি-হৃৎতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত

হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরেজগণ বিকল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

১৩০০

অপমানের প্রতিকার

একদা কোনো উচ্চপদস্থ বাঙালি গবর্নমেন্ট-কর্মচারীর বাড়িতে কোনো কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রণয় কথা উঠিল। ইংরেজ প্রোফেসর কহিলেন, যে-দেশের লোক অধঃভাষা, অধঃশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরেজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহ্যিক জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাহার স্বজাতিকে পরুষবাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপক মহাশয় আর-একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে-কথা কেবলমাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে পরন্তু ইংরেজের মুখে অত্যন্ত অসংগত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরমদুষণীয়তা সঘনাই ভারতবাসীর ধারণা ইংরেজের তুলনার অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্বেগ হয় না।

যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারির দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশে অগ্নি অগ্নি বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্ত-অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের

পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে অহিংসা পরমোদ্যমঃ এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

• এই ঘটনা আজ বছর দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটয়াছে এবং ইংরেজের আদালতে সেই সকল হত্যাকাণ্ডে এক জন ইংরেজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মূণ্ডিতশুল্কশ্রম খড়গনাসা ইংরেজ অধ্যাপকের তীব্র ঘণাবাক্য এবং জীবন-হনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সাধুনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরেজের প্রাণ ফাঁসিকাঠের অটল তুল্যদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরেজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তরূপে গণ্য করে।

ইংরেজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে? কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমাদের বলক্ষয় হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দিষ্ট সন্দেহ এবং অকারণ ভয় শতগুণে সন্তোষ কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে, কোনোদিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্তে ইংরেজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সন্দেহ দৃঢ় হয়—মনে ধারণা হয় আমার প্রাণে ইংরেজের প্রাণে অনেক তফাত, অসহ অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্বলেও ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত ইংরেজের মনে আছে কিনা জোর করিয়া বলা কঠিন—কিন্তু এ-কথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা দুঃখিত হন—সেটাকে একটা “গ্রেট মিস্টেক”, এমন কি, একটা “গ্রেট শেম” মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিরূপে ঘুরাপীড়ের প্রাণ হরণ করা তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা লঘু শাস্তি যদি আইনে নির্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয়

হত্যাপরাধে ইংরেজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে-জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সে-জাতি সম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে-স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য ত্রুটি এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরেজ অপরাধী অন্যায়সে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্থতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ-দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আত্মপূর্বিক পরস্পরা আমাদের মনে মূর্ছিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসংগতি ও বিধা থাকে—এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যামিথ্যা স্বস্বরূপে নির্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিমুক্ত যখন স্বদেশী তপন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষত যখন স্বভাবতই ইংরেজের নিকটে স্বল্পায়ত স্বল্পাহারা স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর “প্রাণের পবিত্রতা” স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতমভাংশপরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল, তাহাতে গ্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরগতগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আনিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে হারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের হারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ সহকারে এ-সমস্ত দুর্বলতা আমাদের কাছে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপস্থাপিত এই সকল ঘটনায় দেশের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের স্বম্ববিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজেরই প্রাণদণ্ড হয় না এই তথ্যটি বারংবার এবং অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে ইংরেজের অপক্ষপাত ত্রায়পরতা সম্বন্ধে স্তম্ভীত সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মৃত্যুর কেন দোষ দিই, গবর্নেন্ট অন্তরূপ স্থলে কী করেন? যদি তাঁহার দেখেন কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধিকাংশসংখ্যক আসামিকে খালাস দিতেছেন, তখন তাঁহার এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবত উক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

অগ্র ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা অধিকতর জায়গার, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় স্বাক্ষরূপে নির্ণয় না করিয়া আসামিকে দণ্ড দিতে কুষ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্মবুদ্ধি এবং সতর্ক জায়গারজ্ঞার অগ্র সদর তীহার পদবুদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য ; অথবা যদি দেখিতে পান যে, কোনো পুলিশ-কর্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামি বহুলসংখ্যায় খালাস পাইতেছে তখন তীহার এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবত এই পুলিশ-কর্মচারী অগ্র পুলিশ-কর্মচারী অপেক্ষা সংপ্রকৃতির—ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যাসাক্ষ্য স্বহস্তে স্বজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্রসকল সংশোধন করিয়া লন না, অতএব পুরস্কার স্বরূপে অচিরেই তীহার গ্রেড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা জ্ঞায় ও ধর্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিরত নাই গবর্নমেন্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্নমেন্টের অপেক্ষা অধিক স্বাক্ষরবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া একটা ইংরেজও উপযুক্ত দণ্ডাই হয় না এ কেমন কথা।

বারংবার আঘাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। তাই 'বাবু'-অভিহিত অস্বংসকীয়েরা এ-সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারতরাজ্য-পরিচালক বাণেশ্বরের “বয়লার”স্থিত তাপমান মাত্র, আমাদের নিজের কোনো শক্তি নাই, ছোটো বড়ো নিচিহ্ন লৌহচক্রচালনার কোনো ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চকল পারদবিন্দু ইষ্ঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়, কিন্তু এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্তব্য নহে। তিনি একটি ঘূষি মারিলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর পদার্থটি ভাঙিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তিনভূত হইয়া যাইতে পারে—কিন্তু বয়লার-গত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্র-চালনকারীর একটা প্রধান অঙ্গ। ইংরেজ অনেক সময় বিপরীত উগ্রমতি ধারণ করিয়া বলে—প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ, তোমরা কে। তোমরা তো আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরেজিনবিশ।

প্রভু, আমরা কেহই নহি। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞপ্তি বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অত্মমান করিতেছি তোমরা আমাদেরিগকে নিতান্তই সামান্ত বলিয়া জ্ঞান কর না। এবং সামান্ত জ্ঞান করা কর্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্ত হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ

ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে—এবং এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। এই শিক্ষিতসাধারণের অন্তরে কখন কীরূপ আঘাত-অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করা গবর্মেণ্টের রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। লক্ষণে যতদূর প্রকাশ পায় গবর্মেণ্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাই। প্রথমত, একটা অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় বাগ্ন হইয়া থাকে। যেজন্যই ইউক দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল ঘটনার আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্মান্বিত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের বটে কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল, সাক্ষ্য এতই পিচ্ছিল, এবং দেশীয় চরিত্রজ্ঞান মমত্বহীন অবজ্ঞাকারী বিদেশীয়ে পক্ষে এতই দুর্বল যে, অনিশ্চিতকল মকদ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মতো বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকারী উত্তেজনা আছে আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকদ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা জ্ঞাত আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী তখন মধ্যে মধ্যে নির্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিকৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যস্বাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারংবার যুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরেজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কার শেলের স্রাব স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি যুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই বিচারে মুক্তি পাইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার সহস্রবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া লাগি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষদের কোনোপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কী করিলে এ-সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই

ধিকারের যোগ্য। কারণ, এ-কথা কিছুতেই আমাদের বিশ্বস্ত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না—সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সাম্প্রদায়িক স্বরে যেভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্দনার নিরতিশয় লাভ হইতেছে।

উদাহরণস্বৰূপে আমরা খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মুহুরি মারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উন্নতচেতা সঙ্গমর ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঐদাসীন্দ্র অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি যে মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্ধর্ষ ইংরেজপ্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালিগণ প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্বলিত তখন ক্রোধানল সামান্য কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা বাঙালিরও হয় ইংরেজেরও হয়; অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিজ্ঞাতিবিশ্লেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু ফিরিয়াদির পক্ষের বাঙালি ব্যারিস্টার মহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন মুহুরি-মারা কাণ্ডটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

এ-কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা। এ-কথা বলিতে পারি মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল সাহেব যথার্থ ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না এই কথাটি ঐক্য সত্যরূপে অগ্নানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরেজকে বেশি করিয়া দোষার্পণ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুন আইনমতে মুহুরির যে-কোনো প্রতিকার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র-পরিমাণে আহা উচ্ছ্বস করার, এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিগালাচি দিবার কোনো কারণ দেখি না। বেল সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্তী সমস্ত লোকের আচরণ হয়, এবং খুলনার বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অজ্ঞায় মিশ্রিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অমুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটয়াছিল। সেখানে মুন্সি-পালিটির থেয়াঘাটের কোনো ব্রাহ্মণ কর্মচারী পুলিশ সাহেবের পাখা-টানা বেহারার নিকট উচিত মান্তুল আদায় করাতে পুলিশ সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন; বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সেই অপরাধী ইংরেজের কোনোরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখা-টানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপহ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণবশত বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট প্রবল ইংরেজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙালি অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন, সেই কারণটি আমাদের জাতির মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আমরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙালি যখন নীরবে মার পায় এবং অল্প বাঙালি যখন গাছা কৌতুহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না একথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইজিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরেজ কর্তৃক অপমানবৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোনো ইংরেজের প্রতি ইংরেজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু ইংরেজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণবশত একজন ইংরেজ সহজে আর-একজন ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অমুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সামুদায়িক স্বরে এত অধিক কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চ নীচে বিভক্ত, যে-ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চ আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা

প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিসমাত্র স্বাভাব্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। উদ্রলোকের নিকট “চাষা বেটা” প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে;—কমতাপরের নিকট অক্ষয় লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কনস্টেবল, কনস্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে পর্বর্ষেটের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, উদতিরিক্ত দাসত্ব দাবি করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কনস্টেবল যথেষ্টাচারী রাজা, এবং কনস্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ, তেমনি আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতরের দাবির একেবারে সীমা নাই। গুরে গুরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্ম-কালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদেরিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমূর্ত্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্ত লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যিক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্ত ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরেজ ইংরেজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদেরিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরেজ পর্বর্ষেটের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

সুবিচারের অধিকার

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের গ্রায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দুসংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো কালে কোনো বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে-স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোনো বিবাদ নাই—বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্নমেন্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোনো এক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দুদিগকে বাগ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাঙ্গা ও দেবসন্মান উভয়রক্ষা করিতে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চিরনিয়মানু-মোদিত বাগাডম্বর বন্ধ করিয়া একটিমাত্র সামান্য বাগযোগে কোনোযতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সম্ভ্রষ্ট হইলেন কিনা জানি না, মুসলমানগণ অসম্ভ্রষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ক্রুদ্ধমূর্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবরদস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াবুড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কিনা সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বাঁজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর-কোনোপ্রকার চিকিৎসা নাই কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জন করিয়া নৃত্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ধরিয় প্রাণ-কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরেজ হিন্দুমুসলমান-বিরোধব্যাধির যদি সেইরূপ আদিম প্রণালী-মতে চিকিৎসা শুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে-ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শাস্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্নমেন্টের আন্তরিক অভিপ্রায়

নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিষেব জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্শন চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সঙ্কষ্ট ও হিন্দুকে অভিজ্ঞত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ড লাল্লাডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড হারিস পর্যন্ত সকলেই বলিতেছেন এমন কথা যে মুখে আনে সে পায়ও মিথ্যাবাদী। ইংরেজ-গবর্নেন্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কংগ্রেসের প্রতি গবর্নেন্টের স্নগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কংগ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকে। সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোনো পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্নেন্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গবর্নেন্টের স্মৃশাসনে শাস্তমুতি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্নেন্টের বাকুদশনায় বাকুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসম্ভাব গবর্নেন্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ স্মৃশীতলভাবে রক্ষিত হইবে এমন অভিপ্রায় গবর্নেন্টের মনে থাকে অসম্ভব নহে।

এই কারণে, গবর্নেন্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি-দুস্তা দেখিবার জন্তও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি-দুস্তাও তাঁহাদের স্মৃশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট হস্তবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রায়শ্চর্চা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্ত্রপক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি গবর্মেণ্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকাই সম্ভব কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেণ্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোনোপ্রকার অসাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে না তথ্যচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্যরাজ্যের অস্থির উনপকাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গলোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে-সকল খবর লর্ড ল্যান্সডাউন এবং লর্ড হারিস জ্ঞানেন কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাইল মাইল আসিতেছে কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্ত বিফুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি আমাদের জন্ত যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার ধোরাকি আমাদের নিজের গাঁঠি হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ-কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল স্টেটসম্যান পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ-উপাধিদারী কোনো প্রদেয় ইংরেজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমানজাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্বেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ব্রাতাদের প্রতি ইংরেজের মনে যদি ক্ষীরসঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বয়ের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে, ভয়েতে করিয়াও গ্নায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরেজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে “বিকে মারিয়া বউকে শেখানো” রাজনীতি। বিকে কিছু অস্ত্রায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বউ পরের দ্বারের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচারকাষ্ঠটা একেবারে বদ্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র কল পাওয়া যায় এ-কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু-

মুসলমানের মধ্যে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবদ্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলি না যে, গবর্নেন্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্যবিধি স্বভাবত, এমন কি অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন যন্ত্রিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল যন্ত্রিকাকে ধনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্নেন্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্নেন্ট যে হাজার প্রতিকার করিতে পারেন এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কনগ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরেজ কর্মচারীদের কার্য স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য হইতেছি এবং ইংলওবাসী অপক্ষপাতী ইংরেজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজ্যবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি—এই সকল ব্যবহারে ইংরেজ এতদূর পর্যন্ত জ্ঞানাতন হইয়া উঠিয়াছে যে, ভারত-রাজতন্ত্রের বড়ো বড়ো ভূধর-শিখর হইতেও রাজ-নীতি সম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয়শ্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তির অরবিন্দপ্রায় হইয়া কনগ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরেজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে—গবর্নেন্টের ইহাতে কোনো হাত নাই।

কেবল ইহাই নহে। কনগ্রেস অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরেজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে-হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্ত কখনো একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্ত সে-জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেই সূত্রে যখন হিন্দুমুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরেজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাতসহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরেজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীতচিত্তে একটা রাজনৈতিক সংকট কল্পে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনার “ইংরেজের আতঙ্ক” নামক প্রবন্ধে আমরা মীওতাল-ধমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত ভীতির কারণ, তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে, গবর্নেন্ট নামক যন্ত্রটি যেমনই নিরপেক্ষ থাক গবর্নেন্টের

ছোটোবড়ো যন্ত্রাগুলি যে আত্মোপাস্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারংবার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল এখনও প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই;— ক্যান্টাট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই গবর্ণমেন্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার প্রয়োজন কী ছিল?

গবর্ণমেন্টের নিকট সতর্কতা অথবা সান্ত্বিত্য স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্ত প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই সে-কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্ত। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্তায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্টাট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন, সমুদ্রতরঙ্গ সেখানে থামে নাই—সে জড়শক্তির নিয়মাত্মক হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্টাট মুখের কথায় বা মস্তোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে কিন্তু বীধ বীধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মাত্মক আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদেরই বীধ বীধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমজন্ম হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বীধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বীধিলে যে একটা বৃহৎ এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।

কিন্তু বালির বীধ বীধিবে কী করিয়া? যাহারা বারংবার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোনোকালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বীধিতে পারিবে? ইংরেজ যে আমাদের মর্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরেজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ঋণ আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্ত বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠানকে অধিক আশঙ্কা করি। ধরবেগ নদীর মধ্যস্থ্যে অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভঙ্গপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অস্ত্রাঘের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—বাহার হিতের জন্ত প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা বাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বস্ত্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাগিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনোই আপনাকে উচ্চ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অস্ত্রের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেতনভাবে প্রার্থনা করে, অস্ত্রায় নিবারণের জন্ত প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

কণ্ঠরোধ

সিদ্ধিশন বিল পাশ হইবার পূর্ব দিনে টাউনহলে পঠিত

অন্য আমি যে-ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উগত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা তথাপি সে-ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ-ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হউক না কেন যে-ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না, এবং যে-ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে-ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা আমরা কোন্ ভাব হইতে কী কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি স্নেহসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত, না দুর্বিসহ স্পর্ধা হইতে উদ্গিরিত তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে, এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্ত নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নিবোধও নহি। উগত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাতমুতুর ইচ্ছাও আমার নাই; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চূপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসন-কর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট,—কারণ, কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আত্মমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির স্তায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উদ্ধাপাতের স্তায় অযথাস্থানে দুর্বলজীবের অন্তঃস্থিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমনস্থলে সর্বতোভাবে মুক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্রে হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সমবুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে,—আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাঙ্গালী যাহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতঔপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাগ্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন;—সে-সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্ধাক বেদনা নিবেদন করিতে রাজস্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে

“রাজদ্বারে দ্বাশানে চ বসিষ্ঠাতি স বাহুবঃ” তথাপি দ্বাশান বধন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে তখন ভীত বহুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা ভয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরেজ আমাদের একেশ্বর রাজা, এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এ-দেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিশ্বয় বোধ করি। অতিদূরে ক্রিশিয়ার পদধ্বনি অল্পমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হংকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্তপ্রায় ভাঙারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্ত্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায় ;—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক পাণ্ডা নহে।

বাহিরে প্রবল শত্রুসমূহে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জ্ঞান নাই।

কিন্তু আমরা আমাদের পক্ষে জানি। আমরা যে কোনো অংশেই ভয়ংকর নহি সে-বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল। এবং যতক্ষণ সে-বিশ্বাস আমাদের নিজের মনে নিঃসংশয়-ভাবে দৃঢ় থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ংকারিতাও সর্বতোভাবে দূরীকৃত।

কিন্তু অন্নদিনের মধ্যে উপযুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায় বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ংকর ! আশ্চর্য ! ইহা আমরা পূর্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্নেন্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাক্ষ্য করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যাহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদের পক্ষে আর বাধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর !

একদিন শুনিলাম অপরাধবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফতার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্নেন্ট সাক্ষীসাবুদ-বিচারবিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বন্ধের উপর রাজদণ্ডের জগদ্বল পাখর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ডাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর। ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে !

আজ পঞ্চম সে ভয়ানক কাণ্ডের কোনো অঙ্কিসঙ্কি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় তারের ধবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্রোহের মতো পড়িয়া নাটুভাত্যুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বর্ষাই প্রদেশের মাথার উপরে কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জ্বরদন্ত শাসনের ঘন ঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন-আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম, ভিতরে কী ঘটিয়াছে জানি না, কিন্তু বেশ দেখিতেছি, ব্যাপারটি সহজ নহে। মাহারাষ্ট্রায়া বড়ো ভয়ংকর জাত!

একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাড়ুড়ি-ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে। আমরা এতই ভয়ংকর!

আমরা এতকাল বিপুল পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুখোঁগে মেঘাবৃত অপরাহ্নে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভরভূমি জানি না কোন্ নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পাঙ্কিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম তাহার সেই মুহূর্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বজ্রকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেন্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দেশ্য আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও তাহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয় আমি না জানি কী!

স্মৃতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সাস্থনা আছে। কারুণ্য, সম্পূর্ণ নিঃস্বজ্জ নিঃস্বজ্জ জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক, তেমন তাহাকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আমাদের দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে স্তায়-অস্থায় বিচার-অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া এ-কথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়তো আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল

মৃত্যুবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্নেন্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে আমরা মশা নহি,—অস্তুত মরা মশা নহি।

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ একটা শক্তির সঞ্চার-সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের বিষয় এ-কথা অস্বীকার করা এমন স্পষ্ট কপটতা যে, তাহা পলিসিফরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবন্ধনাশরূপে নিষফল। অন্তএব গবর্নেন্টের তরফ হইতে আমাদের কোনোখানে সেই শক্তির স্বীকার দেখিতে পাইলে নিরাশচিত্তে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু, হায়, এ গর্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক,—শক্তির মৃত্যুর জ্ঞান ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি,—উপযুক্ত ধীবররাজ আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্ভটুকু নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজের রাজমুকুটের উপরে স্থাপন করিবেন। ইংরেজ নিজের আদর্শে পরিমাপ করিয়া আমাদেরকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে-সম্মান হয়তো আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু। আমাদের যে-বল সন্দেহ করিয়া গবর্নেন্ট আমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছেন সে-বল যদি আমাদের না থাকে তবে গবর্নেন্টের গুরুদণ্ডে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব,—সে-বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নায় তাহা উজ্জরোস্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা তো আমাদেরকে জানি, কিন্তু ইংরেজ আমাদেরকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে—তাহা বিস্তারিত পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই, তাঁহারা আমাদেরকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী। আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোয়াইয়া উঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ংকরত্বের আর কোনো লক্ষণ নাই কেবল একটি আছে, আমরা অজ্ঞাত। আমরা গুপ্তপায়ী উদ্ভিষ্টাঙ্গী জীব, আমরা শাস্ত সহিষ্ণু উদাসীন কিন্তু তবু আমাদেরকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ আমরা প্রাচ্য আমরা দুজ্জের্য।

সত্য যদি তাহাই হইবে, তবে হে রাজন, আমাদেরকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিবাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া কল কী?

সিপাহিবিক্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে-কটি বিলি 'হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্মই কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অঙ্গুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনাক্ষকার অমাবস্তারাজ্যে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবভিসারে যাত্রা করে, তবে সিংহঘরের কুকুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্করীমুপুরকেয়ুর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধনি রোধ করিয়া দেন তবে তাহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে আগত লোকটির হাতে, পাহারা দিবার প্রশালীও তিনি স্থির করিবেন; সে-সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় দুষ্টতা এবং সম্ভবত তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্বল উদ্ভ্রমের মধ্যে সে দুষ্টতা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, বার্থ অথচ বিপৎসংকুল বাচালতা কেন? সে কেবল, প্রবলের ভয় দুর্বলের পক্ষে কী ভয়ংকর তাহাই স্মরণ করিয়া।

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতরশ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রগুহস্থে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজেরই প্রতি। তাহাদের শান্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ঈটটি মারিলেই পাটকেলটি সাইতে হয়, কিন্তু মুটগণ ঈটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল। অপরাধ করিল দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কী আজ পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না;—একটা ছোটো বড়ো কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মুক নির্বাক প্রজাসম্প্রদায়ের মনের কথা কিছুই বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্তাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কোঁতুহলী কল্লনা হারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অল্পমানকে শাখাপল্লবায়িত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্তাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কিত ইংরেজি কাগজ কেহ বলিল, ইহা কনগ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল, মুসলমানদের বসতিগুলি একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া

দেওয়া থাক, কেহ বলিল, এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়োলাটসাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত জয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান—এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্বল ব্যক্তির নিশ্চিত ভৃত্য। কৃষ্ণবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যাক্ষকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়াক্ষকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুঃপনয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর থরথার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিবাদে ভাৱাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্রে বিযতিত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরেজের একান্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব করে না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব; ইংরেজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না। তাঁহার রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে। কারণ, সে বিধির নিয়ম; পিনাল কোডে তাহার কোনো নিবেদন নাই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গল নহে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অন্তর আছে।

মানবচরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই তাহা আমরা ইংরেজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যচরণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অন্তিমরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরেজ আপন প্রজাদিগের অধীনদশা হইতে সেই হীনতার কলঙ্ক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্বল তাঁহারা সবল ইহা তাঁহারা পদে পদে স্বরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্বস্তম্ভ ভুলিতে দিয়াছিলেন যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্যত্বেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের খেচ্ছাধীন অগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্ভানুভব করিবার কোনো কারণ নাই,—দোষ

করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনো গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্বদা অমুভব করা রাজ্য প্রজা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য, অবস্থার পার্থক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্বদা ঝংকার না দিয়া সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রাস্বের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতুজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতানুত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাহাদের নিকটবর্তী ছিলাম। আমরা দুর্বলজাতির হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মৃত হৃদয়ে উন্নতমতকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদিচ উচ্চতর রাজকার্যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া স্পষ্টবাক্যে সমালোচনা করিয়া আপনাদিগকে এই বিপুল ভারতরাজ্যশাসন-কার্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অগ্নি ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানিতাম আমাদের স্বদেশ-শাসনের বিপুল ব্যাপারে আমরা অকর্ষণ্য নিশ্চেষ্ট নহি—ইহার মধ্যে আমাদেরও কর্তব্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসনকার্যের উপর যখন প্রধানত আমাদের সুখদুঃখ আমাদের শুভ-অশুভ নির্ভর করিতেছে, তখন তাহার সহিত আমাদের কোনো মন্তব্য কোনো বক্তব্য কোনো কর্তব্যাবদ্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা আমাদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষত আমরা ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরেজি সাহিত্য হইতে ইংরেজ কর্মবীরগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভসাধনে আমাদের নিজের স্বাধীন অধিকার থাকার যে পরম গৌরব তাহা আমরা অমুভব করিয়াছি। আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই,—রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি, নর কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন বার্ষবেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে; যে-সময়ের

মধ্যে আদানপ্রদানের একটি সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে ;—রাজার প্রতি প্রজার সে-ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে-ভয় ততোধিক শোচনীয়।

এই মৃত্যুধ্বজের স্বাধীনতাভরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল একমুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো কোনো জবরদস্ত ইংরেজ লেখক বলেন, বাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরেজশাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাভণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গির যে বিচিত্র লীলা মনোহর স্ত্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া? দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধে এই কি অবশেষ?

১৩০৫

ইম্পেরিয়ালিজম

বিলাতে ইম্পেরিয়ালিজমের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজসাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধানে সে-দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক শুভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা বাইতেছে এইরূপ বড়ো বড়ো মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ-সকল মতলব টেকে না—কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

ঔহাদের দেশের এই খেরালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। সেখানিহি—আমাদের দেশের কোনো কোনো ধবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঔহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ “এম্পায়ারে” একাত্ম হইবার অধিকার দাও না।

কথার ছল ধরিয়া তো কোনো অধিকার পাওয়া যায় না—এমন কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাহারা আমাদের উপরও আলা তাঁহারা ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করি না।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কী, যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে-ব্যক্তি ইম্পীরিয়লিজ্‌মের বুলি আওড়াক বা নাই আওড়াক তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে তো অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেননা হাজার হইলেও দয়াদৰ্শ একেবারে ছাড়া কঠিন। লজ্জাও একটা আছে। কিন্তু একটা বড়ো-গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে, তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অনায়াস সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় “শিকার” তবে সে-ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত-আহত নিরীহ পাখির তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা-উপলক্ষ্যে যে-ব্যক্তি পাখির ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে-ব্যক্তি শিকারির চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখির তাহাতে বিশেষ সাস্তনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারির দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেলালে আছেন, তাহারা দুর্বলের স্বত্ব অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া, কিনল্যাণ্ড-পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেক্টরের সহিত একেবারে বেমালাম মিশাইয়া লইবার জন্ত যে কী পঞ্চস্ত চাপ দিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পঞ্চস্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজ্‌ম নামক একটা স্বাধীন বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যাণ্ড-কিনল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কার্জনও সেই ভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোলে।

কোনো শক্তিমানের কানে এ-কথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেননা, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গুড়ায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ সে-স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্টপরিমাণে

বিসর্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল ধরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে ময় 'আওড়াইতেছে, "ধদেতং হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব," কিন্তু তাহারা শুধু মস্ত্রে তুলিবার নর—পণের টাকা গনিয়া দেখিতেছে।

হতভাগা আমাদের বেলার মস্ত্রেও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি তো দূরে থাক !

আমাদের বেলার বিচার এই যে, বিদেশীয়েব সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক কিন্তু ইম্পীরিয়লিজমের পক্ষে প্রতিকূল ; অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে-সকল কারণ আছে, সেগুলোকে উৎপাটন করা কর্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই জ্ঞেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গোঁবল আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাধা ইংরেজের মতো অভিমानी জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়লিজম-মস্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ, তখন সেই মহত্বক্ষেত্রে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিস্মিষ্ট করাই "হিউম্যানিটি"।

ভারতবর্ষের কোনো স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ-সভানীতি অল্পসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর ; কিন্তু যদি মস্ত্র বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজম"—তবে বাহা মহত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গোঁবল হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্ত একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্ত পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরূপার করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনাদের মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল রোডস একজন ইম্পীরিয়লবাহুগ্রস্ত লোক ছিলেন ; সেইজন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাভাব্য লোপ করিবার জন্ত তাহাদের দলের লোকের বিরুদ্ধে আগ্রহ ছিল, তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে-সকল কাজকে চৌধ, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজ্জত-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মাজবাস্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইজ্জত আমাদের কর্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়লিজমের আভাস পাইলে আমরা স্তম্ভিত হইতে পারি না। এতবড়ো রপের চাকার তলে যদি আমাদের মর্মস্থান পিষ্ট হয়, তবে ধর্মের দোহাই দিলে কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভুল করিয়া দেয়, এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনীয়ানগণ যখন দুর্বল মেলিয়ানদের দ্বীপটি অজ্ঞায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, গ্রীক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়লিজম-তত্ত্ব যুরোপে কত প্রাচীন—এবং যে-পলিটিকসের ভিত্তির উপরে যুরোপীয় সভ্যতা গঠিত, তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রুরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

Athenians. But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must. ... And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

Mel. It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves?

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

রাজভক্তি

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রেয় পুত্র তাঁহাকে গণি দিয়া দিয়ারা বসিল— তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারও রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরাল, নটেশাকটি মুড়াল।

ব্যাপারখানা কী? একটি কাহিনীমাত্র। রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদূর্লভ মিলন যত সুন্দর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা, দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু বায়ে বহু নৈপুণ্য ও সমারোহসহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুত্রেরা ইহার মধ্যে কিছু একটা পলিসি, কিছু একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন—নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন? রূপকথার রাজপুত্র কোনো সুখ রাজকন্তাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র ভেরা নদী পার হইয়াছিলেন; আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুখ রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল?

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুত্রেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের অক্ষয়রটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ত বিদ্রুতের মতো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া বলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যসম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজ্যসনে ধাঁহার বসেন, তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা বৈরূপ অত্যুৎকট, স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বস্তুত ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবার সুযোগ কাহারও নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষে অধীন রাজ্য, তাহা ইংরেজ এখানে পদার্পণ করিবারাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এ-দেশে কর্তৃত্বের দৃষ্ট ক্ষমতার মন্ততা সহসা সংবরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজ্যকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই

নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কতৃৎ করিতে আসেন, তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এ-দেশের পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা কোনোকালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা একমুহূর্তেই হর্তাকর্তা। এমন অবস্থায় নেশার বোঁকে এই নূতনলব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে যে-ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন, সে-ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরেজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনা-গোনার রাজত্ব না হইত, যদি এ-দেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কতৃৎের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমান বাবস্থায় ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জলু এ-দেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে, আমরা কর্তা—এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্ত তাহারা আমাদেরকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদেরকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিক স্পর্শ করিতে পারে, এ-কথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব, তাহাও তাহারা স্পর্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক না কেন সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাজ্ঞা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটি সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্বল্য ঐকান্তে বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে, স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে কিন্তু তাহাকে ভালোবাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতেই থাকে। স্ত্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজতন্ত্রের দাবিদুহুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ—সে-সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে—তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুধুমাত্র জবরদস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না—

অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তিসম্বন্ধে যখন সম্মেলন হয়, তখন শুরু লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ, শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক-একবার রাজভক্তির জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জনদের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড কার্জন কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অমুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া তাঁহার অন্তরাগ্না “খোঁয়ারি” গ্রন্থ মাতালের মতো আজ যে-অবস্থায় আছে, তাহা যদি আমরা স্বার্থভাবে অমুভব করিতাম, তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্য লোলুপতা বোধ করি ভারতবর্ষের আর-কোনো শাসনকর্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাটসাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্বতন বাদশাহের স্তায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন—এবং স্পর্ধাপূর্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজ্যমাত্রেরই ব্যুত্থিত দরবার স্পর্ধাপ্রকাশের জন্ত নহে; দরবার রাজ্যের সহিত প্রজাদের আনন্দসম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আশ্বাস করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজশাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎ-নবাব দিল্লির প্রাচ্য ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়া এবং বদান্ততাকে সপ্তদাগরি কার্পণ্যদ্বারা ধ্বংস করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বস্তুত ইংরেজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারে দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যরাজ্য পীড়িত হইয়াছে, লেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র কল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্বত্বতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে—তাহাতে উলটা কল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় জনের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেইজন্য দিল্লির দরবারে ডাক অফ কনট থাকিতে কার্জনের দরবারতন্ত গ্রহণ ভারতবর্ষীয়মাত্রকেই বাঞ্ছিত ছিল; এরূপ স্থলে ডাকের উপস্থিতি থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে কার্জন নিজের দস্ত-প্রচার করিবার জন্তই ইচ্ছাপূর্বক দরবারে ডাক অফ কনটের উপস্থিতি ঘটাইয়াছিলেন।

আমরা বিলাতি কারদা বৃদ্ধি না, বিশেষত দরবার ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য, তখন এ উপলক্ষ্যে রাজবংশের প্রকাশ্য অবমাননা অন্তত পলিসিসংগত হয় নাই।

যাই হ'ক ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত ; বোধ করি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এ-দেশকে হৃদয় দেয়ও নাই এ-দেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমনব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না—মনে রাখিবার কিছু রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ-কথা সত্য। হিন্দু-ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবত্বা ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ এ-কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দৈবসম্বন্ধ না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন ইউক না, মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম,—ইহা পুণিতে লিখিবার কালেজে পড়াইবার নহে—ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিকলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গললাভ করি, সেই সম্বন্ধের মধ্যই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি, তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বত্ববনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্ত্য দুর্বলতা তাঁহাদের মস্তক সমুদয়ই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইহারা পিতামাতারূপে আমাদের সে কল্যাণ সাধন করিতেছেন,

সেই পিতৃমাতৃর জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ; শক্তিপ্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান পুরুষের সত্তা অমুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজ্য করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না, ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে, এই ঐক্যতা ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূল সে দৈব অমুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাচে। কারিকর তাহার যত্নকে প্রণাম করে, ঘোষা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, স্ত্রী তাহার বঁগাকে প্রণাম করে;—ইহারা যে যত্নকে যত্ন বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে যত্ন একটা উপলক্ষ্যমাত্র—যত্নের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে, তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে, কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রের স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা যিনি বিশ্ববিশ্বের যন্ত্রী তাহার নিকট এই যত্নযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অমুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়ার আশ-কিছুই হইতে পারে না। জন্দের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অমুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মতো এতবড়ো মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে জন্মের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্তিমান না দেখিয়া বাচে কিরূপে? আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়—যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয়; অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে মঙ্গলের প্রত্যক্ষরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি। নহিলে হ্রস্ব প্রতিক্ষণেই ডাঙিয়া বাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই—রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অমুভব করিতে চাই—আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ-কথা সত্য। কিন্তু সেইজন্য

রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাশার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্কুরে দেখিতে ভালোবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছে না বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহুরাজার দুঃসহভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপে মর্মে মর্মে বাধিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্মামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিকমাত্র, ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে, যাহারা পেটের দ্বায়ে নির্ধাসনে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে, যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধ নাই—অহরহ পরিবর্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়-সম্পর্কশূন্য আপিসি শাসন নিরন্তর বহন করা যে কী দুর্বিষহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, হে ভারতের প্রতি বিমুগ্ধ ভগবান, আমি এই সকল ক্ষুদ্র রাজা ক্ষণিক রাজা অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য; বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাক্সারিয়ারের নয়;—ভারতবর্ষ যাহাকে অস্ত্রের সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজ্য; হালিডে রাজ্য নয়, ফুলের রাজ্য নয়, পায়েনিয়র-সম্পাদক রাজ্য নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজত্বকে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলণ্ড গোণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক সমাজের সম্পর্ক রূপিব না এ স্পর্ধা ধর্মরাজ কখনোই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না—ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য শাসনই বল, শাস্তিই বল, কিছুই দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়-ভুক্তি পূরণ হইতে পারে না। এ-কথা গুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিশ-সর্প কণা তুলিতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ রিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল—আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজ্য আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে—রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ

রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, এ-কথা মনেও করিয়ো না। তোমরা আমাদেরকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক, ইহারা শাস্তিতে আছে তবু ইহারা আর কী চায়। ইহা জানিয়ো, হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ খেচ্ছা-পূর্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শাস্তি নহে, মানুষ তৃপ্তি চাহে এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ। আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যাকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়—আমাদের হৃদয় বশ করা জুলর, পুনিটিড পুলিশ এবং জোর-জুলুমের কর্ম নহে।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহলা, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মবিশ্বাসনা, অন্তঃস্বামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাক্ষনার উপরে তোমার মস্তককে অবিকলিত রাখো—এই সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুণ্ডাশ পরিয়া তোমার অন্তরাঙ্গাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জলতা পরম-শক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন গর্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলামাত্র—ইহারা যদি বা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ার গৌরব—যেখানে সে-সম্বন্ধ নাই সেখানে বাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ক্ষুদ্র রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আত্মা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেইজন্ত বহুদুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্তের বাহ্য অঙ্গকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এককাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্ত এতদিন কাটিয়া আছে, তাহা কখনোই নহে। তুমি বাহা হইবে বাহা করিবে অন্ত দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার বশাস্তানে তুমি বিশ্বভূবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপবনমালার পাদমূলে মহাসমুদ্রপরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আস্থানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মস্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্মের, কি ধর্মের অনেক বিরোধ সীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে

আধুনিক নিষ্ঠুর 'পোলিটিক্যাল কালভুলজ'ের বিদ্যেবী বিবাক্ত নর্প পরিশাস্ত হইবে।
তুমি চকল হইয়ো না, লুক হইয়ো না, ভীত হইয়ো না, তুমি

আত্মনাং বিদ্ধি

আপনাকে জানো। এবং

উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বহান্ নিবোধত

কুরস্ত ধারা নিশিতা হ্রত্যায়া হুর্গং পথস্তং কবরো বদন্তি।

উঠ, জাগো, বাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাঠিয়া প্রবৃদ্ধ হও,

বাহা বথার্থ পথ তাহা কুরধারশাপিত হুর্গম হ্রত্যায়া, কবিরা এষ্টরূপ বলিয়া থাকেন।

১৩১২

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না।
সাবেক কাল যখন হাজির নাই, তখন একতরফা বিচারে বাহা হইতে পারে তাহাই
ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো বা সেকালের ভাগ্যে যশ
জ্যোটে, কখনো বা একালের জিত হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা
যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল স্থূণের ছিল কি ইংরেজের আমল স্থূণের,
গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ নিশ্চিন্তি হইতে পারে না।
নানা স্থূষ জিনিসের উপর মাতৃষের স্থূষদুঃখ নির্ভর করে—সে-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া
দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যেকালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাব্দ সঙ্গে
লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মন্ত প্রভেদ ছোটোবড়ো আর-সমস্ত প্রভেদের
উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়ো, তেমনি
নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর।
আমাদের এই ছোটো প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া
দেখিতে চাই।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি
কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে

অনেক। এ-কথাটা এতই সোজা যে ইহা প্রমাণ করিবার সম্ভব কোনো ক্ষমত্বের প্রয়োজন হয় না।

বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজজাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল—এখন অত্যাচার নাই কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুর দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে। কিন্তু মাহতের বদলে যদি আর-একটা গোটা হাতিকে সর্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুরের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটিমাত্র দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দেখিতে সুপাকার হইতে পারে এবং যে-ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয়তো অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেজ্জিশ কোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপড়িও যদি দেওয়া যায়, তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্ত হউক না কেন, তলে তলে ব্যাপারখানা বড়ো কম হয় না। তবে কিনা, এই একটা একটা করিয়া পাপড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। যোগলের চেয়ে ইংরেজ ভালো কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কিনা অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বুঝা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেও একটা লাভ।

মনে করো,—এই যে আমরা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড়ো বড়ো চাকরি প্রায় ইংরেজের ভাগ্যে পড়িতেছে ইহার প্রতিকারটা কোন্‌খানে? আমরা মনে করিতেছি বিলাতে গিয়া যদি ঘারে ঘারে ছুঃখ নিবেদন করিয়া কিরি, তবে একটা সম্ভাবিত হইতে পারে।

কিন্তু এ-কথা মনে রাখিতে হইবে বাহার বিরুদ্ধে নালিশ, আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদশাহের আমলে আমরা উজির হইরাছি, সেনাপতি হইরাছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইরাছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইরাছে ইহার কারণ কী? অল্প গৃহ বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে তো স্পষ্টই

দেখিতেছি। ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের অল্প অল্পসহ খোলা ধাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্বন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রের জোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তম এডোআর্ড স্বার্থাই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজ্য হইয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হজুর, অন্নের যদি বড়ো বড়ো গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে, তবে তোমার রাজ্য টেকে কী করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, তাহঁতো আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্ত যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন?

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত এবং অল্পের লুক্কহস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে ‘আমার রাজ্য’ বলিয়া জানে। এ-রাজ্যে তাহাদের ভোগের বর্ধতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্তা এ-স্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসংখ্যকবিশিষ্ট রাজ্যের মূলের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্ত তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিয়ম, এ-কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মোটকথা,—একটা আশু জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অল্প দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভালো রাজ্য হইলেও এ-রকম অবস্থায় রাজ্যের বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড়ো কঠিন। মুখ্যতঃ অল্প দেশের এবং গোণতঃ আপনার স্বার্থ যে-দেশকে একসঙ্গে সামলাইতে হয়, তাহার অবস্থা বড়োই শোচনীয়। যে-দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কী করিয়া? না হয় চুরি ডাকাতি বন্ধ হইল, না হয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূচিচারই ঘটয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়?

অতএব কনগ্রসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট আমাদের রাজ্য করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিল। একটা দেশ যতই রসালো হউক না, একজন রাজ্যকেই পালিতে পারে, দেশশূন্য রাজ্যকে পারে না।

পথ ও পাথের

জ্যেলে প্রতিদিন জাল কেলে তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল কেলিতেই হঠাৎ একটা বড়া উঠিল, এবং বড়ার মূণ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল, আরব্য উপজ্ঞাসে এমন একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা বড়া ঠেকিবে, এবং বড়ার মধ্য হইতে এতবড়ো একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনোদিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষুর নিম্নে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই স্তূরব্যাপী চাকল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ডেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সেজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করে না কিন্তু সংকটের দিনে তাহার মতো শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্বল চিন্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্তকে ভুলাইবার জন্ত কেবল কতকগুলো বার্থ বাক্যের ধূলা উড়াইয়া আমাদের চারিদিকের আবিল আকাশকে আরও অন্ধকার করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাকল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোনোপ্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অস্থায়ী দিনে হৃদয়াবেগপ্রকাশের উত্তেজনা সংবরণ করিয়া যথাসম্ভব শাস্তভাবে যদি বর্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে অবিকার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে বার্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, “আমি ইহার মধ্যে

নাই ; এ কেবল অমুক দলের কীর্তি ; এ কেবল অমুক লোকের অন্মায় ; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এ-সব ভালো হইতেছে না, আমি তো জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে ।”

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয় স্মরণ্য লঙ্কার বিষয় বলিয়া মনে হয় । বিশেষত আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্ত রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্তকে গালি দিয়া নিজেকে ভালো-মাহুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই—অতএব দুর্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভালো ।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের 'পরে উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা । তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অল্পগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডাঘাতের দিকে বিচলিত করিবে না । অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীক স্বভাবের নির্দয়তা প্রকাশ পাইবে । ব্যাপারটাকে আমরা যেমনই দোষাবহ বলিয়া মনে করি না কেন, সে-সম্বন্ধে মতপ্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্মানের মঞ্চাল লঙ্ঘন করিব কেন ? সমস্ত দেশের মাধার উপরকার আকাশে যখন একটা কলরোম রক্তবর্ণ হইয়া শুক্ক হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধ্বরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন এক-প্রকার অসংগত ।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন না এ-কথা আমাদেরিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই । বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না ।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন এ-কথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে । এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে ষাহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভৎসনা করিয়া বলা সহজ যে, তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভালো হইত ।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালি, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্রাট্যর বিশেষভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভার্য খোটা পাইয়া আসিয়াছে। সর্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলাদেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রুমিত্র কাহারও কোনো সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই এ-পর্বন্ত কথার বার্তার ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো বা পর কখনো বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালি বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে, যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীকু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনাসম্বন্ধে স্তায় অন্তর্য ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ-কথাটা সত্য যে, বাংলাদেশের মনের জালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে-প্রকার অগ্নিমূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যস্বাবী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই। অতএব আশ্র আমাদের এই অকস্মাৎ-বুদ্ধিবিকাশের দিনে, যাহাকে আমার ভালো লাগে না তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসংগত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাই না। কিন্তু কেমন করিয়া কী ঘটিল এবং তাহার কলাকলটা কী, সেটা নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া করিয়া এ-কথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাববশত যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদি বা গ্রাহ্য না-ও করেন আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ঐর্ষ ও প্রজ্ঞা রক্ষা করিবেন।

বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে বাহা ধটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন

বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্য ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে শাস্ত্র জোগাইয়াছি। অতএব যে-চিন্তনাই কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে বাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানা প্রকারে অমুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এই প্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্যুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালিমাঝেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিকৃতি পাইবে না। আমরা কী করিব কী করিতে চাই সে-কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জ্ঞান, আমাদের মনে আগুন জলিয়াছিল; সেই আগুন স্বভাবধর্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্‌পানে কেরোসিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হ'ক, কার্যকারণের পরস্পরের যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে এ-সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই : লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে-সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিষ্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে, কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনোই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরও প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্তমান সংকটে রাজপুরুষদের কী করা কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালায় দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুঃশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে তুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্ত ভূষণঃ ক্রমা—কথা আরও একটু আছে, ক্রমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্রমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাংঘিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

বাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে ; একদিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্তি ধরিতেছে, অন্যদিকে দুর্বলের নিরাশ মনোরথ সকলতার কোনো পথ না পাইয়া প্রতিদিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে ;—এ অবস্থায় সমস্তটি ছোটো নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেলালে চলিতেছে ; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে ;—মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালোই, যদি না-ও হয় তবু দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্তকে গালি পাড়িয়া কোনো সাধনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচূপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্নেন্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এ-সমস্ত কিছুই নয়, এ কেবল দুই-পাঁচ জন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি তো এ-প্রকার শূন্যগর্ভ সাধনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ ফুংকারবায়ুমাত্রে আমরা গবর্নেন্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও কিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত দেশের বর্তমান অবস্থায় কোথায় কী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদের কাছে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সংকটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে গবর্নেন্টের শাসননীতি যে-পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিন্তকে যেমনই মৰ্শিত করিতে থাক আমাদের পক্ষে আত্মবিশ্বস্ত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে এ-কথা যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্ত করা কার্যহস্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম-মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে ; তৎসঙ্গেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্বলকে ধর্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহার উত্তর দেয়, এ তো ধর্ম মানা নয় এ ভয়কে মানা।

অন্নদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে-কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্বেক করিয়া দিবার জন্ত তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ধরত্মার জালাইয়া, খাণ্ডদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। “মার্শাল ল” শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে গ্ৰাথবিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিশ্ব বলিয়া নির্ভাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। পুনর্নিতি পুলিশের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্বরতাও এইজাতীয়। এই সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকাণ্ডে বিস্তৃত ন্যায়ধর্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পষাণ্ড নহে।

যুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিধাত্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বাঙ্গকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্ম-বুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্ত দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে-সকল লোক শুণ্ডপন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে-যুগে বর্তমান, এ-যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে-দুঃখ তাহা সমস্ত মানবকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্ত প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্ত রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে-সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত সংকটে পড়িয়া মানুষ্য বেদিন স্তম্ভষ্ট বৃত্তিতে পারে যে, অধর্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই ঐধা গোলামি করে তাহা নহে, সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া

যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ংকর হইয়া উঠে তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রক্ষা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্মকে জয় করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্ধেহের সঙ্গে সন্ধেহের, বিচ্ছেদের সঙ্গে বিচ্ছেদের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপে করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে পাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান-জিনিসটা যে কতই বড়ো এবং কতদিকেই যে তাহার অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত সে-কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্তা নিতান্তই দুর্লভ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটি স্নেহময় কর্মের ভার দিয়াছেন, আরও মানবসমাজের এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে, তাহার মাহাত্ম্য যেন একমুহূর্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোনো-প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো-না-কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্বতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যেদিন আৰ্ধজাতি গিরিগুহামুক্ত শ্রোতস্থিনীর মতো অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন সেইদিন ভারতবর্ষের আৰ্ধঅনার্ধসম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপক্রমণিকা গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ক্রান্ত হইয়া গিয়াছে? বিধাতা কি তাহা শিশুর ধূলান্নের নির্মাণের মতোই আজ হঠাৎ অনাদরে ডাঙিয়া ফেলিয়াছেন? তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র বঙ্গপ্রজন্মভার-গভীর মেঘমস্তকের মতো ধ্বনিত হইয়া এশিয়ার পূর্বসাগরতীববাসী সমস্ত মঙ্গোলীয়

জাতিদিগকে জাগৃত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর
 আপান পর্যন্ত ভিন্নভাষী অনাস্থীয়দিগকে ধর্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মা করিয়া
 দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যাস কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই
 পরিণামহীন পণ্ডতেই পর্যবসিত হইয়াছে? তাহার পরে এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে
 দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর-এক মহাশক্তি সৃষ্টি হইতে জাগৃত হইয়া ঐক্যমন্ত্র
 বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্রাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিশ্রোতকে
 বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আত্মান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি
 তাহাকে চিরদিনের জন্ত আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি
 কোনো একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোনো চিরপরিচয়
 নাই? তাহার পরে যুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের
 কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন
 তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আত্মান বহন
 করিয়া আমাদের পক্ষে আঘাতের দ্বারা জাগৃত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে
 বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন ষণ্ড ষণ্ড দেশের পণ্ড ষণ্ড
 ধর্মসম্প্রদায় বিরোধবিচ্ছিন্নতায় চতুর্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শংকরাচার্য
 সেই সমস্ত ষণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অপণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায়
 ভিন্নত্ববর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা
 যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, তখন
 চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের
 অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র
 ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত
 হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাক্ষণানে
 ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা
 নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ,
 শিবনারায়ণ স্বামী ইহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে কৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত
 করিবার জন্ত জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল
 হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিকল্প
 প্রলাপমাত্র নহে,—ইহারা পরস্পর গ্রথিত, ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো
 অন্তর্ধান করে নাই,—ইহারা সকলেই রহিয়াছে; ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই
 হউক ষাৎপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ণ নিচিহ্নরূপে সংরচিত করিয়া

তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর-কোনো দেশেই এতবড়ো বৃহৎ রচনার আরোজন হয় নাই,—এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে ধারণা তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জরী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর-কোথাও ধ্রুত হয় নাই। আর সর্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক, প্রতাপ বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ উপস্তা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে, জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কর্তার সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিষকে বিকীর্ণ করিয়া দিক—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। যেত ও কুক, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে,—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতিকঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তব উপনিষদ এমন আশ্বর্ষ্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানাদিক দ্বিধা ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অস্বরোধ করিতেছিলাম অন্তান্ত দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাতবিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অঙ্কভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনোমতেই কৃতকার্য হইবেন না—এ-কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সকলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদেরকে তুলাইয়া লইয়া ভয়ংকর বার্ষিকতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা দ্বাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ-অধৈর্য-অহংকারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারতবিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের স্তায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন এ-কথা আপনারা ঐব সত্য বলিয়া জানিবেন, তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উদ্বুদ্ধ নহেন, তাঁহারা কর্মনির্দেশশূন্য স্পর্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের

লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না— নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শাস্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাঞ্জিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায় কোনো একটা বিশেষঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতার দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহুর্তে উদ্বিগ্নভাবে ধাবিত হয়, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শাস্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে, আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমতো বিচার করিয়া লওয়া বড়ো কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন স্মৃতিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীকৃত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অসুস্থ উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাঙারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তকে কাটাইয়া সে-দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অস্তঃপুরের ভাঙারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিহ্নিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি, বুদ্ধি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূলকারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহুভাবে দেখিয়া এ-কথা তুলিলে চলিবে না যে, যে-দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনোই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই তাহাদের স্বজনীশক্তিকেই সচেতন সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব, কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে-জাহাজ জড়স্ব দূর করিয়া হহ করিয়া চলিয়া গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আর-কিছু না হউক সে-জাহাজের ধোলের তক্তা-গুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্বে ছিল এমন হয় তবে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি ধোলের অঙ্ককারে অলক্ষ্যে বসিয়া সেগুলি সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আলগা তক্তার উপরে আর একটা আলগা তক্তা ঠকঠক করিয়া আঘাত করিতে থাকে ওই দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিস নয়? আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? ভিতরে যখন এমন সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উদ্বেজনাতে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়?

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি তখন আমাদের দেশের কোনো দুর্বলতা কোনো ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুগ্ধরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সঙ্ক্ষে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষুর পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধমাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদের অক্ষম করিয়া রাপিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লালিত হৃদয় উদ্ভ্রাম হইয়া উঠে। এই প্রকারে অত্যন্ত চিন্তাক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিংবা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মাহুঘের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্নতের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্বেগ করিতেছে তখন তাহার মতো

মর্যাদিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরমদুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারংবার দৃষ্টপক্ষ পতনের দ্বারা নিশ্চিত পরাভবের বহিঃস্থায় অঙ্কভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাই হ'ক, যেমন করিয়াই হ'ক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের জ্বলন্ত আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্বীর্ণ হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোনোদিন স্বাভাবিক অমুরাগের দ্বারা দেশের হিতাহুতানে ক্রমাগত অধ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চসংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কাৰ্যক্ষেত্র হইতে দূর্তাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অহুসরণে সংকীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মণ্ড হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদের কাছেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই শুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরও অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্বীদ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্বী ভঙ্গ করে, এবং তপস্বীর ফলকে একমুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভুতে তপস্বী করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উদ্বীর্ণতা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্বীর ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্বীকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপস্বীস্বাক্ষরকে চকল স্নাতরাং নিফল করিবার অন্য উদ্ভিন্ন-পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়ারকেই সে শুদাসীন্ত বলিয়া জান করে, টান দিয়া

কলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে-মালী প্রতিদিন গাছের তলার জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ-অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়ারকে সে ছোটো কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোনো সার্থকতাই দেখিতে পার না।

কিন্তু ক্ষুণ্ণির সঙ্গে শিখার যে-প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে-ক্ষুণ্ণি বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্ত। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে ক্ষুণ্ণি প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখার পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপেরচনার আয়োজন করিবার উত্তম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অন্তরোধে স্বীকার করিতেই হইবে, এমন করিয়া কখনোই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে স্থলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। এ-কথা তুলিয়া যায় যে, এই অস্বাভাবিক স্থলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর-একদিক দিয়া এমন করিয়া কবিতা মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সত্যের পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধনবুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মতো দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ-কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভালো জিনিসের এত স্থলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাজ্যঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্ত জ্ঞান করিয়া যদি স্থলভে কাজ সারিবার আশাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধনপ্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-সত্যের সাংঘাতিক দার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলই বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মানকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলই সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে-কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনাই দরকার বেশি; সেটা রীতিমতো পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত বাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোটো নজরের লোক, তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলই ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মগ্ন এই হইল—

পীড়া পীড়া পুনঃ পীড়া পুনঃ পততি ভূতলে

উথায় চ পুনঃ পীড়া পুনর্জন্মো ন বিদ্যাতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেকেই আহ্বান করিলাম, অনেকেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোনো কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না বাহাতে উদ্‌বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্মের বাধাবিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই তো কর্মসাধনের সবপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে তাহার চেয়ে বড়ো। এইজন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া জাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দৃঢ়দর্শী কর্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্তবশত তাঁহার তো সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা বাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পায়ে মদই ঢালি। এঞ্জিনে স্টীমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রায় গুঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে তখন আমরা উত্তর করি, এ-সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই—সময়কালে

আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে, মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এগ্নিতে দহই চড়াইতে থাকিব।

এ-পৰ্বন্ত ধাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয়তো আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে যে-উত্তেজনার উদ্বেগ হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভকল প্রত্যাশা করিবার নাই?

নাই এমন কথা আমি কখনোই মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেত সচেতন করিয়া তুলিবার জন্ত এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কী করিতে হইবে? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে-পরিমাণ মদে ক্ষীণপ্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দেয়; যে-সকল সত্যকর্মে ধৈর্য এবং অধাবসায়ের প্রয়োজন সে-কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিক্রিতি নিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দ্বায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মস্ততরই আত্মক্ল্যা করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চস্বরেই বাধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ-জ্বিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহিমুখ না হইয়া যখন কেবলই অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিশ্বের মতো কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উগ্রম আমাদের প্রাণমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কূর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্ত প্রথম যে একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম, ইংরেজ জম্বাস্বরের স্মৃতি এবং জম্বাকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতানির্দিষ্ট আমাদের সেই বিনাচেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো বা বন্দনা করিতাম কখনো বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত অগ্নি আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল, আগেকার মতো পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্ত নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না, কিন্তু আশ্চর্য এই, আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার কল পাইতে থাকিব, এখনও ভাবিতেছি কল পাইবার জন্ত প্রচলিত পথে চেষ্টাকে

খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্ত রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কী করিয়া? ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া ঠাট্টা? কিন্তু অভিমানের সহিতে পারে না, মন্তত! বলে আমার সিঁড়ির দরকার নাই আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধাসাধন তো সকলেই পারে, অসাধাসাধনে আমরা এখনই জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজই করিতে চায়, সে ছোটো হইতে বড়ো কিছুকেই অবজ্ঞা করে না, কোনো কর্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘূচে না। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায় সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমানমাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে, আমি ঠাট্টা চলিব না আমি ডিঙাইয়া চলিব। অর্থাৎ পৃথিবীর অল্প সকলের পক্ষেই যাহা পাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, ধৈর্যের প্রয়োজন নাই, অধাবসায়ের প্রয়োজন নাই, সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি পরের শক্তির প্রতি গতকল্য যেমন অঙ্কভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অঙ্ক প্রত্যাশা লইয়া আশ্বাশন করিতেছি। তখনও যথাবিহিত কর্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল এখনও সেই চেষ্টাই বর্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল খেতের ধারেও যায় নাই, বাপ চাষ করিত তাহার দিবা বাইত—বাপ যখন মরিল তখন যেতে নামিতে বাধ্য হইল কিন্তু চাষ করিবার জন্ত নহে—তাহার স্থির করিল মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের কসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ-কথা শিশিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ-কথা সহজে না শিখি যে, দৈবধন কোনো অস্বুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুস্থ লোক সে-ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদেরি ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে, তবে আশাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপদে যতই অগ্রসর হইব কিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অর্ধেক বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে

ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবৃত্তি নষ্ট হয় ;—
তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়—তখন
ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্নত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে
কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার দ্বারা অসামান্য
উপায়ে সিন্ধুনাভের প্রলোভনে আমাদের অতিশুকুমার ছোটো ছেলটিকেই যজ্ঞের
অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিরাছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্তশুদ্ধির দৃষ্টি এড়ায়
নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্ত বেদনার সমস্ত দেশের হৃদয়
বিদীর্ণ হইতেছে—দুঃখ আরও কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্মতিকে সংবরণ করা অত্যন্ত দুর্লভ। অস্ত্রায়কে
অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অস্ত্রকরণকে বিকৃতি
হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায় ;—ভায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে এক-
বার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার
সঙ্গে আবার আমাদের ঐক্য জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্ত প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য
হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে এ-কথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের
সহিত আমরাগিকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত
অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অভ্যুক্তিদ্বারা ইহাকে
ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে
কর্তব্য নহে।

আমরা সাধামতো বিলাতি পণ্যস্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও
উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা
করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম,

নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে নাও পাতে,

তাই বেন কচে,—

ঘোটা বস্ত্র বুনে নাও যদি নিজ হাতে,

তাহে লজ্জা বুচে ;—

তখন লর্ড কার্জনদের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং
বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশী পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা
করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমরাগিকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যতবড়ো কাজই ইউক

লেশমাত্র অন্ত্রায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ-কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভালো, প্রতিবন্ধতা ভালো, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন কোনো ইচ্ছাজাল ভালো নহে যাহা একরায়ে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশাস দিয়া বলে আমাদের উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হায়, মনে না কি ভয় আছে যে একমুহূর্তের মধ্যে ম্যাক্সিমেলের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্বেগ, অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সামগ্রিক তাগিদে বধিরকর কলকল্য বিদ্রাস্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসহীন দুর্বলতা, স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, গুণ্ডাবৃত্তিকে অমান্য করিয়া অতিসহর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতিদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব ইহা কখনো হইতেই পারে না—এ-কথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট-ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বৃথি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অল্প সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের স্তাঘ্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্ত্রায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেইজন্যই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি;—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতময়তার দ্বারা পঞ্চহলাজকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতিক্রান্তি ভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি অত্যধিক

নিশ্চয়তরূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরূপে অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। অগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপ্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন, আমরাও মত প্রচার করিতে চাই কিন্তু আর-সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতন্ত্রটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ মজবুত শক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদেরকে বাধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই তো চারিদিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনোমতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অস্ত্রে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এ-দেশের পরাধীনতা মাথাধরার মতো ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মতো ইংরেজগবর্নেন্টরূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে—ওইটেকেই যে-কোনোপ্রকারে হ'ক টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহুর্তে আমরা হালকা হইব। এত সহজ নহে। ইংরেজগবর্নেন্ট আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণমাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমরা দিবার মতো অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজারল্যান্ডও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে?

এমনতরো নজির দেখাইয়া আমরা নিজেকে ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধূলা দিতে পারিব না; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য তো নানাপ্রকারে থাকে—যে-পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজারল্যান্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিল্লিষ্টতাই ভাব,

জাতি, ধর্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া তো নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখি না। চম্‌ বুজিয়া এ-কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে, আমাদের আর-সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একস্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদেরকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সঞ্জীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমন করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া রাখিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সঞ্জীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য, দড়ার বাধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমনভাবেই থাক, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পোড়া দিবেই কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনই ওই দড়াটাকে স্বাকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি রাখিয়াছে এ-কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ওই জোড়ের মূগে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় জোড় রাখিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বাকার করিয়া অথচ তাহার গুণে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, শ্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটনমূলক সহশ্রবিধ স্বজনের কাছে ভৌগোলিক ভূগুণকে স্বদেশ রূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

তিনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের স্বাধীনতার বিষয়েই আমাদেরকে একাদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীণ্য ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো সকলকেই বাধিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতররূপে

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অসুবিধা হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিকারপ্রাপ্ত বেদনার ঐকোই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিষয়কেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

এ-কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্রোহের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ-দেশ ত্যাগ করিবে, তখন ক্রিমি ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্রোহের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্রোহবৃদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

“ততদিনে যেমন করিয়াই হউক একটা-কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই, আপাতত এই-ভাবেই চলুক” এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ-কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ-দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রাস্ট যেমন সর্বাধিকার প্রাপ্ত উপায় ব্যতীত স্তম্ভ ধনকে নিজের ইচ্ছামতো যেমন-তেমন করিয়া ষাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহুলোকের এবং বহুকালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদৃশ্য আঁপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনভরো নিত্যস্ত টিলা বিবেচনার কাজ বর্তমানের প্রয়োচনার করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনোই কর্তব্য হইতে পারে না। কর্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারংবার বলিয়াছি এবং বারংবার বলিব—শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্ভূত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ওই পরের দিক হইতে ক্রকটিকূটিল মুণ্ডটাকে ফিরাও, আবাড়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপগত তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগ্গন্তিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাধিয়া ফেলো : কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদ্বার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজ্যের সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদেরিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কখনোই আমাদেরিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না,—আমরা জরী হইবই,—বাধার উপরে উদ্ভাদের মতো নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে, অটল অধ্যবসায় তাহাকে শঠন শঠন:

অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্যসিদ্ধির সত্যসাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মতো সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ওই যে বন্ধিশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝংকার শুনা যাইতেছে, দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড়ো করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসংগীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কত যুগ হইতে বিপ্লবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্ডন, এ-দেশের সিংহদ্বারে কত বড়ো বড়ো রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, অগ্নিকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে। ভয় করিব না, ক্ষুদ্র হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া বাস্তব হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অগণ্য মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিন্তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবিগল মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্ডন হইবে, জ্ঞানতির সহিত জ্ঞানতির মিলন ঘটবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছিন্ন এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল—এত বহুত্ব এত বেদনা এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সময়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরম্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্তায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে, বাহ্য আঘাত করিতেই জানে, যাহা দৈব মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদের দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে যুগা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিশেষ উদ্গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুদ্বারা ক্ষীণত সংবাদপত্রের

মর্যবধনি, সেই বিলাতের টাইমস অপবা এ-দেশের টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বিদ্যেযতীক্ষণ বাণীই কি অঙ্কশাষাতের মতো আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যাতর নিত্যাতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি ঐ-দেশে উচ্চারিত হয় নাই--যে-বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে? সেই সকল শান্তিগন্তীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরান্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, বাহ্যতে শক্রমিত্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, বাহ্য পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্ষে প্রেমের অপরাঙ্কিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব। দুঃখবেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মস্তৃষ্ণত্বের যে পরমাত্মব মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অস্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, ঋষিরা যাহাকে বলিয়াছেন

স সেতুবিধতিরেখাং লোকানাম্—

তিনিই সমস্ত লোকের বিধতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে

তত্ত্বং হবা এতত্ত্বং ব্রহ্মণো নাম সত্যম্—

সেই যে ব্রহ্ম, নিপিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্যরক্ষার যিনি সেতু ঈহারই নাম সত্য।

সমস্যা

আমি “পথ ও পাথের” নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অমূল্যভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোনটা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কী তাহা লইয়া তো কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মামুবের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর-একদিক দিয়া বার বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এককাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানার এবং সভাস্থলে কথার লড়াইরূপেই সঞ্চার করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মতো ছড়াইয়াছে, আগুনের মতো জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন ভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালংকারের কংকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য বাহাদুরের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পুরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসংগত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ-সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ জন্মের উপর দিয়া নিকৃতি পাইয়া বান না ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা বতই প্রবল হ'ক বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা বন্ধন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না, তখন আমরা পরস্পর কী কথা বলিতেছি কী ইচ্ছা করিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুকিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিকল্পপক্ষের বৃদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয় তো প্রতারণিত করা হইবে। বৃদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে এ-কথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে। অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া “পথ ও পাথের” প্রবন্ধে যে আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অমূল্যবত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদেরগিকে কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই

করিয়া চলিতে হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোটো কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সন্মুখে যখন আমরা তুর্ক করি তখন সেই তুর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হ'ক এবং যতই ভাল হ'ক বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা। কোন্ ব্যক্তির চেক-বহির পাতায় কতগুলো অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক ব্যাংকে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সংকটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথার হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে—তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে, ভালো করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের অন্তর্ভুক্তই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যাকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যতবড়ো কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সন্মুখেও প্রধান প্রয়োজনটা কী সে কথা আলোচনা উপলক্ষে আমরা যদি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মন্থ নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মতো সে-কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিতিমতো স্বপ্নের দাবি শাস্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

“লব ও পাথর” প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার-আদালতের ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে শণ্ডিষ্যও করাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গীজা বা মদের মতো তাহা মানুষকে অকর্মণ্য এবং উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্টী যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেইজন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড়ো বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নিচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা

প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্যে অধিকতর হিউমান, অর্থাৎ মানব-চরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে;—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধূলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন আর, রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানব-চরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ-কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটধারা এ-কথা মানুষ কোনোদিনই স্বীকার করিতে পারে না; এইজন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিপাকেই বেশি মান্ত করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, এ-কথা সত্য যে, মানব-ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্টা প্রধান কোন্টা অপ্রধান, কোন্টা বর্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, “রেখে দাও তোমার ধর্মকথা।” বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং কষ্ট বৃদ্ধিই তদুপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃকপাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্ত করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যিক। ম্যাটিনির পর যে-ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নির্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; রাগের সময় এই প্রকার সংকীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগনতিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক, কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিংয়ের ক্ষমানীতিক সেটিমেন্টালিজম অর্থাৎ বাস্তববর্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে-পক্ষ অক্ষোহিণী সেনাকেই গণনাগোরবে বড়ো সত্য বলিয়া

মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলা হ'ল এবং যতই কুসুমুতি ধরিয়া আনন্দ তিনেই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপৰ্য এই যে, যথার্থ বাস্তব যে কোন পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুৰ্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শাস্ত্রসম্মিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় পূৰ্ব, এবং যাহা মাহুষকে এত বেগে তাড়না করে যে, পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্ত করিয়া থাকে এ-কথা আমরা স্বীকার করিব না।

“পথ ও পাথর” প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমত ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিতব্যাপারটা কী? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজ তাড়ানো বা আর-কিছু? দ্বিতীয়ত সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া।

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কী তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব হর্তাকর্তা ভারতবর্ষের চাকলা সম্বন্ধে যতকিছু উমা প্রকাশ করিয়াছেন সমগ্রই ভারতবাসীর প্রতি। তাহার মত এই যে কাগজগুলোকে উচ্ছন্ন করো, সুরেন্দ্রবীড়ুজো-বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসংকোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মতো ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্তার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্ত গরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ভারতবর্ষের চাকলা নিবারণের পক্ষে ভারতের পেনশনভোগী এলিয়টের কি তাহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই? যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসংবরণ করিতে হইবে না, আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শয়শয়নিসংস্রমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্ত! তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্ফল না পায় সেজন্ত সতর্ক হইতে হইবে। আর যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষকে হত্যা করিয়া কেবলই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আঁজন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া

দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলমর্পে অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উত্তরকেই ভ্রষ্ট করিতেছে না? অক্ষয় যখন অস্থিমজ্জার জলিয়া জলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর কোনো উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনোমতেই ক্রটিতে চাহে না তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনাল কোডই ভারতবর্ষে শাস্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ংকর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোকা তুণীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে-চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদম্বিত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্গি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্ধামাত্র মনে করিয়া বুদ্ধবয়সেও দস্তুর উপর দস্তবর্ষণের অসংগত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাগিতেছে না মনে কর? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্তায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অজ্ঞারের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানবজন্মে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে-শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বন্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরন্তরকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, বাহা অক্ষমের ধৈর্যকেও অভিকৃত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাত নাই—তোমরা স্ত্রায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঐহত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অল্পচির করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃত্যার্পণের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে

সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতন্ত্রে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইমসের পত্রলেখক, ডেলি মেলের সংবাদরচয়িতা এবং পারোনিয়র-ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পত্তরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভকল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে-আবর্ত পাক বাইরা উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্বরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্ব্বন্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন এ-কথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্ব্বন্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; এ-কথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্বপ্রকারে অক্ষম ও অসুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিব্রংশ ও ধর্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য—যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না—দুর্ব্বলের সংশ্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধানের সংশ্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে;—স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই? বাধাহীন কর্তৃত্ব চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অজ্ঞতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা ধরিত্রেরই ক্ষতি এবং দুর্ব্বলেরই দুঃখের কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে কেবল দুর্ব্বলের দিকে চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে সমস্ত কল্পনাকে সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্ভিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব এমন অবস্থার দেশের কোন কথটা সকলের চেয়ে বড়ো কথা তাহা যদি একেবারেই তুলিয়া বাই তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে প্রেরণকর হয় না। হৃদয়বোগের ভীতভাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড়ো বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়ই ভ্রমকর ভ্রমে পড়িয়া থাকি, সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে

পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ-কথা আরও অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

“আচ্ছা, ভালো কথা, তুমি কোন্টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর” এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাদের জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অস্বত্ত্ব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাদের উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে-সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুঃস্থ হইতে পারে কিন্তু সমস্যাটি যে কী তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অস্ত্র দূরদেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সম্মান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যন্ত যে-জিনিসটি সকলের চেয়ে স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কী? সেটি এই যে; এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিমদেশের যে-সকল ইতিহাস ইন্ডুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। যুরোপে যে-সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না;—তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে, যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন যুরোপে গ্রীক রোমক গণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা, বিদ্যা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার অস্ত্র স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনই মিলিয়া গেছে তখনই বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্ত্রাকসন নর্মান ও কেন্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে জেতা জাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব যুরোপীয় সভ্যতার মাহুঘের সঙ্গে মাহুঘকে যে ঐক্যে সংগত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। যুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া কেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। যুরোপের যে-কোনো জাতি হ'ক না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসীমাত্রই

বাহাতে কাছে বেঁধিতে না পারে সেজন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মতো ফাঁস করিয়া কণা মেলিয়া উঠিতেছে।

মুদ্রোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস রখনই শুরু হইল সেই মুহূর্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্থের সঙ্গে অনার্থের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আর্থসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্থ উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দ্বিবার উপলক্ষ্যে যেদিন শুভক চণ্ডালব্রাহ্মণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্দ্যার অনার্থগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজ্যকে নিমূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে বান্ধ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ-দেশে মানুষের যে-সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে-উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমন ভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বাধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলই চেষ্টা করিতে হইয়াছে, বাহারা বিচ্ছিন্ন কী উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগিতারূপে থাকিতে পারে; বাহারা বিরুদ্ধ কী উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; বাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে;—অর্থাৎ কী করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মাস্ত করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্তের সমস্তাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মানুষের পক্ষে এতবড়ো অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে স্পর্শিষ্ট গণ্ডিবারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া বাওয়া; পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি বাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধ্য দিতে থাকে। তাহা

আশাত্তকেও বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে ঠেঁকাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয়মূর্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মাহুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক-একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অল্প কোনো দেশেই এমন সত্যাকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অল্প কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন তুপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম অন্তসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইটকাঠ চুনসুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এইজন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অন্তর্ভূতির দ্বারা আত্মোপাস্ত আবিষ্ট, প্রাণময় রসরক্তময় স্বাধুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের গুচ্ছ কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অন্তর্ভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি সেধধারণ করিয়াছে।

আমরা যে-সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্তা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকদল এক জায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে,—ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সমুদ্রে বেদিন এই নাড়ি ছেদনের

প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্তা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল খনিচ একই আভিভূক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্তার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটতে পারে;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে-আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে, তাহা কেবল আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। কল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়—যে-কোনো পদার্থে সজীব সর্বাঙ্গীণতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই;—তাহাকে কোন জিনিস দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড়ো হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, একমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালোও হয় তবে তাহা বিপুল আপিস-আদালত এবং নিত্যকর্মই আইনকানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসঙ্গেও মানুষ কেন যে কেবলই ক্লেশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কত কিছুরেই বুঝিতে চান না, কেবলই রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভালো করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য, ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল

আছে সে-কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়ানরা বিলাসবিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার ছুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্মাবসানে বিলাতি অবকাশের আরামের আরোজন এ-সমস্ত আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পুরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অস্ত্রকরণ নির্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ওই দেখো এই হতভাগাগুলো খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে-সব কেরানি পনেরো-কুড়ি টাকায় ভূতের শাটুনি খাটিয়া মরিতেছে মোটা মাহিনার বড়ো সাহেব ইলেকট্রিক পাখার নিচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে, কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শাস্ত সৃষ্টির রাখিতে চায় নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যন্ত্রের বিকলিতি ঘটে। এ-কথা যখন নিশ্চিত যে অল্পে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কী শায় পরে কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার করুনোই করিতে পারে না। বিশেষত এক-আধজন লোক তো নয়—কেবল তো একটি রাজ্য নয় একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্মল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজ্যের হালে বাচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জগৎ আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপরজাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, একপক্ষে বড়ো বড়ো বেতন, মোটা পেনশন এবং লম্বা চাল, অল্পপক্ষে নিত্যন্ত ক্রেশে আধপেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ।—অবস্থায় এই অসংগতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাম্ব্য এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য; এমন স্থলে যত দিন বাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহারও বৃত্তিতে বাকি নাই।

ইহাতে একদিকে যেমনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর-একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য বাক্য সত্ত্বেও তথাপি আমাদের বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্তা বর্তমান ছিল—অর্থাৎ যে-সমস্তাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্তাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরবারের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্তার কোনো মীমাংসাই হয় না ;—তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে বাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে।

এ-কথা বলাই বাহুল্য, যে-দেশে একটি মহাজাতি বাধিয়া ওঠে নাই সে-দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার “স্ব” জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাতি যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই কল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিসটা কাহার?

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাধিয়া তুলিতেই পারিব না পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে-সকল বড়ো বড়ো কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। এ-কথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্তার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনোদিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না; বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মতো পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বাস্তবে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাঙ্গিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ

করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে, কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও যে একটিমাত্র বাহুবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া, কিছুকাল মারামারি-কাটাকাটির পর তাহার একটা-কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদেরকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের স্বযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে-সকল প্রবল জাতি সময়ে অসময়ে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড, অভিনয়ের দর্শকদের মতো, দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে, লুকের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে-দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে-দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন কি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অণুরের সহিত শ্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ-রাজত্ব কাঁ করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কাঁ করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই অতিকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাকারও আমাদেরকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি, “না আমরা চাই না” তবু আমাদেরকে চাহিতেই হইবে কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বান্ধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-রাজত্বের যে-প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন-ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত স্কন্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রধারণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি দরের মধ্যে এমন একটা গোল বাদিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ-কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিন্ধত হইয়া আমরা যে-কাজ করিতেই বাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদেরিগকে কখনোই বিন্ধত হইবে না। এ-কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই ঠাড়া করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে—দেশের যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্বার আমাদেরিগকে আঘাত সহিতে হইবে;—যাহা প্ররুষ্ট ধেমল করিয়াই হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে;—কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, স্মরণ্য ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি মহিলে মাতৃষের প্রাণ বাচে না। কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের ষাণ্ঠাভাব ঘটতেছে বলিয়া ইংরেজ-রাজত্ব সকলপ্রকার সুশাসনসম্বন্ধে আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে ষাণ্ঠাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই ইংরেজ-শাসন হইতেই ঘটত তাহা হইলে কোনোপ্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কাঁধ সমাধা হইয়া বাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে

আমরা পরস্পরকে সেই ধাক্কা হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা স্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মজলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কাব্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে-পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রস্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম, আচারব্যবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বড়ো বড়ো রাজপথ এক-একটা ছোটো ছোটো ঝুঁকিলের সম্মুখে আসিয়া পড়িত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আশ্রম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেকদিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এককাল “ঘর হইতে আড়িনা বিদেশ” করিয়া বসিয়া আছি;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই স্তৈরাঙ্গীকৃত, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদেরকে যে একান্তই ঘৃণাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংকুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্বল চিন্তা শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা অড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া

নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বীধ বিপুল মহাজ্ঞানের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদেরকে পরম্পরের সঙ্গে পরম্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্তার মীমাংসা হইবে। সে-সমস্তা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একত্র করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্বত্র ঐশ্বর্যের উদার উপলব্ধি ঘারা; মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের ঘারা; উচ্চনীচ আত্মীয়পন্থ সঙ্কলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভচেষ্টার ঘারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি নিষেধ করে তাহাদের বিধেয়কে পরাস্ত করো। কষ্ট দ্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো—কোনো নৈরাশ্রে কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুরতীর কিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুশরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ একথা আমরা স্বীকার করিব না কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বেগোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ভুক্তিকাকতের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভ্রাতৃত্ব বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত স্বাভীদেব সহায়তার জন্য আমরা বহুপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুত্রবন্দের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবার আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তার আমরা উচ্চনীচের বিচার বিন্ধিত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি, এবার আমাদের উপরে যে-আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদেরকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের চান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদেরকে বাইতে হইবে;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদেরকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদেরকে

আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্নততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্বপশ্চিম স্খিভ্রতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারাবর্ষণ হইয়া ভূমিতের পায়ে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্রুধিতের ক্ষেত্রে অগ্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঞ্চলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সকলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা সেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্ত? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্ত, মাটি চমিবার জন্ত, বীজ বুনিবার জন্ত, তাহার পরে সোনার কসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত।

ସମୂହ

সমূহ

দেশনারক

সৈন্তসল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গারে ঢিলা ছুঁড়িয়া মারে তবে তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না—কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা বর্ণাধিকারে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্য ছোটোবড়ো বহুতর বিক্ষোভ আমাদের স্পর্শই করিতে পারে না—তবে ক্ষণে ক্ষণে এক-একটা রাগরাগিরি ছুতা লইয়া ছুটোছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে-সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে বাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবাসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্র ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মতো এমন কঠোর সত্য, এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কী আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাকে ঈর্ষা দিবার জো কী, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শত্রু করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্মুখে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মহত্ত্বের বর্ণার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণকঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশাত্মরূপ যদি উজ্জল রেখাপাত করিয়া না থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাটি সোনা নহে। বাহা খাটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংরেজজাত যে এ-সম্মুখে জহরি, তাহাকে ঈর্ষা দিবেন কী

করিয়া ? আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্যোগ তাহাদের কাছে প্রকলাভ করিবে কী উপায়ে ? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবি করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কী করিয়াছি ? দেশের দাক্ষণ দুখোণের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের স্মৃতির সঞ্চল আছে, তাহারা স্মৃতেই আছি ; যাহাদের অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই ; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে ; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আত্মনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কী ? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবার চর্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর, হয় বিধাতা নয় গবর্মেণ্ট করিবেন, এই ধারণাকেই আমরা সব-উপায়ে প্রস্তর দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কাষে ব্রতী হইতে পারি, এ-কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশাত্মবোধ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না—সেইজন্যই ঠান্ডার পাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারও সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়িবৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি-কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়িতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে যে-গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে কথার বাধুনি কাঁড়নির পালা,
চোপে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের পালা
ব'হে ব'হে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি এ কী লাজ,
জগতের মাঝে ভিগারির সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।

পরের পারে ধরে মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে পরের পিছু-পিছু
কাদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণে আগে করো দান।

সেদিন হইতে কুড়িবৎসরের পরবর্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহে বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের বাংলা নামাইয়া তো হাত খোলসা করিয়াছি, আজ তো আমরা নিজের কাল নিজে করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি তো ভালোই, কিন্তু পরের 'পরে' অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবি রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মতো বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদেরকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথার-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছলছল করিয়া আসে কেন। আমরা কেন মনে করি, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ স্তম্ভ করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে স্তম্ভস্তর, এ-কথা জগতের ইতিহাসে সর্বত্র প্রসিদ্ধ—

ক্লেশস্ত ধারা নিশিতা হরতয়া।
হর্গং পথস্তং কবরো বহন্তি।

কেবল কি আমরাই—এই হরতায় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া সমান করিয়া না দেয়—তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব, এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পবিব, নিজের বিজ্ঞালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব। এ-সমস্ত কি অভিমানের কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্বনাশের সম্মুখে ঠাড়াইয়া কাহারও কি অভিমান মনে আসে—মৃত্যুশয্যার শিররে বসিয়া কাহারও কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে শুরু করিয়াছি। আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,—আমরা সত্যই মরিতেছি। বাহাকে বলে বিনাশ, বাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং বাহার মরিতেছে না তাহার জীবন্ত হইয়া পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্রেগ একরাত্রির অতিবির মতো আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর ব্যয়, আজও তাহার নররক্তপিপাসায়

নিবৃত্তি হইল না। যে-বাষ একবার মহুগুমাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে সে-প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, তুর্ভিক্ষ ভেমনি করিয়া বায়ংবার কিরিয়া কিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে যত্নের এই যে অবিক্ষিত আলোকক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি?

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বহুমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এমনি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও যে দেশব্যাপী যত্নের আক্রমণ হইতে বিনা-চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন তো কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ-সবল, তাহারাও গ্রাণরক্ষার অল্প প্রতিরোধ লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে যত্নের পুনঃপুন নথরাঘাতসম্বন্ধেও বিনাপ্রয়াসে ঝুটিয়া থাকিব?

এ-কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্রেম-তুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্য-মাত্র, তাহারা বাহুলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাতে বাটে গ্রামে পল্লীতে আমরা একভাবে ঝুটিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে-ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনও আমরা সম্পূর্ণ আপস করিয়া লইতে পারি নাই—এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদের মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে-সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এমনি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা-দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অল্পপূর্ণ সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্ধভুক্ত রাখিয়া টাঁকার লোভে পরের ছেলেকে স্তম্ভ দিতে বাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থার পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের অল্প কাহারও অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত আগ্রহ ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত

হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অসুস্থভাবে হীনবল এবং পানীয় জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকতন, তখন বাঁচিবার উপায় কী? এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশে অধিকার করিয়াছে—কোথাও পে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীবোলে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা বাহা বাইরা এতদিন মাহুয হইয়াছিলাম, তাহা যথেষ্টপরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব-অভ্যাসবশত সরিষার তেল বলিয়া নিজে কৈ সাধনা দিই—তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট সেখানে মাছের প্রাচুর্য নাই, সে-কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিংকোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্ত দেশের জীবনীশক্তির মূলসঙ্কয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া বাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনও শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে-মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিতা হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া প্লেগ ওলাউতা দুইজক একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনা শোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে আমাদের ঘরবাড়িতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এমনি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভার দুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি তো করো, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিশের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সামনে যখন খ্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্যসম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্ত বিরাট সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সাধনালাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি। আমরা যে মরিতেছি। আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। বাহা পারি, তাহাই করিবার জন্ত এখনই আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে-ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলহ।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে বে-তুর্গতি ঘটয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনোই সত্য নহে এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব, ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানান্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—“কী করিব, কেমন করিয়া করিব?” আজ আমরা কৰ্ম করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা বাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা বাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি বাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদেরকে সেইদিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইন্টীম উচ্চতরে বাঁশি বাজাইবার জন্ত হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্তই হইয়াছে। বাঁশি বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে-উত্তম উত্তম হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেঁটনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উৎসাহের আকর্ষণে ভুল্কা কাজকে বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উত্তমকে বিক্ষেপের বার্ষতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। দেশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দেশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু ধুক করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কণা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্বয়ং কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

আজ অহুনয়সহকারে আমার দেশবাসীগণকে সঙ্ঘোদন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পক্ষা ইহা নহে। এ-সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশনটা আজ খুব একটা বড়ো ব্যাপার নহে।

আমরা তাহাকে ছোটো করিয়া কেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোটো করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত-উপলক্ষে আমরা সমস্ত বাঙালি মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেমনি কিরিয়া চাহিলাম, অমনি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া বহুতে স্বদেশের সেবা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে। কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন ও প্রোটেষ্ট, বয়কট ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশনই বৃহৎ হইয়া উঠিত,—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম, পরাকৃত হইতাম। কার্ণাইলের শিক্ষা-সকুল। আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে। আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে তো তাহাকে বড়ো করাই হইত। আজ আমরা নিজের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ওই লইয়া যদি আজ পর্বন্ত কেবলই বিরাট সভার বিরাট বার্ষিকার দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্বন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সাম্প্রদায়িক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্বন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটোকে ক্রমাগতই বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোটো হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদেরকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের প্রায় আর্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়—আমরা তাহাকে নারকপথে বরণ করিব তাহাকে রাজ-অট্টালিকার ভোরণধার হইতে কিরাইরা আনিয়া আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণের পূণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিন-রাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না—তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনসীর কর্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন কবে আমাদের কার সহিত কী ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের কলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না কেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই— তাহা ঈশ্বরবৃত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্ত লইয়া পাহারা দিন, রক্ষা বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অমূল্য কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে-অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে-অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্ত অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল সমস্ত-স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, একরূপ দীনতার দিক্‌কার অনুভব করা কি এতই কঠিন।

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্বন্ধে শূন্য পড়িয়া আমাদের প্রতিমূর্ত্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ করো। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অন্তঃকরণ, কখনো স্ত্রের কখনো অন্ত্রের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে-শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অম্বা আমরা শাস্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্বপ্রধান হইয়া অসংঘত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ-হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

যাহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্ত রাজবাড়ির বাধা-রাতাটাতেই ঘনঘন ঘোঁড়াঘোঁড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে-দলের লোক নই, সে-কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য। আজ পর্যন্ত যাহারা দেশহিত-ব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা রাজপথের শুকবালুকায় অস্ত্র ও ধর্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও আমি।

ইহাও দেখিয়াছি, মন্ত্রবিরল জলে বাহারি ছিপ কেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ওই আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্ত নায়কদিগকে দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। দেশের আকাজ্ঞা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তাহার নিশ্চয় তাহাকে সেইদিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কী, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্তব্য চালনা করা,—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শার জন্ত দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাক্টিভিশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অল্প ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি,—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব-মোচন হইয়াছে। কখনোই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অভূমিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়, তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই স্বার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে কেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মার্গ চবিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুদ্ধিবার জন্ত বহুদিনের বিফলতা গুরুর মতো কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ংগম হইবে, তখন বাহারি পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মার্গে চলিবে—আর বাহারি ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারি বাটেরও নয়, মার্গেরও নয়, তাহারি অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার সকল সম্ভাবনার বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু বীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিষ় অতিক্রম করিবার জন্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল ঐক্যে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেরগুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেকে মতবিশিষ্টতাকে স্বাধীনত্ব সংঘত করিতে হইবে,—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের

এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ভাকাভাকি-হাকাহাকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

১৩১৩

সভাপতির অভিভাষণ

পাৰ্বা শ্রাবণিক সন্মিলনী

অঙ্ককার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে-সম্মান দান করিয়াছেন, আমি তাহার অযোগ্য এ-কথার উল্লেখমাত্রও বাহলা। বস্তুত এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অল্প সময় হইলে এতবড়ো দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সংকটকালে যখন ভাঙায় বাঘ ও জলে কুমির, যখন রাজপুত্র কালপুত্রের মূর্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয়সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অঙ্ককার দিনে সভাপতির আসন স্থলের আসন নহে এবং হয়তো ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দিকেই পুঞ্জীভূত—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মতো কিরিয়া যাঁহাতে পারিলাম না এবং বিশ্ব-জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে “য একঃ” যিনি এক, “অবণঃ” মানব-সমাজের বিবিধ জাতির মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিরাজমান, যিনি “বহধা শক্তিবোগাং বর্ণান্” অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি” বহধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন, “বিচৈতিচাস্তে বিশ্বমাদৌ” বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি, সমস্ত পরিণামেও যিনি, “স দেবঃ, স নো বুধ্যা শুভয়া সংযুনক্তুঃ” সেই দেবতা, তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিরূপে বিद्यমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত কুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিন্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সন্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে স্মৃহং লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন, একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া, অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটিবশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকিতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সকল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সভাপালনের জন্য নির্বাসনে গেলে পর, ভরত যে-ভাবে রাজ্যরক্ষার ভার পাইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্ত্র জ্যেষ্ঠগণের পড়মজোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্যস্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভায় কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কনগ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। বাহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখনও তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়াছে বেদনায় তাহাকে বাধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন, যথার্থ প্রেমের শ্রোত অব্যাহতভাবে চল না। যথার্থ জীবনের শ্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্মের শ্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চকল হইয়া উঠাতেই কর্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে-জীবনধর্মের অভিচাক্ষু্যে কনগ্রেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কনগ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে তুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতার নূতন শাখার সর্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে নীত্রেই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসঙ্কর কনগ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া বাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে-শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে রাষ্ট্রের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘূচিয়া যায় এবং সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে-কাজ করিতে হইবে সে-কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিকৃতাবে স্বীকার করিতেই

হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী বেক্রপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অগ্নির তাহাকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনোমতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে-জিতের দ্বারা তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনায় যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রধান্ত্বলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। লেবার পার্টি, সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া কেলিতেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা স্ফূট হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্ত করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে গম্বন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংঘম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতির লোককে একত্রে লইয়া, শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে, বড়ো বড়ো রাজ্য রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কংগ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপারে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিষ্কৃত আকার ধারণ করিয়া বল লাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আন্দোলন-শক্তিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে-মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঐদার্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল

মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সম্ভব হইবে না এবং সম্ভব হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রান্তিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও, নিয়মের দ্বারা সংঘত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিষ্কা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবজ্ঞাস্ত্রাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরষাত্রী ও কস্তাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মতসংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই যত্নের দ্বায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর হইবে নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ-পর্বন্ত কনগ্রেসের ও কনকারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যতদিন পর্বন্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকিতে, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা আগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধিনির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্বাচনের নহে, কনগ্রেসের ও কনকারেন্সের কার্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক-এক দল যদি এক-একটি সাম্প্রদায়িক কনগ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কনগ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কনগ্রেস সমগ্র দেশের অথও সভা—বিশ্ব ঘটনামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জন দিতে উদ্ভূত হয় তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই কী লাভ হইবে।

এ-পর্বন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি আমাদের জন্য দল বাধিয়া যখনই অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটনামাত্র আমরা মূল দ্বিন্দিতাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে

একোর মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা-অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার আবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কনগ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিভলে বিরোধের আঘাত-মাত্রেই একোর মূল ভিত্তিটা পৰ্ব্বস্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে? যে-সরষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই সরষেকেই ভুতে পাইয়া বসিলে কী উপায়।

বহুবিভাগকে রহিত করিবার জন্ত আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্ত আমাদেরিগকে তাহা অপেক্ষাও আরও বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে দুর্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সাধনা না পায় পরে যে-বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে-বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অস্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষার সঙ্কিত হইতে থাকে।

আমাদের যে-সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না, কারণ এখন আমরা মূক্তির তপস্বী করিতেছি; ইজুদেব আমাদের পরীক্ষার জন্ত এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে-ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে-ক্রোধ দমন করিতেই হইবে—আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারংবার ক্ষমা করিতে হইবে—পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে-সংঘাত ঘটরাছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উদ্ধারকোর বায়ু-বীজ্ঞন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া ভুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া বেশে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জনমূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেশা দেশ, তবে বাহিরের তাড়নার অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জাতীয় উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বির ঘটিতেছে।

এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে

সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না ; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনই পদে পদে দুর্বল হইতে থাকিবে ।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে-ভেদবৃদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব । এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনাই মরিতে বাধ্য । কারণ, এই আশুনে নিরস্ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেণ্টের নাই । এ আশুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্ত ডাক পাড়িতেই হইবে । প্রজার ধরে আশুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে । যদি এ-কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না । কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয় । যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগাতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই । তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মতো । আমাদের পুরাণে কলকভঞ্জনর যে-ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেণ্ট, প্রেসসীর প্রতি প্রেমবশতই হউক অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হউক, অযোগাতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না । অসন্তোষকে চিরবৃদ্ধি করিয়া রাণিবার উপায় প্রশ্রয় । এ সমস্ত শীঘ্রের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয় ।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভালো তাহাও আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে । আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইচ্ছুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই । এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে । এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসুহার অস্ত্রশাল থাকিয়া যাইবে । মুসলমানেরা যদি যথেষ্টপরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসামান্যত জাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা খুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে । যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা বেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি । কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে

সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্ত্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিশাল্য বাতীত লাভ নাই এবং ঐক্য বাতীত সে-লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেতনার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্ত যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন মোহাই সুবুদ্ধির, মোহাই ধর্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিভীর্ণ করিতে না থাকে; তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মতো উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিন্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহুত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্যকারণপরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য স্থান আছে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বল্পপ্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শাস্তি থাকে না, সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ-একথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিচীর্ণ করিয়া অন্ধুরের মতো, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেশা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে।

এই তো আমাদের নূতন দল; এ তো আমাদের আপনাত্মক লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো বগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই শুধে দুঃখে, ক্রিয়াকর্ম ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, একক্সিমিস্ট, বা চরমপন্থী, বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে-দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এ-দেশে সকলের চেয়ে বড়ো এবং মূল একক্সিমিস্ট কে? চরমপন্থীদের ধর্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্ত সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয়

নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনার রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি জুঁক, ধড়লহুত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাহার অক্লান্তের সংবাদমাজেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃপ্তিচকু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল, তিনি তাহার স্বদ্র স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্তথা হইতে পারে না।

এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শাস্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোনো শাস্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে-ডেউ তুলিয়াছিলেন সেই ডেউকে নিরস্ত করিবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে কেবলই দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব তো এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা স্থপিত গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা স্থপিত নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতি-
 যুক্তিক্রিয়া,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিস্পন্স অ্যাকশন। এটাকে রাজসভার যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরও একটা দুই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ধরে চা দেখিলেই উন্নত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিরম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বিদ্রোহের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্বল সাদৃশ্যও প্রবলভাবে সাদা পাওয়া যাইতেছে তবে বড়ো কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অন্তঃপ্রব এদিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেটসন; গুর্খা, পুনিটিভ পুলিশ ও পুলিশরাজকতা; নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, ধমন ও আইনের আত্মবিশ্বাস; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনারূদ্ধি হইতেছে, যে-উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিজুত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট

অনুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে ; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের যায় নাই—এবং জীবনধর্ম যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনও আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে ।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, স্মৃত্যং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না । ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য । তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ, সংবরণ করাই কঠিন ।

এই কারণেই আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাহার। যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই । আজ ভারতশাসনকার্যে পুলিশের সামান্য পাহারাওআলা হইতে স্তায়দণ্ডধারী বিচারক পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংখ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্তব্যধারণের অভিজ্ঞপ্রভ নহে । কিন্তু গবর্ণমেন্ট তো একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য বাহাদিগকে দিয়া চলে তাহার। তো রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতা-মত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অগ্নাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে । যে-সময়ে প্রবীণ সারথির প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনও যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না ; কিন্তু তখন ইহার। মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালে পা কেলে ; তখন পদাভিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না । কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনই এই বিরাট শাসনভ্রমের মধ্যে আবাসিত জীব-প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে । তখন কোন্ পাহারাওআলার বষ্টি যে কোন্ ভালোমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ংকর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বৃষ্টিবার উপায় থাকে না । তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহার।ও বৃদ্ধিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায় । চতুর্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদৃষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্ণমেন্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন ;—তখন লজ্জানিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, বাহার। আর্ন্ত তাহাদিগকে মিথ্যাক বলিয়া অপমানিত করে এবং বাহার। উচ্ছ্বল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জন। করে । কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে ? অথচ

এই সময়স্ত উদ্ধাম উৎপাত সংবরণ করাকেও জটিলীকায় বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্তপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমতো সংবরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্বলতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের অন্ত যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে।

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। একক্সিমিস্ট নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দস্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালির দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অল্পসারে নহে, সময়ের গতি ও কর্তৃত্বাতির মজি অল্পসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া বাহাকে একক্সিমিস্ট দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর-কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিত্তরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে, ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুরোপে একটা ধূয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্মজিনিসটা কেবল স্বার্থপর ধর্মবাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাত্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রতি বাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্মের উল্লেখ সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের ভ্রাতারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন একক্সিমিজম বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ দুষ্টের দল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিত্তরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিস নহে, সেটা তলাইয়া বুকিতে হইবে।

যে-সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মতো আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে আগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষার, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যাসে এবং কনগ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাখ্যায় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অথও ঐক্যের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মতো দেখিতে পাইতেছিলাম না—তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেইজন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের জন্ত যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এই ভাবেই আরও অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালি, আমরা যে এক! বাঙালি কখন যে বাঙালির এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা তো পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাঞ্ছিত তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার ঘারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অস্থগৃহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুগ্ধ হইল তখন যে-ব্যক্তি নিজেকে পশু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়া ছিল ধরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারও চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অস্ত্রকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যত্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্তান্ত সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই দ্বার প্রথমে একটা

সংকীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্তকে জয় করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক ইহাকে বন্ধের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মত্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশী-বর্জনব্যাপারে আমরা এত অবিব্রাহ দুঃখ কখনোই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্রোধ কখনোই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ বতাই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। বতাই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বার বার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা তো কোনোদিন আর মুছবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখ সহ্য করিয়া দলিল হইয়া থাকিবে ;—দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিস পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। কতদিন হইতে জানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে স্থণা করিয়া, চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনোই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হ্যাঁ, কথাটা সত্য বটে। অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড়ো চাকরিপিপাসু বাংলাদেশে এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীরা ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্ত তাঁতির কাছে শিষ্টাবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া ধারে ধারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া সার্থা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না ; উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না ; সত্য বধন ধরের একটি কোণে একটু শিবার মতো দেখা দেন তখনই বরষা অঙ্ককার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্বে দেশের বড়ো প্রয়োজনের সময়েও ধারে ধারে ডিক্কা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা

বার্ঘভাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাচারের প্ররোচনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্তই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব, সে কেবল দুটি-একটি অত্যাচারের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অল্পকৃতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্ত উদ্ভূত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড়ো কারখানা স্থাপন করিব বাঙালির এমন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিক্রটি,—তাহা সত্ত্বেও বাঙালি একটা বড়ো মিল স্থাপিয়াছে, তাহা ভালো করিয়াই চালাইতেছে এবং আরও এইরূপ অনেকগুলি ছোটোবড়ো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সকল করিয়াছে, যেই আপনায় শক্তিকে ছুৎ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্ত সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য।

কিন্তু যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেকে মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম এতবড়ো শক্তিকে ধারণা তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। শীঘ্র নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এইবেলা আশঙ্ক করিয়া যথার্থপণে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত—এই ব্যাকুলতার আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভালো করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালোরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তখন বুঝিতে হইবে সে-রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্ত্ত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে তুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে-আশ্বেপ আমাদিগকে আশ্বকলহে লইয়া বাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত বার্থ উদ্ভবের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি

অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্য ও আত্মশ্রান্তিতে আমরা আত্মীয়স্বজনকেও সহ করিতে পারিতেছি না।

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে, জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া তুলিব যে, কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উদ্বোধনকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন কি, যে-টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কী যে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাহতন্তনের নিরুদ্ধ হৃদয়ের মতো আমাদের পক্ষে একটা বিবম বোম্বনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব কী করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে ঠাচিয়া যাই; তখনও যদি দেশের এই উদ্ভত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা বজ্রক্ষেত্র নির্মিত না হয়, তখনও যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইরে ভাইরে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মভট্ট উত্তম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসংগত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহ বা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাভাব্যই চাহি। অথচ এ-সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে, ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দারিদ্র্যের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেলেক-গবর্নেন্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিশ্চিন্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাৱশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাব দেওয়াও হয় নাই তখন কি কসলভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে ?

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, নিজের মতোই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্ণের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো-মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিষয়সকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিত্তমান,—কর্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংস না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, ক্রি কয় প্রকারের

আছে, সাহস-মুক্তিই ভালো না স্বাভাবিক-মুক্তিই শ্রেয়, শাস্ত্রিকতা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু সাহসাই বল, আর স্বাভাবিকই বল, গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে-সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্বল, আমরা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ও পরতন্ত্র, সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্যসত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ শৃংখের প্রয়োজন—তাহা অমম্বতা। আমরা যদি স্বার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির দ্বারা কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারংবার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্তমান ভারতশাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিস্টোরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো বাংলায় ঘেঁষপ অসংঘদের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত ?

যাহার হাতে বিরাট শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাকলা প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যস্ত করিয়া সাধনা পায় তবে তাহার সেই চিন্তাবিকার আমাদের মতো দুর্বলতর পক্ষকে যেন অস্ত্রকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হউক আর দুর্বলই হউক যে-ব্যক্তি বাক্য ও আচরণে অস্ত্রের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায় এ-কথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনই ভুলি ইহার সত্যতাও তখনই সবগে সঙ্গ্রাম হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম বলিতে কী বুঝায় এবং তাহার স্বার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে-সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে এ-কথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে বাটাইবার জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো প্রেয় পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অঙ্গনা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদেরকে হনন করিতে পারেন কিন্তু মনুষ্যকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রেয় দেন না।

সেইজন্যই দেখিতে পাই গবর্নমেন্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বজ্র হইয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রেয়প্রাপ্ত পুলিশ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্নমেন্টের প্রসাদভোগী পক্ষাঘাত যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড়ো উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্নমেন্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অহুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিবেক জলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রিসভার যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্তই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার অহুগ্রহ কিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না—আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম—দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে, আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্নমেন্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে, নিজের সম্পূর্ণ সাধামত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে। আমরা যা কালীর কাছে মহিব মানত করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে ত্রিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবি করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা ভূমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লও গে। আমরাও কথার বেলায় বড়ো বড়ো করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্ত হিতসাধনের বেলাতেও অন্তের উপরে বরাহ দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাছে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব করিয়া, বা অস্ত্র কারণে, যে-জিনিসটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরেজ-গবর্নমেন্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাক। শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য এ-কথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের জিন্স কোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে।

সেইজন্তই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেই-জন্তই পনেরো বৎসরের একটি ইচ্ছার ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্ত একটু নড়িলে-চড়িলেই পুনিতিভ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে মনে তাহাদের যিক্কার বোধ হয় না; এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যাক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেইজন্তই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালিকেই বাদ দিয়া মর্মে সেটাকে “সেটুল্ড ক্যান্ট” বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই ইংরেজের খাতার হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য তখন ইহার পালটাই দিবার জন্য আমরাও উহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভক্তি করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা তো সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের শুমারনবিস ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে ইহা-কে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমারও কি সেই ভুলটাই করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা তো কাণ্ডের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির বায়ু—অনাবশ্যক বিরোধ অপবায়। দেশের হিতব্রতে ঘাঁহারা কর্মধোগী, অত্যাশঙ্ক কটকক্ষত উহাদিগকে পদে পদে সঙ্ক করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির শুদ্ধতাপ্রকাশ করিবার জন্ত স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাব করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশী-বর্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই দুঃখ তো আমাদের পক্ষে সামান্ত নহে। স্বয়ং যুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্ত শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেঁধেন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন জেলের দারোগা, লিভারপুলের নিমক ধাইয়া থাকে।

অতএব এ-দেশের যে-ধন লইয়া পৃথিবীতে তাহারা ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্ত বাধা দিলেও তাহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে-সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,— তাহাতে আরাম-বিল্বামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার

প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাহারা অনাহত ঐক্যতা ও অনাবশ্যক উৎসাহকে প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ণের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অমূল্য করিব, দেশের বিদ্যালয়কে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—ইহা করিতে গেলে ধরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না, সেজন্য অপরাধিতচিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ দেশের কাজ নহে, তাহা সংসারী দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাধা।

মনে করিবেন না, ভয় বা সংকোচ বশত আমি এ-কথা বলিতেছি। দুঃশ্রমে আমি জানি, দুঃশ্রমে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেইজন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপলা শোভা পায় না। দুঃখ দুর্বলকেই হয় স্পর্ধায় নয় অভিজ্ঞতায় লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেই সর্বত্র ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অন্তর্ভুক্ত করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁধার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্সিয়াল কনকারেশনের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনাদের শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ণের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাঙ্গে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকাণ্ড প্রয়োজনসাধনকর্ম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ণের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পৰীণ করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য

হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্ষে ও আমোদে সকলে একত্র হইবা। স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জ্যোতস্নার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জ্যোত বোধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থার যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্তের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।

অগ্গকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাধ বোধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোটো ছোটো সামর্থ্য ও সম্বলের দ্বারা বাহির হইয়া গিয়া অন্তের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কী কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

যুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিত্যন্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অন্ন জমি ও অন্ন শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক ধনচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লগ্ন তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের খেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জ্যোত করিলে গোপালন ও ঘাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তার ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জ্যোত বোধিয়া নিজের পরীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের বে-দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের

মৰ্মহানে বিসংস্কার হইতে থাকে সে-দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রামপল্লী হইতে দ্রবিত্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিলিষ্ট শ্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অঙ্কমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচর করিতে গিয়া মানুষের অপচর করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অভ্রাব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যবহৃত হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈনিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি বাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়? এবং বাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো উদ্বেগ নাই কেবলমাত্র দুর্বল জাতির দাবি এবং দারিদ্রহীন পরামর্শ সে-সভা দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে?

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশশাসনও সর্বগ্রহণ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালো বই মন্দ হয় না—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যতবড়োই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ধটিয়াছে তাহা নহে তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমতো করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমতো হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা বাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা বন্ধনের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা

সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূৰ্ছ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াকে; যে-সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্মে বাতায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; বাহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুঃস্থকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিশের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নথ নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জম্বল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ কিরিয়া কিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাচিবে এমন সঙ্কল্প নাই; ডাকাত অথবা পুলিশ চুরি অথবা চুরি-তদন্ত জন্ত ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাচাইবে এমন পরস্পর-ঐক্যমূলক সাহস নাই; তাহার পর যা পাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা। ঘি দূষিত, দুধ দুম্বলা, মশা দুর্লভ, তৈল বিধাক্ত; যে-কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের স্বকৃত-প্রীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলি অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়;—ডিথিরিয়া, রাক্ষসজ্বা, টাইফয়েড সকলেই এই ব্রহ্মহীনদের প্রতি এক্সপ্রস্টেশন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী। ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে-শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াকে, যে-মাটি হইতে বাচিবার শাস্ত পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীনকালের নির্দগ্ধ বস্তুর মুখে ভাসিয়া বাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে, এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বাভাবিক লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ—এগুলি কি আকস্মিক ? এগুলি কি আমাদের সাম্প্রতিকের মজাগত দুর্লক্ষ্য নহে ? সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষ্য সমগ্র দেশের স্বয়ংনিহিত হতাশ নিশ্চেতন। কিছুই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণভাবে ললাটে করম্পর্শ করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিঘ্নকৃত হইয়া উঠে। তখন সে মরিয়াম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাজি বুঝি পোহাইল,—রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে ; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন স্তূপে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিন্তায় ভাবায় ভাবে আচারে কর্মে সর্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলই দূরে চলিয়া বাইতেছি, আমাদেরকে আর-একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মজল-সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া বাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবোধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সঙ্কলনকে বিলিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টিকিতে পারিব কেমন করিয়া ?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অভিশয় পরিমাণে কেবল শহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশী-উদ্‌যোগটা তো শহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারো ?

জগদল পাথর বৃকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদল পাথরটা পুনিতিষ্ট পুলিশের বাস্তব মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের

সকলের বুক পড়িতেছে না কেন? বাংলাদেশের এই বন্ধের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন? স্বদেশী-প্রচার যদি অপরাধ হয় তবে পুনিটিড পুলিশের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালির সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাঙলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্ত তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে এ-কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অন্বেষণ করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বৈচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বৃকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়ের অন্ত্র বিমূখ হইয়া অগ্নীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা, পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চপদলাভ করিয়া এ-পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

এ-কথা যেন না মনে করি যে, দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ-সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন তুলিব না। একসময়ে আমি মকস্বেলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধানকালে সংবাদ পাইলাম, পুলিশের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উপাতক্যারীর নামে দেওয়ানি ও কোজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড়ো কৌশলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী? পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটার টকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিরা দেখিলাম দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে ; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু কীর্ণরোগী চিকিৎসার দ্বারাই মারা পড়ে । তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারংবার ভাবিতে হইয়াছে আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান ।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাদিয়া বলিয়াছিল, “ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন ?” তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন “বাপু, অস্ত্রকে দোষ দিব কী, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে ।”

পৃথিবীতে অক্ষয় বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না । ভারতমন্ডলভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিগেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না । সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত । দুর্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্বল হইয়া পড়ে, পুলিশ আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে । এবং ষাঁহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিশের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান ।

এদিকে প্রজার দুর্বলতা সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ । যিনি পুলিশ-কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিশকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিশের বিবদাতে সামান্ত আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন । তাহার কারণ আর-কিছুই নহে, কচি পাঠাটিকে অস্ত্রের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না । দেবা দুর্বলমাতকা :

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অল্পকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহার কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না । ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালান্বিত হইবে । এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিশ, কাংনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মাছুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া ?

অবশেষে বর্তমানকালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে ধারণ করিতেছেন অস্ত্র এই সভ্যমূলে তাঁহার সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন । রক্তবর্ণ প্রত্যাষে তোমরাই সর্বাগ্রে আগিয়া উঠিয়া অনেক লক্ষসংখ্যক এবং অনেক দুঃখ লব্ধ করিলে । তোমাদের সেই

পৌরুষের উদ্‌বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে বাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপमानে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্ত কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাবাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অগ্রসর থাকিবেন না। তোমরা ভগ্নীরথের স্রায় তপস্বী করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গন্ধা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যশ্রোতকে ইজের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে-দুরাশা করিয়া না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো। এ-কর্মে খ্যাতির আশা করিয়া না এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কুতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিষ্ঠুর তপস্বী—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলাদেশের প্রভিন্সিয়াল কনকারেন্স যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন কলবান ও ছাত্রপ্রদ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ

হইতে নানাধর্মবোধে জীবনসঞ্চারের বলে কনগ্রেস দেশের পশ্চিমস্থান হুপিওস্থল পর্য্যপ্যর্ষ হইয়া ভারতবর্ষের বন্ধের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্যই যে-লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে-কয়টি এই—

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদের বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাধা, বাহুবলতা, অর্গ্যানিজেশন। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও বাহুর নিকট কেবলমাত্র সমূহ আত্ম কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিলিষ্টতা, যে হুত্বালক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সমস্ত ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠিকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয়-কলোবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেতা এক জায়গায় পুট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটতে জাতিয় ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনাই সর্বত্র অব্যাহত সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে, এ-সমক্ষে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ওই সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—নৈরাশ্রের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদের চক্ষুকে ও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বলিয়াছে।

ভাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব;—যে-সমস্ত মহাপুরুষ ঐতিহ্যকালের কঠোরতম সাধনার

দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ৰ সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব, তাহা হইলেই অল্প ঘে-মহাসভায় সমগ্র বাংলা-দেশের আকাজ্জা আপন সকলতার জন্ত দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? মহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিজস্ব হইয়া চলিয়া যাইব—কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্কবিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে-স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ-সমস্তই আমাদের, এ-সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিছাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম শ্রদ্ধার দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জ্ঞীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত বীর্ষে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।

১৩১৪

মদ্রপার

বরিশালের কোনো এক স্থান হইতে বিশ্বস্তস্বত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ পাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেক স্থলে নমশুদ্ধদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগ প্রকাশ করা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কী? সে-কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাগিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অপূর্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বন্ধকে ব্যক্ত অর্থাৎ বিকলাক করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান-অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ব-বশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দুমুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

মাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ের পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে-ভেদটা আছে রাজ্য যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান, এবং দুইপক্ষকে বধাসম্ভব রক্তস্রব করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারকারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহার্দ্য নাই সে-কথা বেহারবাসী বাঙালিমাত্রেরই জানেন। শিক্ষিত উড়িষ্যাগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে-দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার স্রমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে

বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে-অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে-অংশটি খুব বড়ো নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শান্ত উর্বর, যেন ধান্তে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে; মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ বাহাদের প্রাণের সার শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান-সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন পণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর-একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হ'ক বয়কটকে জয় করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমানায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে-পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই আগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুরিধা-অসুরিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর-কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মকল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুরিধাকে মলন করিবার আরোজন করিয়াছিলাম সে-কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যাশ্রিতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের

এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোঁরাইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু ক্ষতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অশুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ-কথা সত্য নহে। এমন কি, বাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজন্য সহসা একদিন ইহাদের গুপ্তপ্রায় ধরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে-উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সধ করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে কেলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কী ব্যাপার; হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনও একমুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহ্বান নাই এবং রাতে নিদ্রার অবকাশ বাড়িতেছে না। আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরেজকে জয় করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে বোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।

কখনো বাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, ইহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, ইহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্য করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না ! উলটা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নিচের লোকদের সঙ্ঘে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে ;—আমরা যখন নিচে আছি তখন উপরওআলার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বাব অত্যন্ত জাগরুক আমাদের ব্যবহারে এগুনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসাবশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় “ভাই” শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিস্তৃত কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্তের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া “মা” শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণ-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত

অঙ্কতার ভান, নয় আমাদের শরূপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিশ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্বক্ষে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাস্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্ররোজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই বাগ করি।

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে-পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরেজি-পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্ত আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের হুঁচকাই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মাহুয়ের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে ক্ষতবলে পদানত করিবার জন্ত চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবানাপিত বস্ত্র করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঁঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়;—কাজ ফাঁকি দিবার জন্ত পথ বাঁচাইবার জন্ত আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মাহুয়ের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে-পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জ্বরদন্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোনো একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটস দিয়া কোথাও কোথাও আশুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং ধরিদদারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস ধরিদ করিতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ধরে আশুন লাগানো এবং মাছুষ মারাতে গিয়া পৌছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অজ্ঞায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইহাদের নিবট জ্ঞানধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্ত যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সে-কথা বিমূখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আশুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একমূল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্ত বিত্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে-সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ত্রুট লইয়াছেন তাহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? “যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদের মতো করে নাই, আমাদের মতো যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক দৃঢ় করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অল্প যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জ্বরদন্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সঙ্ক করিব না” দেশের নিরশ্রয়ী মুসলমান এবং নমশূত্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতিবীকার করিয়াও বিলাতি সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে আত্মপ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিবৃত্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ-সকল প্রণালী দাসদ্বয়েরই প্রণালী। বাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া বাহাদিগকে দমন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মল্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো-প্রকার আপসে অধিকারপ্রাপ্তির মূল্য বোঝে না, তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা তো প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে, আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিক্রমকে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্তকে জোরের দ্বারা অভিতৃত করিয়া চালনা করিব এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্তের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে ধর্য করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতাহুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঐক্যতা দ্বারা আমরা নিজের এবং অস্ত্র পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ধরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী ছন্ন শাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নষ্ট করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে বধ্যার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবার অস্ত্র টানটানি-মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অস্থবর্তী অধীন করিবার অস্ত্র বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গলসাধনের অস্ত্র উৎসর্গ করিয়াছি তখনই সে বুঝিবে, আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনই সে বুঝিবে, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটোবড়ো

সকলেই ধাঁহা সন্ধান। তখন মুসলমানই কি আর নমশুত্রই কি, বেহারি উড়িয়া অথবা অন্ত যে-কোনো ইংরেজশিক্ষায় পশ্চান্বর্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনই সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অহুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইচ্ছার অভাবে কখনোই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্যপদার্থ মানুষ—সেই সত্যপদার্থ মানুষের হৃদয় বৃদ্ধি, মানুষের মনুজ্ঞান, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রতাহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উলটা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অস্ত্রাঘের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কাৰ্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অস্ত্রাঘকেও স্ত্রাঘের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্নতও যদি দেশের উন্নতি-সাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। হুবুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। ছঃস্পন্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাক দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্ত কারণে চন্দ্রনগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাত্রের পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উল্লেখ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত ভুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্ততা মাফুদ্বির

জংপিণ্ডকেই বিধীর্ণ করিয়া দেয়।' এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুত্বযুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অল্প নারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা ; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উপায়ে সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মহত্ত্বধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহংকার করে ; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে ? সে কেবল আমাদের ষড়ার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্তই একবার প্রদ্রব দিলে শরতানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে স্বজনের কাজে পালনের কাজেই ষড়ার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে ; কোনো একটা দিকে আমরা মজলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ স্বজনের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ দুর্গম—দুর্গম পথন্তঃ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাণ্ডের সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে ; ইহার পারিতোষিক অহংকারভূষিতে নহে, অহংকারবিসর্জনে ; ইহার সকলতা অন্তকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

১৩১৫

১ কাকিনাডার কারখানার ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেলপাড়িতে থোকা ছুড়িবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো দ্বিহ্নে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ত্রমশই হানুবৎক তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায় এই লক্ষ্যের শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট

সার লেপেল গ্রিকিন

কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গান্ধীৰ্ব অথবা গৌরব নাই কিন্তু সিংহের জাতে বৈকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার লেপেল গ্রিকিন জুন মাসের কটনাইটলি রিভিযু পত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারি একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করায় কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনই হউক বাঙালিদের তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোনো ফল না হউক আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে-সময় একটুবানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি থেকাইয়া আসে তাহাতে চট করিয়া আমাদের তজ্রা ভাঙিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কনগ্রেসের মাথাটা তাহার স্বস্তের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানাকারণে তাহার স্বাস্থ্য এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই-একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজ দেখে। এজন্ত গ্রিকিন সাহেব ধন্ত।

তিনি আরও ধন্ত যে, তিনি কোনো যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপকতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরেজের চক্ষু সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্বল ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিকিন যখন কেবল গালিমন্দ্য দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি-জিনিসটাও যে নিতান্ত সামান্ত তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিকিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও বা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা স্নানিগুণ গালি দিতে পারে। গ্রিকিন যে-জন্তটার উল্লেখ করিয়াছেন সে-বেচারার কিচিমিচিপূর্বক মূখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এত প্রকার ভদ্রোচিত অন্য আছে যে, অশিষ্ট মূখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই

অনাবশ্যক। গ্রিকিন যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কোঁতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অমুকরণে ক্লান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিকিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙালি দুর্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙালির কোনো স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙালি জিলা শাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙালি মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি তাহাদের কোনো অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব গড়া যায়, কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাধিয়াছিলাম যে, ইংরেজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্ম-মর্দাদা থাকে; কারণ যে-লোক সৌভাগ্যবান এবং ক্ষমতাবান তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মতো যাহারা দুর্ভাগ্য, যাহাদের মুণ ছাড়া আর কিছু নাই সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিকিনের লেখা ইংরেজি বড়ো কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তমটিকে বিসর্জন দিতে হয়।

গ্রিকিন বাঙালিকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্বে নিজেদের পার্লামেন্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বহুতাম্বে বাগ্ম্যকে পার্লামেন্টের মেম্বর নির্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরেজ মন্ত্রী-সভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা কটনাইটলি রিভিউতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

ইংরেজের আতঙ্ক

* ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না ;—তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের মধ্যে পুলিশ তাহাদের সহিত লাগিল—আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের কোজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার উপলক্ষে হাট্টার সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহুসংখ্যক ভিন্নজাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরূপ অবস্থায় সামান্ত হুঁতুপাতেই বিপদের আশঙ্কাটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তখন পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না—অতিসত্বর সবলে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া কেলিবার প্রকৃতি জন্মে। যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এইরূপ কোনো কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনই গবর্মেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। হাট্টার বলেন, এরূপ উত্তেজনার সময় ভারত-গবর্মেণ্টকে প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপগ্রবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমতো সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজরাজ হতভাগা বস্তুদিগের ছুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আগুয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমতো আইনের সংশোধন, পুলিশের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উদ্মা তখনও নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্ধর শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা মাথা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে তো তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যালকাটা রিভিযুগনের কোনো ইংরেজ লেখক এই শাস্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তলিপাস্থ বর্ষর প্রকৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহাতে, কেবল

দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসিবর্গকে একেবারে সর্বসমেত সমুদ্রপারে ঝাঁপান্তরিত করিয়া দিবার জন্ত গবর্নেন্টকে অনুরোধ করিলেন।

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না। আমাদের সংস্কৃত-শাস্ত্রে আছে—শত্রুস্ত ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যাক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব আশঙ্কা হয়, সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না, নিষ্ঠুরভাবে অন্তকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু যে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।

ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদের দিকে তখনই সেটা আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনই ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

ইংরেজ হঠাৎ কংগ্রেসের মূর্তি দেখিয়া প্রথমটা আচমকা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশত স্বদেশী জুড়ুকে ষতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুশ্রবণনাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরেজের সুস্থ প্রীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কংগ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে যা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কংগ্রেসের আর-কোনো ক্ষমতা থাক্ বা না থাক্ গলার জোর আছে, তাহার লক্ষ সমুদ্রপার পর্যন্ত গিয়া পৌছে।

সুতরাং এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কংগ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমূখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকদের নিকট সে-কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ-কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্স তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতিবিকৃত নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কংগ্রেস হইতে আত্ম আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

হিন্দুজাতির প্রতি পলিটিক্সের প্রভাব যে তেমন প্রবল নহে কংগ্রেসই তাহার

প্রমাণস্থল হইবার উপক্রম করিতেছে। যতই দিন বাইতেছে ততই কংগ্রেস অর্থাভাবে দরিদ্র এবং উৎসাহাতাবে দুর্বলের মতো প্রতিভাত হইতেছে। ইংরেজও সম্প্রতি কিছু বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে।

• কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর-একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। বাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরেজের ধারণা হইল না।

কারণ, ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছে যে, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্ত যে-হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি রক্ষার জন্ত চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা, স্বদেশ, আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোত্রকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য এ-কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের স্তূর্বা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।

এই কারণে গোরক্ষণী সভাটা ইংরেজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। কলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে।

প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমণোপলক্ষে পশ্চিম ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্ত লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে—এখন গোরক্ষকগণ রক্ষা পাইলে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে বটে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না। যে-সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে-সকল কথা যদি প্রকাশ হইত তবে কী হইত? যে প্রকাশ করিত তাহাকে সম্ভবত নির্দিষ্ট রাজ-অটালিকার রাজপ্রহরিগণ কতৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত। গোত্রও সময়ে সময়ে সঙ্কল্প হাহারব করে, বাঙালিও সময় সময় দেশী-বিদেশী ভাষার আত্ননাশ করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিম-ভারত একেবারে মুক।

তবে বাহির হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। গাজিপুরের জজ কল্ল সাহেব স্ফায়পরাণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যাসম্বন্ধীয় মকদ্দমার আপীল হাইকোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

কল্ল সাহেব হিন্দু নহেন; গোজাতির এবং গোবৎসলজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত থাকিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। পোস্ত্রাদারের প্রতি যদি তাঁহার কোনো পক্ষপাত থাকে সেও কেবল খাদকভাবে।

দ্বিতীয়ত, এই গোহত্যাসম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতি গবর্নেন্টের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে,

এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণও বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এমন কি, বিল্ডারের স্পেক্টেটর পত্রও এইরূপ উপদ্রবগুলিকে সতেজে দমন, সবলে দলন করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। একরূপ স্থলে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার অপেক্ষা একরূপ মকদ্দমা ইংরেজ বিচারক বিশেষ সতর্কভাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

এমন অবস্থাতেও যদি গবর্মেণ্ট ফল সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হন, তবে তো তাঁহার হাতে সামান্য শাসনা-চুরির মকদ্দমাও রাখা উচিত হয় না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই মনে হইতেছে গবর্মেণ্ট কিছু বেশি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ভয় পাইলেই আমাদের সর্বনাশ।

কিন্তু ভয় করিতে আরম্ভ করিলে কোথাও নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই। ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়াও ভয় হয়, আবার মূর্খ করিয়া রাখিলেও ভয় আছে।

ইংরেজি শিখিয়া আমরা আবহুঃখ নিবেদন করিতে শিখি এবং সাধারণ অভাব-মোচনের উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্রপাত হয়। আবার যেখানে ইংরেজি শিক্ষা নাই সেখানে যে কোন অজ্ঞসংস্কারের কুম্ভবর্ণ বারুদে কোন্থান হইতে কণামাত্র অগ্নিশূলিক লাগিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগদাহ উপস্থিত করে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু গবর্মেণ্টের ভয়টা দেখিতে ভালো নহে। কড়া শাসন, অর্থাৎ যখন বিচার-প্রণালীর মধ্যে ত্রায় অপেক্ষা বলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় এবং যখন চতুর্দিক হইতে খোঁচাখুঁচি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি দেশের লোককে ভয় পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাই তখনই বুঝিতে পারি গবর্মেণ্টের হৃৎস্পন্দন কিছু অযথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেক্ষেপে উপগ্রত্য গবর্মেণ্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না, কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

মণিপুরেই গবর্মেণ্টের নিজবুদ্ধিদোষে বিভ্রাট ঘটুক আর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-মুসলমানের অজ্ঞ আক্রোশবশত ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হউক, গবর্মেণ্টের সর্বদা মনে রাখা উচিত, শত্রুস্ত ভূষণঃ ক্ষমা এবং অবিচলিত অপক্ষপাত এবং প্রশান্ত হ্রায়পরতা।

কিন্তু গবর্মেণ্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিন্দু-মুসলমান-বিপ্লবে বড়োকার্তা ল্যান্ডাউন, মেজোকার্তা ক্রসথোয়েট, এবং জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটোকার্তাগুলি সকলেই এক পলিসি অবলম্বন করিয়া একভাবে কাজ করিতেছেন কিনা জানি না। সার ওয়েডারবর্ন লিখিয়াছেন, এই সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেণ্টের কিছু হাত আছে—ল্যান্ডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।

আমরা বলি, গবর্মেণ্টের পলিসি যেমনই থাকুক, ইংরেজ কর্মচারিগণ গবর্মেণ্টের যত

নহে; তাহারা মাহুষ। আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের বিরাগ-অম্মরাগ মতামত খাটাইবার যথেষ্ট অবসর আছে। কনগ্রেস এবং শিক্ষিত বাবুদের আচরণে তাহাদের যদি এমন ধারণা হয় যে, হিন্দু-মুসলমানদিগকে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক, তবে তাহারা 'ছোটোমুড়ো' এত উপায় অবলম্বন করিয়া বিবেচবীজ বপন করিতে পারে যে, গবর্ণমেন্টের পরম উদার সদভিসন্ধি তাহার নিকট হার মানেন।

গবর্ণমেন্টের আইন কাহাকেও ঘৃণা করে না, ভয় করে না, পক্ষপাত করে না, কিন্তু ইংরেজ করে। পারোনিয়র ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরেজি কাগজগুলি যখন কনগ্রেসের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে এবং বাবুদের প্রতি সরোষ অবজ্ঞাবর্ষণের চেষ্টা করে, তখন ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে অবিচলিতচিত্তে থাকে তাহা নহে। এই সমস্ত বিদ্বেষভাব সর্বসাধারণ ইংরেজের মধ্যে প্রতিদিন ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে যে নানা উপায়ে কার্যত সেই ভাবকে প্রকাশ করে এবং একটা গোপন পলিসি অবলম্বন করিয়া কনগ্রেস প্রভৃতিকে বার্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্ণমেন্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু গবর্ণমেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন কেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাখিটাও অপরিপূর্ণ পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল, ইংরেজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপার-গুলি ঘটিতেছে।

রাজা ও প্রজা

সিভিলিয়ান রাডীচি সাহেব আইনলঙ্ঘনপূর্বক উড়িষ্যার কোনো এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গবর্নর ম্যাকডোনেল সাহেব অস্ত্রায়কারীকে এক বৎসরের জন্ত নিগৃহীত করিয়াছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে এরূপ ঘটনা আশাতীত বিশ্বয়জনক বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সাধারণের নিকট এই জ্ঞায়বিচারটি আশাতীত বিশ্বয়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই কারণে মূঢ়মতি সাধারণ কিছু সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনতিকাল পরেই ম্যাকডোনেল সাহেব যখন যথাসময়ে এলিয়ট সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট আসিয়া ম্যাকডোনেলের বিচার লঙ্ঘনপূর্বক রাডীচিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন আবার মূঢ়মতি সাধারণ সবিশেষ শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্তার ইচ্ছা কর্ম। কর্তাই জানেন এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন, আমরা কেবল অন্ধকারে অহুমান করিয়া মরিতেছি মাত্র। এমন হইতে পারে যে, সিভিলিয়ানের প্রেস্টিজ সিভিলিয়ান রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক হইল না। কারণ, এই ঘটনায় সাধারণের নিকট ম্যাকডোনেলের, এমন কি, গবর্নমেন্টের প্রেস্টিজ, নষ্ট হইল।

অহুমান করিতে গিয়া নানা লোক নানা কথা বলিতেছে—তাঁহার সব কথাই মিথ্যা হইতে পারে। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, গবর্নমেন্টের পলিসি গবর্নমেন্টই জানেন, আমরা সেই পলিসির দ্বারা পরিচালিত অন্ধ পুস্তলিকামাত্র।

সেই কারণে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির জ্ঞায়জ্ঞায়-বিচারে আমরা যে অকস্মাৎ অতিমাত্র হর্ষশোক প্রকাশ করিয়া থাকি সে আমাদের মোহবশত। যেখানে কর্তার ইচ্ছা কর্ম, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব এবং মর্জির উপরে আমাদের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করিতেছে সেখানে ভালো এবং মন্দ, জ্ঞায় এবং অজ্ঞায় উভয়ই আকস্মিক ক্ষণিক ঘটনামাত্র। ম্যাকডোনেল সাহেব বাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, এলিয়ট সাহেব বাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, আমরা নিতান্তই উপলক্ষ্য।

তথাপি আঘাতে ব্যথিত এবং আদরে স্তম্ভী না হইয়া আমরা থাকিতে পারি না।

কিন্তু কিরূপ হইলে আমাদের যথার্থ সুখের এবং জাতীয় গৌরবের কারণ হয় তাহা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

সে আর কিছুই নহে,—যখন আমাদের সাধারণের মধ্যে স্ত্রাস্ত্রাস্ত্রবোধ এমন সুতীব্র এবং সচেতন হইয়া উঠিবে যে, অপমানে অন্তরে আমরা সকলে মিলিয়া যথার্থ বেদনা বোধ করিতে থাকিব এবং সেই স্ত্রাস্ত্রাস্ত্রবোধের খাতির রক্ষা করা গবর্নমেন্টের একটা পলিসির মধ্যে ধাঁড়াইয়া ধাইবে তখন আমরা যথার্থ আনন্দ করিতে পারিব।

সাধারণত, ধর্মবুদ্ধি কর্মবুদ্ধি লোকনিন্দা সব-কটার মিলিয়া আমাদেরকে কর্তব্যপথে চালনা করে। আমাদের গবর্নমেন্টের কর্তব্যনীতি অনেকটা পরিমাণে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেছে, প্রজাদিগের স্ত্রাস্ত্রাস্ত্রবোধের সহিত তাহার যোগ অতিশয় অল্প।

সকলেই জানেন ধর্মবুদ্ধির সহিত কর্মবুদ্ধির বিরোধ বাধিলে অনেক সময় শেষোক্ত শক্তিটিরই জয় হইয়া থাকে, সেই ক্ষম্বের সময় বাহিরের লোকের স্ত্রাস্ত্রাস্ত্রবোধ ধর্মের সহায় হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে। যখন দেবির প্রজার নিন্দা নামক শক্তি গবর্নমেন্টের রাজকার্যের মধ্যে আপনাতঃ যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে তখন আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।

এই প্রজানিন্দা না থাকাতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজের কর্তব্যবুদ্ধি ক্রমে অলক্ষিতভাবে এত শিথিল ও বিকৃত হইয়া আসে যে, ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের নৈতিক আদর্শ হইতে তাহাদের আদর্শের বিজাতীয় প্রভেদ হইতে থাকে। সেই কারণে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একদিকে আমাদেরকে দ্বন্দ্ব করে অপরদিকে স্বদেশীয় ইংরেজের মতামতের প্রতিও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, যেন উভয়েই তাহার অনাস্বীয়।

ইহার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটি কারণ এই যে, ইংলণ্ডে যে-সমাজনিন্দা ইংরেজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে ভারতবর্ষে তাহা অত্যন্ত দূরবর্তী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ তাহার প্রভাব বিন্ধত হইয়া যায়। ইহার উপরে আবার আমাদের সহিত ইংরেজের অনেকটা স্বার্থের সম্পর্ক, এবং আমাদের প্রতি তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই, সুতরাং এখানে কর্তব্যবুদ্ধির বিপুলতা রক্ষা করা ইংরেজের পক্ষে নানাকারণে কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য স্বার্থের সহিত, ক্ষমতাবর্ধনের সহিত পরাধীন দুর্বল জাতির নৈতিক আদর্শের সহিত, পরজাতি-শাসনতন্ত্রের বিবিধ কুটিলতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয়

ইংরেজের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে, তাহাকে অনেক সময় ইংলণ্ডের ইংরেজ ভালো করিয়া চেনে না।

কোনো কোনো প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এই নূতন পদার্থটিকে ইংলণ্ডে ভালোভাবে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিভাবলে দেখাইতেছেন, এই নূতন পদার্থের নূতনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে রাডইয়ার্ড কিপলিঙের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাবলে তিনি ইংরেজের কল্পনাচক্ষে প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালায় মতো দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের ইংরেজকে বুঝাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নেন্ট একটি সার্কস কম্পানি। তাঁহারা নানাজাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্যজগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন। একবার সতর্ক অনিমেয় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেই সব-কটা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতীক্ষ্ণ কোঁতুহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাপরিমাণে চাবুকের ভয় এবং অস্থিখণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে এবং কিয়ৎপরিমাণে পশুবাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কস রক্ষা করা দুষ্কর হইবে এবং অধিকারীমহাশয়ের পক্ষেও বিপদের সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বলে প্রবল মনুষ্যজন্তুদিগকে শাসনে সংযত রাখিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির নির্দেশে তাহাদিগকে নিরীহ নৃত্য প্রবৃত্ত করার ছবিটি ইংরেজের কাছে কোঁতুকজনক মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা। ইহাতে ইংরেজের মনে নূতনত্বের কোঁতুহল এবং স্বজাতিগর্বের সঞ্চার করে এবং আসন্ন বিপদকে শাসনে রাখিবার যে-একটি সুতীক্ষ্ণ আনন্দ আছে তাহাও ইংরেজপ্রকৃতির নিকট পরম উপাদেয়রূপে প্রতীয়মান হয়।

এদিকে ইংলণ্ডে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দলও দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সাহিত্যও বিস্তারলাভ করিতেছে। ইংলণ্ডের ভূমিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মত ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া শাখাপল্লবিত হইতেছে। এই স্থলে স্মারামুরোধে একথাও বলিয়া রাখা উচিত, অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতকার্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া নিঃসহায় ভারতবাসীদের প্রতি পরম হিতৈষিতাচরণ করিতেছেন।

এই সকল কারণে স্বদেশস্থ ইংরেজের মধ্যেও একদল সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের স্বত্বকে যে-সকল কর্তব্য পালন করিয়া চলেন তাহার অধিকাংশই প্রাচ্যদেশীয়

ভিন্নজাতীয় জীবসকলের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে কুইকটোচিত বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় কিনা, তাহাতে যৌপবাসী সভ্যজাতির বোধশক্তির সংকীর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় কিনা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিন্নজাতীয় জীবের অনিষ্ট হয় কিনা। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকের মত এই যে, সভ্যতার তারতম্য অল্পসারে নৈতিক আদর্শের তারতম্য কেবল যে অবশ্যস্বাভাবী তাহা নহে, অভিব্যক্তির নিয়মে তাহা আবশ্যক।

এই সকল মতের সত্যাসত্য অন্ত সময় বিচার হইবে আপাতত এইটুকু বলিতে পারি ইহার ফল আমাদের পক্ষে বড়ো পীড়াজনক। বেহার প্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনোকালেই ষথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে। উহাদিগকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিতে হইবে। এ-সকল কথা পূর্বাপেক্ষা আজকাল যেন অধিকতর মুক্তকণ্ঠে বলা হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই, যদি বা স্বীকার করা যায় যে স্বাধীনতাপ্রিয় যুরোপের কর্তব্য-নীতি চিরপরাধীন প্রাচ্যদেশে সর্বথা উপযোগী নহে তথাপি যখন আমাদের রাজ্য যুরোপীয় তখন প্রাচ্যদেশের স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে দুরাশামাত্র। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এই প্রাচ্যদেশে স্বাভাবিক নিয়মে যে-রাজ্যতন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া উঠিত তাহা বর্তমান ইংরেজ-রাজ্যতন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকারের হইত। হয়তো একদিক হইতে দেখিতে গেলে রাজ্যের যথেষ্ট প্রতাপ এখনকার অপেক্ষা অধিক মনে হইত, তেমনি আবার অন্তদিকে রাজ্যের প্রতাপ খর্ব করিয়া প্রজাদের ইচ্ছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত। স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কেবল স্বাভাবিক নিয়মেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইংরেজ হাজার ইচ্ছা করিলেও কেবল পলিসির দ্বারা তাহা ঘটাইতে পারে না।

অতএব ইংরেজ আমাদের সহিত কেবল ইংরেজের মতোই ব্যবহার করিতে পারেন; যদি ইচ্ছাপূর্বক তাহা বিকৃত করেন তবে সে কেবল দুর্ব্যবহার হইবে কোনোকালেই ভারতবর্ষীয় ব্যবহারে পরিণত হইতে পারিবে না। তাঁহাদের নিজের আদর্শ তাঁহারা ভাঙিতে পারেন কিন্তু তাহার স্থলে গড়িবেন কী এবং গড়িবেন কী করিয়া? মাঝে হইতে চিরান্ত্যন্ত স্বদেশীয় আদর্শচ্যুত ইংরেজ আমাদের পক্ষে বড়ো একটি ভয়ংকর শ্রাণী হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। রাডইয়ার্ড কিপলিং প্রভৃতি লেখকের লেখার মধ্যে যে একটি বল-দর্পমিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস অল্পভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয় মানব মধ্যে মধ্যে

সভ্যতার শততন্তুনির্মিত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম আরণ্য প্রকৃতির বর্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। আংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতা-মদিরার আশ্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড যন্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতাদণ্ড প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ-আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে তাহা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।

দ্বিতীয় কথা এই, আজকালকার উপগ্রাসে লেখকেরা প্রাচ্য প্রকৃতিকে পাশ্চাত্য-দেশের নিকট ষতটা রহস্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন তাহার অনেকটা কাল্পনিক। আমাদের পরম্পরের মধ্যে সহস্র যোগ আছে। অন্তরের সাদৃশ্য অনেক সময় বাহ্য বৈসদৃশ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র। আধুনিক লেখকগণ সেই বাহ্য বৈসদৃশ্যগুলির নূতনত্বকে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থে রঞ্জিত অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে থাকেন এবং স্নগভীর সাদৃশ্যগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টাও পান না ক্ষমতাও রাখেন না।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, যুরোপের নীতি কেবল যুরোপের জন্ত। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

এরূপ অবস্থায় আমাদের গ্যায়গ্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরেজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরেজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

সম্প্রতি তাহার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ইংরেজের কোনো অগ্রায় দেখিলে ভারতবর্ষ আপন দুর্বলকণ্ঠে সভ্যতা ও নীতির দোহাই পাড়িতে থাকে। সেজন্য ইংরেজ রাগ করে বটে কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকিতেও হয়।

তথাপি এখনও সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। আমাদের সম্বন্ধে সকল সময়ে সকল অবস্থায় নীতি মানিয়া চলাকে ইংরেজ দুর্বলতা স্বীকার বলিয়া দেখে। আমাদের প্রতি অপরাধ করিয়া তাঁহাদের কেহ জায়বিচারে দণ্ডনীয় হয় ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষীয়ের নিকট ইহাতে ইংরেজের জোর কমিয়া যায়।

রাজপুরুষদিগের মনের ভাব ঠিক করিয়া নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু বোধ করি রাডীচি সাহেবের অসময়ে পদোন্নতি উপরি-উক্ত পলিসিবলত। বিশেষত যখন দেখা যায় এমন ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে, তখন সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। গবর্ণমেন্ট যেন নীরবে বলিতেছেন যে, তোমাদিগের কাহাকেও অগ্রায় উৎসীড়ন ও অপমান করিয়া

কোনো কর্তৃপক্ষের লাহনা হইতে পারে ইহা মনে করাই তোমাদের পক্ষে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধায় পদাঘাত করিবার জন্ত যদি বা প্রথা উল্লঙ্ঘন যদি বা রাজশাসনের অন্যায় করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। ইংরেজ শাসনপন্থার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ধর্মবিচারেরও স্মৃতি।

সত্যের অহুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্প্রতি দুই-একটি ঘটনায় দেখা গিয়াছে, গবর্নেন্ট কেবল ইংরেজ নহে নিজের কর্মচারীমাত্রকেই শাসনবিচারের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে চাহেন। বালাধন হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমায় ইংরেজ জজ হইতে বাঙালি পুলিশ কর্মচারী পর্যন্ত যে কেহ লিপ্ত ছিল, হাইকোর্টের বিচারে যাহারা প্রত্যেকে প্রকাশ্যে নিম্নিত হইয়াছে তাহারা সকলেই বাংলা গবর্নেন্ট কর্তৃক পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছে।

আমরা বাহিরের লোক, রাজনীতির ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। হয়তো ইহার মধ্যে কোনো গোপন কারণ থাকিতে পারে। হয়তো কর্তার এমন ধারণা হইতে পারে যে, বালাধনের মকদ্দমায় স্থানীয় জজের বিচার অন্তায় হয় নাই; যেমন করিয়া হউক গোটা পাঁচ-সাত লোকের ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের এমন সংস্কার হইতে পারে যে, আদালতে টিকিবার যোগ্য প্রমাণ না থাকিলেও ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং সে-সত্য স্থানীয় বিচারকই কেবল নির্ণয় করিতে পারে, হাইকোর্টের জজের পক্ষে অসাধ্য।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রকাশ্যে যাহাদের ব্যবহার নিম্নিত হইয়াছে, সাধারণের নিকটে যাহারা অজ্ঞায়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক তাহাদিগকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিলে জনসাধারণের শ্রাস্তান্তর-জ্ঞানের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। সকলকে বলা হয়, তোমাদের কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনোরূপ কৈকিন্ত দিবার কোনো আবশ্যক দেখি না—তোমরা ভালোই বল মন্দই বল তাহাতে গবর্নেন্টের কোনো মাথাব্যথা নাই। আমাদের ভারি স্ক্রীং গবর্নেন্ট।

যে গবর্নর প্রজার মর্মবেদনার উপর প্রজার শ্রাস্তান্তরবোধের উপর জুতার গোড়ালি ফেলিয়া ফেলিয়া চলেন এবং সেই মচমচ শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আতঁষর নিমগ্ন করিয়া দেন তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্ক্রীং গবর্নর।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বলপ্রকাশ পায়, না, আমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্বলতার সূচনা করে তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। গবর্নেন্টের এরূপ উদ্ভূত অবজ্ঞায় ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের শ্রাস্তান্তরবোধ

এমন প্রবল নহে যে, তাহার নিকট সংকোচ অস্বভব করা যায়। বরঞ্চ এই চিরনিপীড়িত জাতির নিকট নিঃসংকোচ বেচ্ছাচারই যথার্থ বলের দ্বায় প্রতিভাত হয়।

আমরা যদি রাজপুরুষগণকে এমন কথা বুঝাইতে পারি যে, জ্ঞায়পথ লঙ্ঘন করিলে সেটাকে আমরা বাহাদুরি জ্ঞান করি না, অজ্ঞায় যতই বলিষ্ঠ দেখিতে হউক আমাদের প্রাচ্য স্বভাবেও তাহা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সুদৃঢ় নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি যথোচিত জ্ঞায়দণ্ড বিধান করিবার সাহস না থাকে আমাদের নিকট দুর্বলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে তবে আমাদের সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে ইংরেজ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, কারণ সে-আদর্শের সহিত তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অজ্ঞায়চরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্রাস্থ বলিয়া স্থির করিব না, যখন অজ্ঞায়ের প্রতিবিধানচেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্তব্য বলিয়া জ্ঞানিব এবং সেজন্ত ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাশ্রুত হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। তখন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের জ্ঞায়পরতা কদাচ স্বার্থ পরিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বা। বিচলিত হইবে না, অটল পর্বতের জ্ঞায় প্রজ্ঞা-হৃদয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন ইংরেজের সদ্ব্যবহার শুভদৈবক্রমে ক্ষণিক অশুগ্রহের জ্ঞায় আমাদের নত মস্তকের উপর নিষ্কিপ্ত হইবে না, সম্মানের জ্ঞায় আমাদের নিকট আহবিত হইবে,—আজ যাহা ভিক্ষারূপে প্রাপ্ত হইতেছি তখন তাহা অধিকারের জ্ঞায় গ্রহণ করিব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপদেশ সহজ, কিন্তু উপায়টা কী? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, কোনো যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে। প্রত্যেককে প্রাণপণ করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ভ্রাতা এবং সন্তানহিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞায়চরণের অটল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নিজের ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভালো কথার জ্ঞায় এ-কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন এবং অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতন সুলীর্ষ প্রকাশ্য পথ ছাড়া স্থায়ী কল্যাণের আর কোনো নতন সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রসঙ্গ-কথা

১

কলিকাতায় প্রেগ-রেগুলেশন যে উগ্রমুর্তিধারণ করিয়া উঠে নাই, সেজন্য আমাদের নব বন্ধাধিপের প্রতি বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যমদূতের উৎপীড়নের সহিত রাজদূতের বিভীষিকার যোগ হইলে প্রজাগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু সেইটে নিবারণ হইয়াছে বলিয়াই যে একমাত্র আনন্দ তাহা নহে; ইহা অপেক্ষা গুরুতর স্মৃতির কথা আছে।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, প্রজারা যখন কোনো একটা বিষয়ে একটু বেশি জ্বিদ করিয়া বসে তখন গবর্মেণ্ট তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, পাছে প্রজা প্রশ্রয় পায়।

সেইজন্য আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যে-সমস্ত কোলাহলকে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন নাম দিয়া থাকেন তাহাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আমরা সছুপায় বলিয়া মনে করি না। কারণ, গবর্মেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণ যখন এই সকল অ্যাজিটেশনওআলাকে আপনাদের বিরুদ্ধদল বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন, তখন তাঁহাদের সংগত প্রস্তাবেও কর্ণপাত করিতে কর্ণপক্ষের দ্বিধা হয়, মনে হয়, এ-কথা পাছে সাধারণে মনে করে যে, আমরা দায়ে পড়িয়া হার মানিয়া ইচ্চার বিরুদ্ধে কয়েকজন উদ্বৃত্ত লোকের বাকশক্তিদ্বারা চালিত হইলাম, পাছে কেহ ভুলিয়া যায় যে, ভারতবর্ষে আমাদের ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।

অ্যাজিটেশনকারিগণও ভিতরে ভিতরে তাহার আভাস পাইয়াছেন তাঁহাদের ব্যবহারে এরূপ অজুমান করা যায়। কারণ, এবারে যে নিদারুণ আইনের দ্বারা নাটু-হরণ ব্যাপার ঘটিল সে-সময়ে আমাদের দেশের বাগ্মী-সভাসমূহ অভূতপূর্ব বিস্তৃতাসহকারে স্তূর্দীর্ঘকাল নিমন্তক ছিলেন। আমরা গোল করিতে বসিলেই পাছে গবর্মেণ্টের মন আরও বিগড়িয়া যায় হয়তো এ-আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল।

যাহাই হউক বর্তমান ব্যাপারে আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গবর্মেণ্ট প্রজাদের মন রক্ষা করিতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই। গবর্মেণ্ট এবং এ-দেশী ইংরেজসম্প্রদায় বলিতেছেন যে, প্রজারা যখন পূর্ব-দেখী, এবং পরিবারমণ্ডলীর প্রতি হৃৎকোপ করার বিরুদ্ধে তাঁহাদের যখন এতই দৃঢ়সংকল্প তখন সেটা বিবেচনা করিয়া এবং যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কাজ করাই রাজার কর্তব্য।

আমাদের বিশ্বয় এবং ক্লান্ততার কারণ এই যে, প্রগদমন একমাত্র ভারতবর্ষের হিতের জন্য নহে। তাহাতে ইংরেজের ভয় আছে, বাণিজ্যের ক্ষতি আছে। এরূপ স্থলে প্রজাদের পূর্ব-দেশী সংস্কার বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হওয়ায় প্রাচীনত্বের সাক্ষর নেত্রগুলি আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন অকস্মাৎ সৌভাগ্য আমরা আশাও করি নাই। কারণ, যে দুর্ভিক্ষ-ভুক্ষণ-মহামারীর প্রলয়পীড়নে অন্ত কোনো দেশ আসন্ন যত্নের ভীষণ নৈরাশ্রে উদ্দাম হইয়া উঠিত, ভারতবর্ষ তাহা অবিচলিত ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়াও কর্তৃপক্ষের করুণা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশের এই পরম দুঃসময়ে গবর্নেন্ট উপযুক্ত পরি তঁাহার কঠোরতম বিধি ও শাসনের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা সৃজন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইরূপ দুর্ঘোষণাই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তঁাহাদের পক্ষে ক্ষমা ধৈর্য ও সমবেদনা কোঁজ কেঁলা ও গুলিগোলার অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল।

পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, বাধিতের উপর জ্বরদন্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতামাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এবার প্যুনিটিভ পুলিশ, নাটু-নিগ্রহ, সিভিলিয়ন বিলের দ্বারা গবর্নেন্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না।

মারীগ্রন্থ পুনা যখন গোরাসৈন্তের আতঙ্কে মহমুহু কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল তখন কর্তৃপক্ষ সেই আতঁনাদকে প্রজার স্পর্ধা বলিয়া গণ্য করিলেন। তখন তঁাহারা প্রবলজ্ঞানোচিত ঔদার্য অবলম্বন করিলেন না, সাক্ষরচিন্তে এটুকু বিবেচনা করিলেন না যে, দুর্ভাগাগণের অস্তিমশয্যা হইতে অস্তিত একটা অসংগত বিভীষিকা দূর করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। স্বীকার করিলাম গোরাসৈন্তগণ শিষ্ট শাস্ত সংযত, এবং দেশীয় লোকদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু দেশের যুট লোকের যদি এমন একটা সুদৃঢ় অঙ্ক সংস্কার জন্মিয়াই থাকে যে, গোরাসৈন্ত দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং প্রজা অভাবে দেশীয় লোকের প্রতি অবিবেকী তবে সেই চরম সংকটের সময় বিপন্ন ব্যক্তিদের একটা অজুনয় রক্ষা করিলে দুর্বলতা নহে মহত্ব প্রকাশ পাইত।

দেখিলাম গবর্নেন্টের উত্তরোত্তর রাগ ও জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যত বেদনা শাসনকর্তা সেখানে তত আঘাত করিতে ক্রতসংকল্প হইলেন। ভারতবর্ষের আত্মস্বত্ব অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশে ফুটিবার উপক্রম করিল কোথাও

গোপনে গুমরিয়া উঠিল। এ-দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে এরূপ স্কন্ধ অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতার প্লেগ দেখা দিল। ভাবিলাম শংকরের অপেক্ষা তাঁহার কৃতপ্রেতগুলার ভয় বেশি—এবং ভারতগবর্মেণ্টের যেরূপ মেজাজ তাহাতে প্লেগ অপেক্ষা প্লেগ-রেগুলেশন বেশি রক্তমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। সতর্ক থাকিলে প্লেগের হস্ত অনেক এড়াইবে কিন্তু রেগুলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।

এমন সময় বুডবর্ন সাহেব মাঠেধরনি ঘোষণা করিলেন। বুডিলাম বাংলাদেশে রাজার অভ্যাস হইয়াছে, এখানে রেগুলেশন নামক এগুলিনের শাসন নহে, রাজার রাজ্য। ইহাতেই রাজভক্তি জাগিয়া উঠে। রাজার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার সহিত একভাবে মিলিতে পারে ইহা জানিতে পারিলে রাজাকেও মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করি এবং আপনার প্রতিও মনুষ্য বলিয়া শ্রদ্ধা জন্মে।

এ-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, আজকাল কিপলিং প্রভৃতি বিপ্ল্যাত লেখকগণের উপন্যাসে ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসিবর্গ যেরূপ বর্ণে চিত্রিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের মধ্যে এদেশীয়দের বিরুদ্ধে ক্রমশই যে একটা সাম্প্রদায়িক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার অবশ্যস্বার্থী প্রতিষেধরূপে উত্তরোত্তর ভারতবাসীর মনে ইংরেজ ও সর্বপ্রকার ইংরেজি প্রভাবের প্রতিকূলে যে একটা পরাশ্রয়ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে অল্পে অল্পে তাহার প্রতিকার সাধন করিতে পারেন পশ্চিমের ম্যাকডোনেল এবং আশা করি আমাদের বুডবর্ন সাহেবের দ্বায় ক্ষমা-ধৈর্যপনায়ণ সহায় শাসনকর্তৃগণ। কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উলটা ফল ফলিবে। ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজ এবং দেশী উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার, অজ্ঞান বিচার করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছে।

কিন্তু ক্ষমতা যাহার হস্তে, বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে। আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা স্কন্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ কিন্তু রাজারা কথিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে? উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে?

কিন্তু দুইদিক বিচার করা কাজটা কঠিন, বিশেষত দুইদিকের মধ্যে একদিক যখন নিজের দিক। তথাপি নীতিতত্ত্ববিৎমাত্রেই বলিয়া থাকেন পরের অপেক্ষা নিজেকে কঠিন বিচারার্থীনে আনিতে নিজের পক্ষেই মঙ্গল। ইঙ্গপের কথামালায় আছে কানা

হরিণ পরপারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাস খাইত—তাহার নিজপারের দিক হইতেই ব্যাধের শর তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল। নিজের দিকে সকলে কানা এই জন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ সেইদিকেই প্রবল হইয়া উঠে।

আমাদেরও সেই দশা, ইংরেজেরও তাই। যাহা সর্বাগ্রে আমাদের নিজের কর্তব্য তাহার প্রতি আমরা উদাসীন এবং গবর্মেণ্টের কর্তব্যের প্রতি আমাদের শত চক্ষু এবং সহস্র জিহ্বা। ইংরেজেরও প্রজার সামান্যমাত্র চাঞ্চল্যের প্রতি রুদ্ররূপ, কিন্তু নিজে যে প্রতিদিন গুরুত্ব ও অবমাননার দ্বারা প্রজাসাধারণকে নানা আকারে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন তাহার বিষময়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য থাকাতে তাহা প্রশ্রয় পাইয়া বিরাটমূর্তি ধারণ করিতেছে।

অনিচ্ছাসবেও আমরা একটা উদাহরণ দিতেছি। অনিচ্ছার কারণ এই, বারংবার নিজেদের এই সকল হীনতার দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে সংকোচ বোধ হয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনা যায় গোরা সৈন্ত শিকার উপলক্ষ্যে এ-দেশী গ্রামবাসীর হত্যার কারণ হইয়া পড়ে। মাস্ত্রাজে ঘটাকুলের হত্যাব্যাপারে দেশীয় দ্বাররক্ষীর মহত্ববিবরণ এমন জড়িত রহিয়াছে যে, তাহা বিস্মৃত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সুকঠিন।

দেশীয় লোককে হত্যা করিয়া এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে কেবল বহুকাল পূর্বে একজন ইংরেজের ফাঁসি হইয়াছিল। অভিব্যুৎসঙ্গ খালাস পাইয়াছে, অবশ্য, সেটা প্রমাণ এবং ইংরেজ জজ ও জুরির বিচার ও বিশ্বাসের কথা। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা বারংবার না ঘটিতে পারে গবর্মেণ্ট তজ্জন্ত কোনো বিশেষ বিধান করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহাতে করিয়া কোনো পোলিটিকাল কুফল সঞ্চিত হইতেছে না এমন কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি ব্যারাকপুরে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি ভূদ্রলোক তিনজন গোরা সৈন্তের দ্বারা যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। অবশ্য ইহার বিচার হইবে, এবং দোষিগণ দণ্ড পাইবে এমনও আশা করা যাক। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজজালিত কোনো খবরের কাগজে এই নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ্যে কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ অথবা রোষ প্রকাশ হইয়াছে? প্রমাণের ক্রটি অবলম্বন করিয়া আদালতের হস্ত হইতে দোষী নিষ্কৃতি পাইতে পারে কিন্তু ইংরেজসাধারণের ক্ষুব্ধ শ্রাদ্ধানুরাগ যদি এই পাপ-কার্যকে লেশমাত্র লান্ধিত না করে তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়?

অথচ, হাওড়ায় কোনো একটি যুরোপীয় হত্যা লইয়া সেই সকল ইংরেজি কাগজের ইংরেজ পত্রপ্রেরকগণ কিরূপ উত্তেজনা ও আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন?

হাওড়ার এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং তাহার বিচার

কঠিন ও দণ্ড শ্রুতোর হইবে না এমন আশঙ্কাও কেহ মনে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু উভয় হত্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। জনসাধারণ বধন অমূলক অথবা সমূলক আশঙ্কার দ্রুত হইয়া উঠে তখন তাহারা যেকল্প ভীষণমূর্তি ধারণ করে তাহা অন্য দেশের তুলনার এ-দেশে কিছুই নহে। সেইরূপ, উদ্বেজিত অবস্থার যে দুই-একটা অন্তর্য হত্যা সংঘটিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কী আছে? কিন্তু ব্যারাকপুরে বিনা-কারণে যে হত্যা ঘটিয়াছে তাহার মূলে বহুকালের স্পর্ধা ও প্রলয় আছে,—প্রেমঘটিত উদ্বেজনা কচিং-সম্ভাব্য কিন্তু শেবোক্ত কারণজনিত দুর্ঘটনা ধারাবাহিক। তাহার বিষবীজ সংক্রামক এবং স্থায়ী।

একটি গোরা পুনা-রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল তাহার বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনজনের গায়ে গুলি লাগে। আঘাত অতি সামান্য, এবং সে-হিসাবে অপরাধ গুরুতর নহে। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যে একটা নিহুর অবজ্ঞা অবহেলা আছে তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষেও চিন্তার কারণ হওয়া উচিত ছিল। অপরাধী স্বীকার করিয়াছে যে, "He fired at a coffee shop sweeper for a lark" অর্থাৎ সে কেবলমাত্র মজা করিয়া একজন কফি-দোকানের ঝাড়ুদারকে গুলি করিয়াছিল। এই গুলি ঝাড়ুদারের গাত্রে অধিকদূর প্রবেশ করে নাই কিন্তু এইরূপ মজা ভারতবর্ষের মর্মের মধ্যে গভীররূপে নিহিত হইয়া থাকে।

এ-কথা স্বীকার করিতে পারি না যে, যে-জাতি অতিমাত্রায় নিরীহ তাহাকে পদে পদে আঘাত ও অপমান হইতে রক্ষা করিতে কোনো গবর্নেন্টই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র বিপদ হইতে নিজের পৌরুষই নিজেকে উদ্ধার করে। ইহার অন্ত কাহারও কাছে কৈদিয়া গিয়া পড়ার মতো লজ্জা আর নাই।

সেইজন্য ছোটোখাটো উপদ্রব এবং অপমানের কথায় নিজেকেই প্রতি ধিক্কার জন্মে। সেতারার স্কলমাস্টারের কৃষ্টিত সেলাম সাহেবের পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়ার যে একটা লাঞ্ছনা ও নালিশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা লজ্জাজনক জ্ঞান করি। প্রত্যক্ষ অপমান যে-দেশে সুমন্দ গতিতে সুদূর নালিশে গিয়া গড়ায় সে-দেশের অপমানেরও শেষ নাই।

কিন্তু বাহারা সুদীর্ঘকাল শাস্তভাবে সহ্য করে, তাহারাই যে অকস্মাৎ একদিন তাহাদের চিরসঞ্চিত নিরব নালিশ অন্তর্জালার সহিত উদ্গীরণ করিতে পারে এ-কথা সকলেই ভুলিয়া যায়—এমন কি, তাহারা নিজেরাও পূর্বে হইতে বলিতে পারে না। এইজন্য বধন তাহারা হঠাৎ সামান্য উপলক্ষ্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তখন তাহাদের নিরর্থক

আচরণ অত্যন্ত অসংগত বলিয়া বোধ হয়। লোকে ভুলিয়া যায় বহুকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনা, অবিচার, অবিশ্বাস, অপমান হঠাৎ একটা তুচ্ছ মন্তব্যে বিরূপ আকার ধারণ করিয়া উঠে। মনে হয় সে যেন একটা আকস্মিক অতিপ্রাকৃত দৈবসৃষ্টি, কেহ যেন পূর্বে হইতে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু তাহা আকস্মিক নহে, অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিশয় মন্দগতিতেই প্রাকৃত নিয়মের রাজপথ দিয়া সে চলিয়া আসে, তাহার মৌন দীনভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না।

পূর্বদেশীয়দের এই নীরব সহিষ্ণুতা বাহাতে পশ্চিমদেশীয়দিগকে অলক্ষ্যে অসতর্কতা ও ঔদ্ধত্য লইয়া যায়, ইহাই প্রাচ্য প্রজা ও পাশ্চাত্য রাজ্য উভয়েরই পক্ষে বিপদের মূল। ইহা হইতেই গোরা সৈন্যদের মজার খেলা ও কালা আদমিদের অকন্যাং উন্নততার সৃষ্টি হয়।

যাহা হউক, এইরূপ সংঘটন এবং সংঘর্ষে প্রজাদের আন্তরিক সম্ভাপ যে কিরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা পরিমাণ করিবার উপায় নাই। যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুমা লাগি চড় এবং শূন্য নিগর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কী প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরেজসমাজ এইরূপ রুঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত।

আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এইপ্রকার ভাবই প্রজাবিরোধের ভাব। তাঁহারা আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বদাই আমাদের মর্মস্থানকে ক্ষুদ্র করিতেছেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে এমন মুঢ়চেতারও অভাব নাই যাহারা অসহ্য অবজ্ঞার আঘাতে প্রজা-হৃদয়ে অপমানক্ষত সর্বদা জাগাইয়া রাখাই রাজনৈতিক হিসাবে কর্তব্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা পণে চলিতে চাবুক ভুলিয়া 'সেলায় শিখাইতে শিখাইতে অগ্রসর হন।

ইহাকেই বলে প্রজাবিরোধ। এবং নিয়ত এই বিরোধেই প্রজার হইয়া প্রজাপতির কালায়ি উত্তরোত্তর প্রজলিত হইতে থাকে। ইংরেজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রত্নতত্ত্বমোহিত ক্রুটি নিক্ষেপ করিবেন? প্রজাদের সংবাদপত্র, সভাসমিতি, এবং বাগ্মিবর্গ আছে, কল্পমূর্তি রাজা মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বাগবোধ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু প্রজাপতির সস্তা নিঃশব্দ নীরব এবং তাঁহার বিচার সূচির কিন্তু সূনিশ্চিত।

২

পরজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ যে স্বাভাবিক এবং কিয়ৎপরিমাণে তাহার সার্থকতা আছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহি ইংরেজি স্পেক্টেটর পত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

একটা জাতি বাধিয়া তুলিতে অনেক সময় যায়। আজ বাহারা ইংরেজজাতি বলিয়া খ্যাত তাহারা জুলিয়স সীজারের আক্রমণকাল হইতে এডওয়ার্ড দি কনকেসরের রাজত্বকাল পর্যন্ত হাজার বৎসর ধরিয়া পরিপাক পাইয়া তবে প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে কেণ্ট রোমান অ্যাক্সল জুট ডেন স্নাক্সন নর্মান প্রভৃতি বিচিত্র ভিন্ন জাতি এক ঐতিহাসিক চুল্লির উপরে চড়ানো ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ ও বিরোধ ঘুচিয়া যখন তাহারা বনভাবে এক হইয়া উঠিল তখন তাহারা ব্রিটিশ জাতিরূপে গণ্য হইল।

এত দীর্ঘকালনির্মিত জাতীয়তা পরের সংঘাত হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্ত স্বভাবতই উচ্চত হইয়া থাকে। ধর্মনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সম্বন্ধে তাহার সংস্কারসকল এমন একান্ত বিশেষত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করে যে, তাহার মধ্যে বহির্জাতির প্রবেশপথ থাকে না।

ভারতবর্ষের হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক উপাধন করেন। সে তর্ক অসংগত নহে।

জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক, ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।

যুরোপে জাতিগত উপাধানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনোকালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে সে-কথা ঠিক নহে।

বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকাল ধরিয়া শাস্ত্র এবং সংস্কার, আচার এবং অশ্রুশাসন হিন্দুদিগের জন্ত এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে। তাহার সকল কক্ষগুলি সমান নহে;--মাঝে মাঝে দেয়াল উঠিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে বাতায়ান্তের পথ বন্ধ হইয়াছে কিন্তু তথাপি এই বিপুলতার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য আছে।

এই আট্টালিকার মধ্যে বাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা আদৌ একবংশীয় নহে। দক্ষিণের দ্রাবিড়ী হইতে হিমালয়ের নেপালি পর্যন্ত নানা বিচিত্র জাতি বহুকালে ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে সন্মিলিত হইয়াছে।

বরঞ্চ যে-সকল জাতি মিশ্রিত হইয়া ইংরেজ মহাজাতি রচিত হইয়াছে তাহারা মূলত ভিন্নগোত্রীয় নহে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিসদৃশ জাতিপরম্পরা যেমন একত্র মিশ্রিত হইয়াছে জগতে এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই।

স্পেক্টেটর যে স্বাভাবিক পরজাতিবিদ্বেষের কথা বলিয়াছেন আদিম আৰ্যদের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। আদানপ্রদান আচারবিচার, এমন কি, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় তাঁহারা আপনাদিগকে অনার্যদের সংস্রব হইতে দূরে রক্ষা করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ এক বহুদিনব্যাপী প্রকাণ্ড যুদ্ধ। রামায়ণ-মহাভারতের সুবিশাল ছন্দঃস্তোত্রের মধ্যে এই প্রাণপণ যুদ্ধের গ্লানকল্লোল এখনও ধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু চারিদিকের সহিত চিরকাল লড়াই করা চলে না। ক্রমে বিরোধচেষ্টা শিথিল হইয়া আসে এবং অল্পে অল্পে সন্ধি স্থাপিত হয়। এবং এইরূপে ধীরে ধীরে আৰ্য-অনার্যের মাঝখানে ব্যবধান ক্ষয়মাণ হইয়া আসিল এবং ক্রমে অনার্যদের সংস্কার তাহাদের পূজাবিধি তাহাদের দেবতা অভিমানী আৰ্যবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবর্তিত করিয়া তুলিল।

সেইজন্যই আজ হিন্দুজাতি জ্ঞানে অজ্ঞানে আচারে অনাচারে বিবেকে এবং অন্ধ কুসংস্কারে এমন একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদিচ সকল বিষয়েই আৰ্য-অনার্যের মধ্যবর্তী সীমা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন কি, আমাদের বর্ণ, আকার, আয়তনে রক্তমিশ্রণেরও সাক্ষ্য দিতেছে তথাপি স্বাতন্ত্র্যরক্ষাজন্ত বহুকালব্যাপী সেই যুদ্ধচেষ্টা আজিও হিন্দুসমাজের আন্তঃস্তম্ভে সজাগ হইয়া আছে।

তবে, পূর্বেরকার সেই আৰ্য-অনার্যের সংগ্রাম অল্প হিংস্র উগ্রতা পরিত্যাগ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অন্তপ্রত্যয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন আনয়ন করিয়াছে।

তাহার এক কারণ আমাদের পরম্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে, প্রকৃতির অনিবার্ধ নিয়মে যখন আমরা মিলিতেছিলাম তখনও শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ কেহই সম্পূর্ণ হার মানিতে চাহে নাই।

এই কারণে যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আৰ্য অনার্য এবং সংকর জাতি হিন্দু নামক এক অপকল্প ঐক্যলাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই। আমরা যেমন এক তেমনি বিচ্ছিন্ন।

এই দুর্বলতার প্রধান কারণ আমরা অভিজুতভাবে এক, আমরা সচেতনভাবে এক নহি। বাহ্যিক আমাদের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, বাহ্যিককে আমরা কিছুতেই খোঁচাইরা

রাখিতে পারি নাই, আমাদের বেড়া-দেওরা উজানের মধ্যে যে-সকল আগাছা আপনি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ক্রমে অনবধান অথবা অভ্যাসের জড়ত্ববশত আমাদের সহিত এক হইয়া গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা, কি শারীরসংস্থানে, কি বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্থদের সশ্রেণীর বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্থসভ্যতায় বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্থরক্তের বিস্তৃক্ততা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্থধর্ম-আর্থসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

এই বহুদেবদেবী, বিচিত্র পুরাণ এবং অঙ্কলোকাচারসংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।

কিন্তু আমাদের এই বিকারের জন্ত তত ক্ষোভ নাই বিচ্ছেদের জন্ত বত। এক্ষণে ধর্মে আচারে বিশ্বাসে ও শিক্ষার ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদ ক্ষীণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, বহুকালের সংঘর্ষে পরস্পরের মধ্যে অনেক অদলবদল হইয়া আর্থ অনার্থতর এবং অনার্থ আর্থতরভাবে এক হইয়া আসিয়াছে।—বাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে। কিন্তু তবু বিচ্ছেদ ভাঙে না।

অর্থাৎ ঐক্যের যা ক্ষতি তাহাও ঘটিয়াছে এবং অনৈক্যের যা দোষ তাহাও বর্তমান।

এক্ষণে এই দুটাই সংশোধন করা আমাদের কাজ। নতুবা আমাদের উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। নতুবা আমাদের শিক্ষা মিথ্যা, আমাদের আন্দোলন নিষ্ফল, আমাদের কংগ্রেস কনকারেন্স প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণকালের ক্ষীণ উদ্ভম।

এক্ষণে যিনি জড়ীকৃত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্থভাবের একটি বিস্তৃত আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোক-জুপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চায় করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমান কালের মহাপুরুষ।

পূর্বেই বলিয়াছি রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অসম্ভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন ষণ্ড ষণ্ড দেশে ষণ্ড ষণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা বিভক্ত। আমাদের স্থানীয় আচার স্থানীয় বিধি স্থানীয় দেবদেবীগণ বাহিরের আক্রমণ ও সংশোধন হইতে নিরাপদভাবে সুরক্ষিত হইয়া একদিকে ক্ষুদ্র অসংগত, অন্তর্দিকে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভিতরকার অনার্থতা, অদ্ভুত লোকাচার ও অঙ্কসংসারে শাখাপল্লবিত হইয়া, আমাদের আত্মদিককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গলে পরিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, সর্বসাধারণ মানবজাতির

রাজপথকে আমাদের নিকট হইতে অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী যতের উদারতা, প্রাধার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। এক কথায়, বৃহৎক্ষেত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার যে সকলতা তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই।

এক্ষণে ইংরেজ-রাজত্বে আমরা পরম্পর নিকটবর্তী হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। বহুদিনের বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে একটি প্রাচীন ঐক্যগ্রন্থি আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বাধিয়া গিয়াছে সেইটেকেই প্রবল করিয়া আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধূলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধূলা সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদেরিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ সেইটেই সর্বাপেক্ষা লঘু, এবং সেইটেই অল্প সূত্বে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু এ ধূলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইবে সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায় তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যখন কোনো প্রবল সংঘর্ষে কোনো নূতন শিক্ষার একটা জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে তখন সে নিজেরই মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সে জানে যে ধার করিয়া চলে না। যদি পৈতৃক ভাণ্ডারে মূলধন থাকে তবেই বৃহৎ বাণিজ্য এবং লক্ষ্মীলাভ নতুবা চিরদিন উৎকৃষ্ট।

আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদেরিগকে এমন জটিল, বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ধুমকেতুর মতো দুই-চারিজন মাত্র গর্ববিস্তারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।

অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিজ্ঞানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অহঙ্করণ আমাদের পক্ষে নিষ্পল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।

মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামী প্রভিষ্ঠিত আর্থসমাজ ক্ষুদ্র হিঁদুয়ানিকে আর্থ উদারতার দিকে

প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহা যে রূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ আশার কারণ দেখিতেছি।

উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লক্ষ্যন করে নাই অথচ মহুগ্ৰন্থকেও ধ্বংস করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয় অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা জনের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাধিয়াছে অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে, ইহা ভারতে আর-একটি অভিনব সম্প্রদায়রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে।

বারাস্তরে আর্থসমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভিন্ন জাতির সহিত সংস্রব ইংরেজের যেমন ঘটিয়াছে এমন আর কোনো যুরোপীয় জাতির ঘটে নাই। কিন্তু ইংরেজের পরজাতিবিষেব সমান স্মৃতি রহিয়াছে। ইহা তাহাদের জাতীয়তার অত্যাশ্রয় বিকাশের পরিচয়স্থল।

বিদেশ হইতে আগত বিজ্ঞাতি, ইংলণ্ড অথবা ইংরেজ-উপনিবেশে বাসগ্রহণে উদ্বৃত্ত হইলে ইংরেজের মনে যে বিরোধভাবের উদ্ভেক করে স্পেক্টেটর সেই সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু পরদেশে গিয়া তৎদেশীয়দের প্রতি ইংরেজের উচ্চত বিমূখ ভাবও সুবিখ্যাত। এমন কি, যুরোপের মহাদেশবাসীরাগণ সম্বন্ধেও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

আহারবিহারে আচারে ও ভাবে বীপবাসী ইংরেজের সহিত মহাদেশবাসী যুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ কিন্তু সেই প্রভেদগুলিও সাধারণ ইংরেজের মনে অবজ্ঞা এবং প্রতিকূল ভাব আনয়ন করে। তাহাদের জাতিসংস্কার এত দৃঢ় এবং সুকঠিন।

ইহার উপরে যখন পরজাতির সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ জন্মিবার লেশমাত্র সম্ভাবনা ঘটে তখন ইংরেজের অসহিষ্ণুতা যে অত্যন্ত বর্ধিত হইবে ইহা স্বাভাবিক।

ইংলণ্ডপ্রবাসী জার্মান, ইতালীয় ও পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ইংরেজ অধিবাসীদের মনে যে শত্রুতার উদ্ভেক করে তাহা যে কেবলমাত্র স্বেচ্ছা জাতীয়তাবের প্ররোচনার তাহা বলিতে পারি না—উহার মধ্যে স্বার্থহানির আশঙ্কাই প্রবলতর।

একে বিজাতীয় তাহার উপরে স্বার্থের সংঘর্ষ—এইরূপ স্থলে ব্রিটীশ স্বার্থনীতি এবং স্বায়-অন্তারের উচ্চতর আদর্শ টেকাই কঠিন হয়। ইহাতে যে অন্ধতা আনয়ন করে, উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারশক্তি তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।

অল্পদিন হইল ভূতপূর্ব ভারত-স্টেট-সেক্রেটারি সার হেনরি কাউলার পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন “ওআরেন হেক্টিংস এবং লর্ড ক্লাইভের কাধবিধি যদি পার্লামেন্টের বিচারাধীন হইত তবে সম্ভবত ভারতসাম্রাজ্য আমরা পাইতাম না।” তাঁহার এই বাক্যে পার্লামেন্টে খুব একটা উৎসাহসূচক করতালি পড়িয়াছিল।

এ-কথাটার কি এই অর্থ যে, যেখানে স্বার্থ স্বজাতির এবং দুঃখ পরজাতির সেখানে অত বিচার-আচার করিলে চলে না? পার্লামেন্টের মতো প্রকাশ্য বৃহৎ সভায় এ-কথার উজ্জ্বলিত অনুমোদন কি ধর্মনীতির মূলস্বত্বের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন নহে।

ধর্মনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা পরজাতির প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা হইতেই প্রসূত। ক্লাইভ ও হেক্টিংস বাহাদুরের প্রতি প্রতারণা মিথ্যাচার ও নিদাক্ষণ উপহাস করিয়াছিলেন তাহারা অনাদ্মীয়, তাহারা কেহই নহে, এ-কথা পার্লামেন্টের সদস্যবর্গের মনের মধ্যে অস্তুত অস্পষ্টভাবেও ছিল।

সাধারণত ধর্মনীতিবোধ তাঁহাদের যে অল্প তাহা বলিতে সাহস হয় না। কারণ বল্গেরীয় ও আর্ম্যানিদের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার, কুবানদের প্রতি স্পেনের কঠোরতা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রবলপক্ষের প্রতি উৎসাহ-করতালি বর্ষণ করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়ের প্রতি হেক্টিংসের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতিবোধ যে এমন সহসা সবেগে বিপর্যস্ত হইয়া যায় তাহার কারণ স্বার্থজনিত অন্ধতা এবং পরজাতি, বিশেষত প্রাচ্য পরজাতির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুগভীর অবজ্ঞাপরতা।

যে-অবজ্ঞা কাউলার সাহেবকে প্রকাশ্য স্পর্ধার সহিত নির্লজ্জ নীতিবিরুদ্ধ বাক্য বলাইয়াছে, সেই স্পর্ধা এবং সেই অবজ্ঞাই ভারতবর্ষীয় পাপাকুলিদের সম্বন্ধে কালস্বরূপ, সেই অবজ্ঞাই সমস্তপূরে দরিত্রের বিবাহ-উৎসবে হত্যাকাণ্ডের হাঁহাকার তুলিয়াছিল, সেই অবজ্ঞাই গোরাবিভীষিকাগ্রস্ত মারোপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয় হইতেও কর্তৃপুরুষদিগকে বধির করিয়া রাখিয়াছিল।

ইংরেজের নীতিবোধ এইরূপে দ্বিধাশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, ইহা অসম্ভব নহে যে, যে ইংরেজ কসু করিয়া ঘুমা লাগি অথবা গুলি চালাইয়া ভারতবর্ষীয় জনসংখ্যা হ্রাস করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই স্বজাতিসমাজে সে স্তম্ভ মেঘশাবক বিশেষ,—অতএব একজন দেশী হত্যাকারীকে ইংরেজের যেরূপ খুনি বলিয়া মনে হয় তাহাকে সেরূপ খুনি বলিয়া মনেই হয় না,—সুতরাং এমন লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া একটা আইনসংগত হত্যাকাণ্ড বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে।

আমাদের প্রতি তাঁদের কলঙ্কের দিকটা কেমনো আছে, কিন্তু তাহার বিপরীত

পৃষ্ঠটা হয়তো সম্পূর্ণ নিম্নলভ্যভাবে নিজের নিকট দেদীপ্যমান—অতএব ঠিক কলঙ্কের বিচার করিতে হইলে একবারে আমাদের তরফে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, কিন্তু তাহার মতো দুঃসাধ্য কাজ আর নাই।

ওআরেন হেক্টিংস লর্ড ক্লাইভ পরজাতির সম্বন্ধে যেমনই হ'ল স্বজাতির সম্বন্ধে তাঁহার মতঃ ইংরেজ কবি হড জিরাফ জন্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

“So very lofty in thy front—but then

So dwindling at the tail !”

অর্থাৎ সম্মুখের দিকে তুমি এত সমৃদ্ধ কিন্তু তবু লাম্বুলের দিকে এতই ধর্ব। ইংরেজ-জিরাফের লাম্বুলের দিকটা পরজাতির দিকে পড়িয়াছে বলিয়া যে, তাহার স্বজাতি তাহাকে সেইদিকেই পরিমাপ করিবে ইহা কখনো সম্ভবপর হইতে পারে না।

কিন্তু পররাজ্য অধিকার করিয়া স্বজাতি ও বিজাতিতে এক স্তায়দণ্ডে তুলিত করিবার কঠিন অধিকার ইংরেজ বহুতে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থের অহ্মরোধে সেই স্তায় হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহাতে উৎসাহ-করতালি বর্ষণের কোনো কারণ দেখি না। তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু তাহাতে স্পর্ধা প্রকাশের বিষয় লেশমাত্র নাই।

ইংরেজের এই পরবিষেব, বিশেষত প্রাচ্যবিষেব, নেটাল অক্টেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নশদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুষ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাজ্যীয় প্রজা এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী এমন সকল সৌভ্রাত্যমধুমাসা কথা শুনা যায়। ইংরেজ মহারানীর অধিকার-বিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এই প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলণ্ড উপলব্ধি করেন না—তাঁহার সম্মুখভাগের মহত্ব লাম্বুলবিভাগের ধর্বতার কোনো ধবরই রাখে না। অথচ ওই ধর্ব দিকটার লাম্বুল, আফ্রিকান-ব্যাপারে ন্যূন নহে। দমন-শাসন-তাড়ন-তর্জনে সর্বদাই সে চঞ্চলিত। তাহার চক্ষু নাই বলিয়া চক্ষুলজ্জাও নাই।

চক্ষুলজ্জা যে নাই ভারতবর্ষীয় ইংরেজি ধবরের কাগজে সর্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্তিপুর ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা “শালিমার ট্রাজেডি” নামে সমুচ্চবরে বারংবার ঘোষিত হইতে লাগিল। তাহাতেও খেদ নাই কিন্তু দুর্বিনীত নেটভের হস্তে প্রবাসী ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া যে-সমস্ত প্রেরিতপত্র বাহির

হইতেছিল তাহা পাঠ করিয়া যদি আমাদের শরীর উদয় না হইত তবে বড়ো দুঃখেও হাসিতে পারিতাম। আমরা হাসিতে সাহস করিলাম না, কিন্তু অদৃষ্ট একটা ভীষণ কোঁতুকের সৃষ্টি করিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজকর্তৃক কতকগুলি দেশীয় লোকের বীভৎস হত্যা পরে পরে সংঘটিত হইল—ইংরেজ সম্পাদকগণ একবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন। ইংরেজ সম্পাদকগণকে যিনি কাল্পনিক নেতিভীতিদ্বারা মুগ্ধ করিয়া তোলেন তিনিও আমাদের ছুরদৃষ্ট, এবং যিনি সাংঘাতিক প্রতিবাদের দ্বারা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া দেন তিনিও আমাদের ছুরদৃষ্ট।

১৩০৫



আমাদের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা ম্যাকেন্সি সাহেব তাঁহাদের স্বদেশের শীতল বায়ুতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গরম এখনও তাঁহাকে ছাড়ি নাই। ইতিমধ্যে এক ভোজ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা মুনিসিপ্যালিটির বাঙালি কমিশনারদের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গণ্য ব্যক্তির মধ্যে আমল দেন নাই।

তাঁহার সেই বক্তৃতার রিপোর্টে দৈবাৎ রিপোর্টার একটা ভুল করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন “কলিকাতা মুনিসিপ্যালিটিতে ইংরেজমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ স্থান পান নাই”—রিপোর্টার “প্রতিনিধি ইংরেজ” না লিখিয়া “ভদ্র ইংরেজ” লিখিয়াছিল।

কলিকাতা মুনিসিপ্যালিটিতে ভদ্র ইংরেজ নাই এ-কথা শুনিলে কলিকাতার ইংরেজ-হৃদয়ে পাছে আঘাত লাগে সেইজন্য তাড়াতাড়ি সমুদ্রপার হইতে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাঙালি কমিশনারদের যে গালি দিয়াছেন সেজন্য অশ্রুতাপ প্রকাশ করেন নাই।

অবশ্য, বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন, কিন্তু সিভিল সার্ভিস ও মিলিটারি বিভাগে যে রাজপুরুষেরা ভারতশাসন করিতেছেন তাঁহারাও যে সকলে লাটের পুত্র বা রাজবংশীয় তাহাও নয়। তাঁহারা যে একদা স্বদেশী সমাজের উন্নত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে ধসিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছেন তথ্যতালিকা লইলে এমনটা প্রকাশ হইবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞের নহেন; তাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা যোগ্য লোক ;

এবং তাঁহারা যদিও ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময় শুদ্ধমাত্র স্বনামটুকু লইয়া আসেন তথাপি বাইবার সময় অনেকে তাহার সহিত উপদ্রবি জুড়িয়া যাইতে পারেন।

কোনো ইংরেজ ভ্রমলোক লিখিতেছেন :

* Sir James Westland is a Scotman, and I have in my possession an old directory for the year 1848, which gives the names of the principal residents in the rural districts of Scotland. The name of Westland, however, is conspicuous by its absence.

একথা সত্য হইলেও ইহাতে আমরা কোনো ঘোষ দেখি না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় কনগ্রেস প্রকৃতি সভামণ্ডলীর মধ্যে পৈতৃক ধনে ধনী এবং বৃহৎ উপাধিতে ভূষিত লোকের সম্মান করেন এবং না পাইলে উপেক্ষা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কনগ্রেসেই কি, আর ম্যুনিসিপ্যাল পৌরসভাতেই কি, সুযোগ্য বাঙালি ভ্রমলোকের অভাব নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নলিনবিহারী সরকার, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ইহারা কোনোকালে লেকটেন্যান্ট গবর্নর হইতে পারিবেন না সন্দেহ নাই, কিন্তু না পারিবার কারণ এই যে, ইংরেজ-আমলে ভারত-শাসনের উচ্চতর অধিকারসকল হইতে আমরা বঞ্চিত।

আমাদিগকে যেটুকু অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সস্থ না হয়, যদি সেটা কিরাইয়া লইবার মতলব থাকে তবে লও—কিন্তু গালিমন্ড কেন ?

ঈসপের কথামালায় নেকড়ে বাঘ যখন মেঘশাবকটিকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে তখন বলে, তুমি আমার বরনার জল নষ্ট করিয়াছ,—মেঘ বলে, প্রভু, তুমি উপরের জল পাও আমি নিচের জল খাইতেছি তোমার জল আমি নষ্ট করিলাম কেমন করিয়া ? বাঘ বলে, তুই না ক্রবিস তোর বাপ করিয়াছিল। তাহার পর এক চপেটাঘাত।

আমরা মেঘশাবকেরও অধম। প্রভেদ এই যে, বাঘের পক্ষে যেটা ছুতা ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পক্ষে সেইটেই আসল কথা। এতদিন সেটা চাপিয়া গিয়াছিলেন ; থানার পরে পরিতৃপ্তমনে বন্ধুসভায় সেটা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য-বরনার ম্যাকেঞ্জি সাহেবের অনেক নিচের জলে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকি। কিন্তু সেও অসম্ভব। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তাঁহার ভোজ্যাবসানের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কলিকাতার কর্তৃত্বভার অসাধারণে আমাদের হাত হইতে অনেকটা ধসিয়া পড়িয়াছে। হায় ! এটুকুর প্রতিও লোভ ! বাহা বহুশব্দে দান করিয়াছ তাহার প্রতিও লোলুপ দৃষ্টি ! বিস্তর নিচে আছি, এবং অত্যন্ত অল্প জল পাই, আমাদের দেশী স্পর্শে ভোমাদের উচ্চশিক্ষার জল তো আমরা ছোলা করি নাই।

নেকড়ে বাঘ মনে মনে বলেন, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক প্রভৃতির স্বাক্ষরাজই তোমা-
দিগকে দিতে চাহি না। তাহার পর মুখে বলেন, তোমরা অযোগ্য, ইতিয়া-ক্লাবে বৈঠক
কর, তোমরা স্বদেশের প্রতিনিধি নও।

বেসরকারি ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বাগযুদ্ধ চলে। আমরা অনেক সময়
রাগের মুখে পরস্পরের প্রতি করুণবাক্য প্রয়োগ করি না। কিন্তু যাহারা ভারতশাসন-
কার্যে রাজস্থানীয় এতদিন তাঁহারা প্রজাসাধারণকে প্রকাণ্ডে রক্তভাষায় অপমান
করেন নাই।

আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে তাহা না হইতে পারে, প্রচুর স্নেহ
আছে এমন অভিমানও হয়তো না করিতে পারি কিন্তু তাঁহারা বাকসংঘম করিয়া
গেছেন। তাহার একটা কারণ, তাঁহারা যে উচ্চপদের উন্নতশিখরে থাকেন সেখান
হইতে একটি ছোটো কথা বর্ণন করিলেও নিচের লোকের মাথার পক্ষে তাহা গুরুতর
হইয়া উঠে; এরূপ অসমকক্ষ আক্রমণ বীরোচিত নহে। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে
cowardliness অর্থাৎ কাপুরুষতা বলে ইহাও তাহাই। আর-একটা কারণ এই যে,
কথার কলহ তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক এবং অযোগ্য। কারণ, তাঁহার হাতে ক্ষমতা
আছে। শক্তস্ত ভূষণং ক্ষমা। সে-ক্ষমা কাজের ক্ষমা না হইলেও অন্তত বাক্যের ক্ষমা
হওয়া উচিত।

রাজনীতির হিসাবেও বাকসংঘমের সার্থকতা আছে। রাজকাৰ্য্য সকল সময়ে
প্রজার অস্থূল হাথায় না। অতএব মাঝে মাঝে যখন কঠিন আইন বা অপ্রিয় করবৃদ্ধি
প্রজার উপরে জারি করিতে হইবে তখন দুর্বাক্য দ্বারা সেটাকে আরও তিক্ত করিয়া
তুলিলে রাজ্যপ্রজার মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনাহুত বাড়াইয়া তোলা হয়।

স্বাধীন ইংলণ্ডে পার্লামেন্টে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ-বচসা হইয়া থাকে; কেহ
কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। কিন্তু সেখানে জন্মসাধারণে যাহা চায় রাজশক্তি
তাহার বিরুদ্ধে যায় না। এইজন্য দেশে যে কী চায় তাহা নানা দলের আন্দোলনে সম্পূর্ণ
আলোচিত হইয়া স্পষ্ট আকার ধারণ করে। এ-দেশে, আমরা যাহা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি
না তাহাও রাজ্য আমাদের দিগকে গিলিতে বাধ্য করেন—আমাদের মতামত-ইচ্ছানিচ্ছার
দ্বারা রাজশাসন নিয়মিত হয় না। এখানে সম্পূর্ণ ই কর্তার ইচ্ছা কর্ম;—সে-স্থলে পারে
পড়িয়া প্রজাসাধারণ বা সম্প্রদায়বিশেষকে রক্ত কথায় ক্ষুধ করিয়া তোলা না শুশোভন,
না রাজনীতিসংগত।

তিক্ত বড়িকি মিষ্ট আকারে গেলানো রাজনীতির নৈপুণ্য। রাজশাসনের পথকে
যত সংঘাত-সংঘর্ষহীন করিয়া তোলা যায় ততই রাজ্যের পক্ষে এবং শাসনকর্তাদের পক্ষে

মজল। অবশ্য, রাজ্যশাসন সম্পূর্ণ বহুসাধ্য নহে, তাহার মধ্যে রাগঘেষ ও পক্ষপাত আপনি আসিয়া পড়ে কিন্তু তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ হইলে শাসনকার্যের গৌরব নষ্ট হয়।

আজকাল ইংরেজশাসনে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ম্যাকেল্লি সাহেব যখন বাংলার রাজপদে ছিলেন, যখন একেবারে অনেকগুলি অপ্রিয় বিধির প্রস্তাব উপলক্ষে সমস্ত দেশ বিভাবতই ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, সেই সংকটের সময়, দেশের সেই দুর্ভাগ্যের সময়, সেই কঠোর বিলগুলি পাস করিবার সময় ম্যাকেল্লি সাহেব বঙ্গভূমির ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজালা যোগ করিয়া দিলেন।

বিল তো পাস হইবেই। বিল-স্রষ্টাদের ইচ্ছার কোনো বাধা নাই। কিন্তু যত নির্বিরোধে হয় ততই ভালো। যদি প্রজার ক্ষতস্থানে ছুরি ঢালাইতেই হয় সেটা বাহাতে যথাসম্ভব অল্প বেদনার সমাধা হয় সেই চেষ্টাই উচিত; বাহার কিছুমাত্র দারিদ্র্যবোধ আছে তিনি সে-জারগাটা অনাবশ্যক আঘাতে বাধিত রক্তবর্ণ করিয়া তোলেন না।

কিন্তু উচ্চপদের যে স্বাভাবিক শাস্তি সংঘম ও ক্ষমা তাহা ম্যাকেল্লি সাহেব দেখান নাই। তিনি নিজের ক্ষম ছিলেন এবং রাজকার্যকেও রোগাতুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অগ্নি শাসনকার্য হইতে অবসর লইয়া ভারতভাগ্য হইতে বৃত্তিভোগ করিতে করিতেও তাঁহার ভূতপূর্ব প্রজাগণের প্রতি বিরোধগার করিতেছেন।

ইহাতে অমিশ্র কুকল ছাড়া আর কিছু দেখি না। ম্যুনিসিপাল বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ভূতপূর্ব বঙ্গাধিপ এ-সম্বন্ধে যতই চূপ করিয়া থাকেন ততই ভালো। তিনি বিলাতে বসিয়া থানার পরে অসংযত বক্তৃতা করিয়া উপদ্রব বাড়াইয়া তুলিতেছেন তিনি কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্কিতে বাঙালিবিদ্বেষ ও স্বজাতি-পক্ষপাত দেখাইয়া কেবল যে আত্মঘাতী লাঘব করিতেছেন তাহ নহে শাসনকার্যকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।

গবর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্যচ্যুতি আমরা বর্তমানকালের একটা ফলক্ষণ বলিয়া গণ্য করি। ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যে উত্তরোত্তর যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা যদি রাজপুরুষদিগকেও স্পর্শ করে, তাঁহারাও যদি এ অবস্থার প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া একটা দলভুক্ত হইয়া পড়েন তবে আমাদের পক্ষে সেটা সংকটের অবস্থা।

সেই রকমের বেন লক্ষণ দেখা বাইতেছে। অবশ্য, স্বজাতিপ্রেম সকল সময়েই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকাল বেন ভারতবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ ক্রমশই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজি ধবরের কাগজের নাদীতেও যখন বেগ প্রকাশ পায় তখন গবর্নমেন্টেরও চক্ষু লাল এবং গাত্র উত্তপ্ত দেখিতে পাই।

ইংরেজি ধবরের কাগজে বাঙালিদের প্রতি যে স্তম্ভিত অসহিষ্ণুতা দেখা যায় গবর্ণমেন্টের আচরণেও নানা আকারে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অন্তত ম্যাকেঞ্জি সাহেব সে-ভাবটি চাপিয়া রাখেন নাই। তিনি যদিচ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, ইংরেজি ধবরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন না তথাপি ইংরেজ প্রাণ্ডার প্রভৃতিকেও স্মিট্ট স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন, অথচ সে নিরম জাতি আজ পৰ্বন্ত তাঁহার মুখের অন্নজল জোগাইতেছে তাহাদের ভদ্রমণ্ডল সম্বন্ধে তাঁহার মুখে একটি মিষ্টবাক্য জুটিল না।

যাহা হউক, আমরা এমন দুরাশা করি না যে ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিলাতে বসিয়া

রচিবেন মধুচক্র গোড়জন বাহে

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—

কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির স্থায় এক্ষণে তিনি বিশ্রাম লাভ করুন; এখনও অন্তর্জ্বালার উত্তেজনায় তাঁহাকে যেন বাঙালিবিষে উদ্গীর্ণ করিতে না হয়।

১৩০৫

৪

শ্রীযুক্ত বাবু পৃথীশচন্দ্র রায় বিরচিত “দি পভার্ট প্রব্রেন্স ইন ইণ্ডিয়া” নামক সর্বসমাদরযোগ্য সারবান গ্রন্থে লর্ড ক্যারারের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এইখানে তাহার পুনরুদ্ধার করি :

The persons who carry on our trade on the outskirts of civilization are not distinguished by a special appreciation of the rights of others. ... When a difficulty arises between ourselves and one of the weaker nations, these are the persons whose voice is most loudly raised for acts of violence, of aggression, or of revenge. ... Our dealings in the Far East, and elsewhere have not always been such as would do credit to an honest merchant.

অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি সভ্যতার বহিরকূলে আমাদের বাণিজ্য বিস্তার করিয়া থাকে তাহারা অজ্ঞের স্থায় স্বত্বের প্রতি বিশেষ প্রদ্বাবস্তার অন্ত বিধ্যাত নহে। এখনই আমাদের সহিত কোনো দুর্বলতর জাতির একটা সংঘট বাধিয়া উঠে তখন ইহাদেরই কণ্ঠস্বর,

গীড়ন, আক্রমণ ও প্রতিহিংসাসাধনের জন্য সর্বোচ্চ সনিত হইয়া উঠে। দূরপ্রাচ্যদেশে এবং অন্তর অনেক সময় আমাদের আচরণ বৈরত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সাধুপ্রকৃতি বণিকের যোগ্য নহে।

রাজকর্মচারিগণ ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ইংরেজই বাণিজ্যজীবী। তুচ্ছতম উৎপাত উপলক্ষ্যেই তাঁহারা ক্ষুব্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। কারণ, ভারতশাসনকার্যকে নিজেদের স্বার্থসাধন হিসাব ছাড়া আর-কোনো হিসাবে দেখিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। তাঁহাদের মুখ হইতে এমন কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, এ-ভারতবর্ষটা টুপিওআলারই ভারতবর্ষ। পাগড়িওআলা ও বালিমাথাগুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চাবাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাটজোগানের পাইকড়, এবং লাংকাশিয়রের খরিদার।

রাজনীতির মঞ্চ সুপ্রশস্ত; তাহা দেশে এবং কালে, ধর্মে এবং অর্থে সুদূরব্যাপী, তাহার উপরে যাহারা অধিষ্ঠিত হইয়া দূরবিস্তীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পর্যালোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রভূতপরিমাণ ধৈর্য ও বিচক্ষণতা আবশ্যক, তাঁহারা তুচ্ছ ও বৃহৎ ব্যাপারের আপেক্ষিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও মহৎ সার্থকতার প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু ইংরেজবণিকগণ ভারতবর্ষকে যেখান হইতে নিরীক্ষণ করেন সে-জায়গাটা যতই উচ্চ হউক তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ, তাহা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লাভক্ষতির উপর দাঁড়াইয়া; একটু নাড়া খাইলেই তাহা হুলিয়া উঠে। গতবর্ষে ভূমিকম্পে কারখানাঘরের চিমনিগুলো হাতির শৃংগের মতো যেমন করিয়া হুলিয়াছিল, বড়োলাটসাহেবের প্রাসাদ এমন দোলে নাই।

ভারতবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজের মতের এবং ভাবের প্রভেদ অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাজনকর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া দলবদ্ধ গাওতালগণ গবর্ণমেন্টের নিকট হুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়া ঘে-ছুযোগ ঘটাইয়াছিল তদুপলক্ষ্যে মন্ত্রী সার উইলিয়ম হার্টার সাহেব লিখিতেছেন :

The Anglo-Indian community is naturally liable to apprehensions and hasty conclusions incident to a small body of settlers surrounded by an alien and a greatly more numerous race. ... With the government rests the heavy responsibility of counteracting the natural tendency to panic on the part of the public.

হতভাগ্য গাওতালদের হুঃখ কেহ দেখিল না, তাহাদের নালিশ কেহ বুঝিল না,—যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া তাহারা দাবানলপীড়িত যুগযুগের স্ত্রায় তাহাদের অরণ্যবাস-

ভূমি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন রাজসৈন্তগণ তাহাদিগকে গুলিবর্ষণে দলে দলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল।^১ অবশেষে এই হত্যাকাণ্ড যখন প্রচুর সাঁওতাল-রক্তে পরিভূক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিল তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ কিরূপ ধূয়া তুলিলেন?

হান্টার সাহেব এ-সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিউ নামক বিখ্যাত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিশেষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার “গ্রাম্যবন্ধবৃত্তান্ত” গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

In short, no one knew anything about the wrongs or the peaceful industry of the Santals. They were simply “adult tigers” or “bloodthirsty savages”; and the reviewer, dismissing the ordinary plan of punishing only the actual rebels as insufficient, adopts a proposal to deport across the seas, not one or two ringleaders, but the entire population of the inflicted districts.

এইরূপ অসংগত এবং অসংযত ভাষা ইংরেজচালিত পত্রে মধ্যো মধ্যো শুনা গিয়াছে এবং নিশ্চয়ই কালে কালে আরও শুনা যাইবে। তাহার কারণ হান্টার সাহেব পূর্বেই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা আতঙ্ক; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, সাধারণ মনের সেই উদ্ভ্রাম আতঙ্কের প্রতিকূলে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যরক্ষা করা গবর্নমেন্টের গুরুতর কর্তব্যের অঙ্গ।

আতঙ্ক যে কিরূপ দৃঢ়বন্ধমূল এবং কতদূর অঙ্গ মুক্ততার দ্বারা বেষ্টিত তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত কোনো ইংরেজ পত্রের একটি প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের গবর্নেন্ট যখন ভারতবর্ষের উপর ছাদলাদিতোর মূর্তিধারণ করিয়া উঠিয়াছিলেন তখন কলিকাতার বসতিবাসী ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকাশ্য ইংরেজবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি ঠিক তাহার উলটা ভাব দেখিয়া ইংরেজ সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সম্পূর্ণ আশ্চর্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জুজুর ভয় মূক্তির দ্বারা যায় না। সম্প্রতি একজন ইংরেজ আগন্তুককে দেখিয়া কোনো বসতির অধিবাসিগণ ছোটোলাট ভ্রমে তাঁহাকে প্রচুর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল এই প্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে উক্ত পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে দেশের সাধারণের মনে ইংরেজ-রাজভক্তি প্রবল—কিন্তু—উহার মধ্যে জুজু আকারে একটা কিন্তু রহিয়া গেছে—কিন্তু বোধ করি কুমন্ত্রীদের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে তাহারা বিগড়িয়া যায়।

সাহেবের হৃদয়াকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল না। একটা কালো রঙের খটকা

^১ টুলনার, “ইংরেজের আতঙ্ক”, পৃ. ৫০৭

রাখিয়া দিলেন। একটা কুমতী কোনো একটা জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। এ-প্রশ্ন একবার মনে উদয় হইল না যে, এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন? হঠাৎ কেনই বা তিনি জাগিয়া উঠেন আবার হঠাৎ ছুটিই বা গন কেন?

জুজুর-ধিরোনি-ছাড়িয়া দিলেও এই রহস্যের যে একটা অত্যন্ত সরল মীমাংসা আছে সেটা কেন সাহেবের মাথায় প্রবেশ করিল না। কেন তিনি ভাবিলেন না, বর্তমান বঙ্গাধিপকে দেশের লোক যথার্থ রক্ষক বলিয়া অমুভব করিয়াছে, তাঁহারই সহায়তা দেশের হৃদয়কে ইংরেজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু বোধ করি বাহাদুরের অতিশয় বুদ্ধি সরল মীমাংসাই তাহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গম। একটা কোথাও কিছু গোল আছে এটা বোধ করি বুদ্ধিমানের কথা। কারণ, গোল যদি দৈবাৎ বাহির হইয়া পড়ে তবে বুদ্ধিমান তাঁহার বুদ্ধির জয়টুকু বাজাইতে পারিবেন, যদি বাহির নাই হয় সেটা যে কোনো একটা জায়গায় নাই তাহার অগ্রমাণ করিবে কে!

আরও একটা কথা আছে। নিজের যে লেশমাত্র দোষ নাই এ-কথা মনে করিতে আরাম আছে—এবং ইংরেজ আরাম ভালোবাসে। দেশের জনসাধারণ কেনই বা ইংরেজের প্রতি কোনো অবস্থায় কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব বহন করিবে তাহা ইংরেজ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা অতিশয় প্রিয়চারী, তাঁহাদের স্বভাষায় যাহাকে বলে অ্যামিয়েবল;—অন্তএব, তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব তাঁহাদের দোষে জন্মিতেই পারে না। তবে কেন এমনতরো ঘটে? নিশ্চয়ই কোনো একটা কুমতী আছে। বাস। ইংরেজের বুদ্ধিতে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল।

এই মূঢ় অন্ধতা যদি কেবলমাত্র ইংরেজ সম্পাদকদের মধ্যে বদ্ধ থাকিত তাহা হইলেও আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি আজকাল ইংরেজ সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতন্ত্র পর্বস্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বোম্বারের দুর্ঘটনাবলীতে দেখা গিয়াছে বোম্বাই-কর্তৃপক্ষদিগের মেজাজ টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার মেজাজ হইতে বড়ো তফাত নয়। তেমনি উদ্ভট অবিবেচনা, অবজ্ঞাপূর্ণ কর্তৃত্বতা, দেশীয় লোকের গভীরতম বেদনা এবং কল্লণতম আবেদনের প্রতি নিরতিশয় উপেক্ষা।

তা ছাড়া, দেশীয় লোকদের ব্যবহারে যদি কোনোপ্রকার অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায়, সেজন্য তাহারাই একমাত্র দোষী; গবর্ণেন্টও এই প্রকারের একটা আরামদায়ক মূঢ় সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরেজ, সে সামান্য সৈন্তই হউক বা জিলার কর্তাই

হউন,—কখনোই দোষী হইতে পারে না, তাহাদের আচরণে পীড়া অল্পভব করাই পীড়িতের পক্ষে বেয়াদবি; তাহাদের দুর্ব্যবহারের সকল কথাই মিথ্যা; অতএব নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কুমত্বী আছে।

অতএব ধরো নাটু-ভাইদুটোকে। দাও তিলককে জেলে। দেশী সম্পাদকগুলোকে এক-একটা তুণের মতো উৎপাটন করিয়া আনো। কুমত্বী থাকিতেই হইবে, কারণ, ইংরেজ অতিশয় প্রিয়চারী, ভারি অ্যামিয়েবল।

এ-সমস্ত, ফলাফলবিচারী ধৈর্যশীল গবর্নেন্টের মতো ব্যবহার নহে; এ ঠিক দৈনিক ইংরেজি কাগজের দ্রুতলিখিত গরম গরম খ্যাখ্যলো প্রবন্ধকে ইতিহাসে প্রতিকলিত করা। মনে হয় যেন দারিদ্র্যবিহীন বেসরকারি ইংরেজ-সমাজের উদ্বেলিত অসহিষ্ণুতা গবর্নেন্টকেও অত্যন্ত অভূত এবং অশোভনরূপে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

গবর্নেন্টের এই সমস্ত আধুনিক লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি মনস্বী রাজনীতিজ্ঞগণের গবর্নেন্ট সমুদ্রতীরে শৈলভটের মতো উদার, অটল এবং ক্ষমাশীল ছিল; তাহাদের সময়ে ঝড় কম যায় নাই, এবং তরঙ্গিত ইংরেজ-সমাজ দেশটাকে হা করিয়া গিলিবার জ্ঞান উন্নত হইয়াছিল; তখন উন্নত কঠিন গবর্নেন্ট তাহাদিগকে ঠেকাইয়াছিল।

মনে হইতেছে যেন কালক্রমে সেই উন্নত তীর অগ্নে অগ্নে ধইয়া আসিতেছে, জলের সহিত সমতল হইতেছে; ঝড়ঝাপটের দিনে তুকানকে অটলভাবে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার চলিয়া যাইতেছে। অথচ ফুৎকারমাত্রেই তুকান উঠিয়া পড়ে এবং কেন যে এই সমুদ্র সর্বদাই ফেনিল বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন তাহার রহস্য জলবায়ুতত্ত্বের রহস্যের মতোই দুর্বোধ্য।

আসল কথা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠতা উদ্ভ্রোক্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সিমলা দার্জিলিং নৈনিতাল নীলগিরি জাঁকিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে পূর্বাশ্রয় ইংরেজনাদের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়াতে তাহার দুইটি ফল দেখা যায়। প্রথমত দেশীয়দের সহিত ব্যবধান দূরতর, দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কাজকর্ম কোনোমতে সারিয়া কেলিয়া আপনাদের সেই মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার প্রলোভন স্বাভাবিক। সেই মণ্ডলীর সহিত অবশিষ্ট ভারতবর্ষের প্রভেদ ইংরেজের কাছে অত্যন্ত অধিক এবং অক্লচিকর।

এই কারণে ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজের সম্পর্ক উদ্ভ্রোক্তর ভেলে-জলের মতো হইতেছে। এবং নিজেরাই আপনাদের লুপ্তস্বাধনা আরামের একমাত্র উপায় হওয়াতে পরস্পরের নিকট পরস্পরের গৌরব অতিশয় বাড়িয়া উঠিতেছে।

এরূপ কুটুম্বিতা যখন স্বাভাবিক তখন ইহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার জো নাই। আমরা কেবল, সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ কেমন করিয়া একাকার হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি মাত্র।

* এখন, যে-কোনো বিধান বা রাজনীতি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সাধারণের অগ্রিয় তাহাতে হাত দিতে গেলেই সামাজিক চকুলজ্জাটা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। টেনিস-কোর্ট, নৃত্যশালা, শিকার-পার্টি, রঙ্গমঞ্চ, সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা অসামান্য বলশালী লোকের কর্ম। তর্কতর্ক বা কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ অনেক সময় স্বমতরক্ষার উদ্ভেজনাধীন হয়,—কিন্তু খেলায় আমোদে আহারে বিহারে নারীকণ্ঠ বা শ্রীকটাক্ষে অল্পস্বত্ব এবং অর্থোক্ত মতামতগুলি অত্যন্ত দুর্বল।

তা ছাড়া যে শাসনকর্তা রাজোচিত ঔদার্যের সহিত আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে নারাজ না হন, ইংরেজ-মহলে তাঁহার প্রতি একটা অত্যন্ত কঠিন অপবাদ প্রচার হয়। বলে যে, তিনি ভারতবর্ষীয় আন্দোলনকারীদের দ্বারা চালিত হইতেছেন। ইংরেজের পক্ষে এমন দুর্বলতা আর কী হইতে পারে।

কিন্তু অপবাদকারীরা এ-কথা ভুলিয়া যায় যে, দুর্বলের কথায় কান দেওয়া দুর্বলতার ঠিক বিপরীত। তাহাই সবলের লক্ষণ। আজকাল শাসনকর্তাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে ইংরেজ-সমাজের দ্বারা চালিত না হওয়া; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে দুর্বলতা। পাছে এমন কথা উঠে যে, কনগ্রেসের দলবদ্ধ কাতরতার ভুলিল, সেই মনে করিয়া কোনো উদারনীতি প্রবর্তনে বিধা বোধ করা ইহাই দুর্বলতা; ইংরেজ পত্রসম্পাদকের সহিত রাজসিংহাসন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া, ইহাই দুর্বলতা। এখনকার ভারত-শাসনব্যাপার ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সামাজিকতাজালে আপাদমস্তক জড়িত এবং সেইজন্তই দুর্বল। সেইজন্ত প্রেমনীতি-স্বমতানীতির উপরে ভারতসাম্রাজ্যকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যে কেবল রহিত হইতেছে তাহা নহে তাহা প্রকান্তভাবে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত উপহসিত হইতেছে। সর্বপ্রকার বিচারবিবেকবিধান লঙ্ঘন করিয়া আকস্মিক জবরদস্তি দ্বারা দুঃখিত প্রজাতিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই প্রবলের ধর্ম এবং ক্ষমা, ধৈর্য, অবিচলিত অপকপাত, অথবা দুর্বলের প্রতি প্রজার প্রতি নিরুপায়ের প্রতি পক্ষপাত দুর্বলের লক্ষণ বলিয়া প্রতিদিন কীর্তিত হইতেছে।



বরিশাল হইতে দেশবদ্ধ শ্রীযুক্ত অমিনীকুমার দত্ত মহাশয় কনগ্রেস সম্মেলন একটি আলোচনাপত্র আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা জানি ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলনের জগৎ অনেক সভা আছে। এবং সময়ে সময়ে “কর্ন ল” প্রভৃতি বিশেষ বিধি লইয়া ইংলণ্ডের অনেক উচ্চমণীল মহাত্মা অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত স্বদেশকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন।

তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বারংবার বাধা সত্ত্বেও নিরন্তর হয় না, এবং আমাদেরই বা অল্প বিঘ্নে কেন হয়? অবশ্য, উচ্চমণীলতার তাহার আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে একটা কারণ; কিন্তু যথার্থ কারণ, তাহার আশালতার বীজ নিজের জমিতে বপন করিতেছেন, আকাশকুসুমপ্রত্যাশী হতভাগ্য আমাদের মতো বাতাসে উড়াইয়া দিতেছেন না।

গবর্নমেন্টের সহিত তাহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাহাদের জুপিও হইতেই রক্ত সঞ্চালিত হইয়া গবর্নমেন্টের হাত-পাকে কার্যক্ষম করিয়া তুলে। তাহাদের পক্ষে দেশকে বিশেষ মতে দীক্ষিত করা এবং সেই মতের দ্বারা গবর্নমেন্টকে চালিত করা একই কথা।

কিন্তু আমাদের কনগ্রেস গবর্নমেন্টের দ্বারের বাহিরে। তাহার কেবল ভিক্ষার অধিকার আছে। সেই ভিক্ষার মধ্যে এমন আশার মহত্ব বা কর্মের গৌরব কিছুই নাই যাহাতে দেশকে দীর্ঘকাল উৎসাহিত করিয়া রাখিতে পারে।

আমরা নিশ্চয় জানি অল্পগ্রহস্বরূপ আজ যাহা লাভ করিব, কাল তাহা হারাইবার কোনো বাধা নাই। দয়া করিয়া আজ যদি আমাদেরকে কেহ স্বায়ত্তশাসন দিলেন ভাবিলাম এক পরমার্থ লাভ হইল, আবার কর্তাদের মধ্যে কাল যদি সেটাকে কেহ পছন্দ করিয়া দেন তবে আমরা কেবল বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিয়া মরিব।

আমাদের অদৃষ্টে ভারতের রাজশক্তি অনেকটা পদমানবীর মতো। আজ পাঁচ বৎসরে আমাদের কপালে যেখানে পলি পড়িল পরের পাঁচ বৎসরে সেখানে বালি পড়িতে এবং তাহার পরের পাঁচ বৎসরে ভাঙন ধরিতে কোনো বাধা নাই। এই চরের উপর যদি আমরা কনগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার স্বায়ত্ত্ব প্রত্যাশা করি তবে আমরা মুঢ়। কনগ্রেস যদি নিজ শক্তিতে দেশের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে পারে, তবেই সে দেশের জনমের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যদি বিচিত্র মেজাজের প্রভুপরম্পরার

নিকট কনস্টিট্যুশনাল লাক্সুল আন্দোলনকেই সে আপন কর্তব্য জ্ঞান করে, তবে অস্ত্র ক্রটির টুকরা এবং কল্যাণাটির ভঁতা ধাইয়া পথের প্রান্তে পঞ্চদশলাভই তাহার আদৃষ্টে আছে।

এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে অনেক নীচর আপনি আসিয়া পড়ে। স্বাধীনক্ষমতাদৃষ্ট প্রভুর মন জোগাইতে গেলেই কপট নম্রতা, মিথ্যা আশ্বাসন, সত্য গোপন এবং আত্মপ্রবঞ্চনা, দুর্বলপক্ষ স্বতই, অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেও, অবলম্বন করিয়া বসে। ইহাতে ক্রমশ যে হীনতা আসে ভিক্ষালব্ধ অধিকারবধৌ তাহা পূরণ করিতে পারে না।

এইজন্য আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়াছি গবর্নেন্ট অবজাসহকারে কনগ্রেসের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া আমাদেরকে শাপে বর দিতেছেন। আমাদেরকে যথার্থ পথে প্রেরণ করিতেছেন। সে-পথ আত্মশক্তির পথ। ভিক্ষা যদি পূরণ করিতেন তবে আমাদেরকে কঠিন কর্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সহজ দেশহিতৈষিতার সুকোমল হীনতাপঙ্কের মধ্যে, ভিত্তিহীন আত্মপ্রাধা, অমূলক কৃত্রিম উন্নতি, এবং অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।

এ-কথা আমরা অস্ত্রের মধ্যে বৃষ্টিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এতদিন কী করিলাম, ইহাতে ফল কী হইতেছে; এতকাল যাহা বর্ষে বর্ষে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি সবই যদি ইংরেজ-রাজ আমাদের জীব আঁচল পূর্ণ করিয়া দান করেন তবু কি আমরা যথার্থ বড়ো হইব, অস্ত্রের মধ্যে সার্থকতা অল্পভব করিব? এই সমস্ত প্রশ্ন এবং এই সকল সংশয় বর্ষে বর্ষে আমাদের উৎসাহ নির্বাণ করিয়া আনিতেছে।

কনগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই আমাদেরকে দেশের হিতামুষ্ঠানে ধানিকটা দূর করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। চাকা যে কেবলমাত্র তেল ও ঠেলার দ্বারা চলে তাহা নহে নিজের গতিবেগও তাহাকে চালনা করে। সেইরূপ, কার্ঘ্যচক্র লোকের আকর্ষণে যেমন চলে নিজের কর্মগতিতেও তেমন বেগ প্রাপ্ত হয়,—কাজের দ্বারা কাজ অগ্রসর হয়।

কিন্তু কাজের ভার যখন পরের উপর, কেবল প্রার্থনার অধিকার আমাদের—এবং সেই পরও যখন প্রতিফুল, তখন, কিছু যে কাজ হইতেছে তাহা অল্পভব করিব কেমন করিয়া। এই লক্ষীছাড়া ভিক্ষাকার্যে আমাদের উৎসাহ কিসে সজীব রাখিবে।

সমালোচ্য পত্রখানির এক জায়গায় আভাস আছে যে নুতনত্বের স্বাস হওয়ার্তে আমাদের উৎসাহ ক্রমে নান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিজ্ঞানের নব নব

আবিষ্কারের সঙ্গে জগতের রহস্য অধিকতর প্রসারিত হইয়া যায় তেমনি কাজ বত সম্পন্ন হয় উদ্ভূতের নূতনত্ব ততই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যেখানে কাজ নাই কেবলই আয়োজন সেখানে উৎসাহের নবীনতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা অসাধ্য। ভিক্ষাচর্চা বতই নৈপুণ্যসহকারে নব নব কোশলে নিশ্চয় হউক তাহাকে কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

প্রতি বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া অন্তত একটা কিছু কাজ আমরা নিজেরা যদি করিতে পারি, তবে সেই কৃতকার্যতার উৎসাহে পরবৎসরের কনগ্রেস আপনি সজীব হইয়া উঠিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কাজের উল্লেখ করিতে পারি। বোম্বাইয়ের পার্সি মহাত্মা শ্রীযুক্ত টাটা ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানপরীক্ষাশালায় জন্ত প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন তাহার সহিত সমস্ত ভারতের যোগসাধন করা কেবল কনগ্রেসের দ্বারা কোনো বিশ্ভাব্যত-সম্মিলনীসভার দ্বারাই সাধ্য।

উক্ত পরীক্ষাশালা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টাটার অর্থসাহায্য দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশ হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া যদি টাটাসাহেবের এই প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন তবে কনগ্রেসের জয় সার্থক হয়।

এইরূপ শিল্প বাণিজ্য, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়েই আমাদের সুগভীর দৈনন্দিন আমাদের দেশের লোকের মুখ তাকাইয়া আছে। সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া তিনটে দিনের একটা দিনও সে-কথার কোনো উল্লেখ হয় না,—এমন মহৎ সুযোগ কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির রুদ্ধ লোহদ্বারের উপর মাথা কুটিয়াই কাটিয়া যায়, ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহের কারণ কী আছে জানি না।

ফ্রান্স জার্মানি ইটালি প্রভৃতি যুরোপীয় দেশসকল স্বরাজ্যের বাণিজ্য-উন্নতি সাধনের জন্ত যে-সকল শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন তাহা যদি সে-সকল দেশের পক্ষের অত্যাশঙ্কক হয় তবে আমাদের দেশে তাহার যে বিরূপ প্রয়োজন, বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের এ অভাব কে পূরণ করিবে? রাজা যদি নাই করে তবে কি আমরা বসিয়া থাকিব এবং আবেদন করিব?

আমাদের রাজা বিদেশী; তাঁহারা যে রাজকর সংগ্রহ করেন তাহা মাহিনাপত্র, পেনশন, কম্পেনসেশন, যুদ্ধবিগ্রহ, শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুবিয়া যায়। সে-সমস্ত বিস্তর বাজেখরচ খাটো করিয়া দেশের ধন দেশের স্বামী হিন্তসাধনে ব্যয় করিবার জন্ত কনগ্রেস বছরবৎসর চাঁৎকার করিলেও রাজার বিরুদ্ধ মর্জি হইবে তাহা কেহই বলিতে

পারে না। সেই অনিশ্চিত আশ্বাসে সুদীর্ঘ কাল বক্তৃতাদি না করিয়া আমরা যদি সমস্ত ভারতের সমবেত চেষ্টায় একটা উপযুক্ত শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি তবে তাহাতেই কনগ্রেসের গৌরব বাড়িবে। বিদেশী রাজা নানাকারণে অনেক কাজ করিতে পারে না, বিদেশী কনগ্রেস সেই কাজগুলি সম্পন্ন করুক। আমাদের রাজা যাহা পারে না বা করে না, কনগ্রেস তাহাই নিজের সাধ্যমত করিবে ইহাই তাহার ব্রত হউক। বিদেশী তো আমাদের অনেক করিয়াছে এখন বিদেশী কী করিতে পারে তাহাই দেখাইবার সময় আসিয়াছে,—বৎসর বৎসর এখন আর সেই অভ্যস্ত পুরাতন ভিকার বুলি হতাশাস-কণ্ঠে পরের ভাষায় পরের দ্বারে বোষণা করিয়া লেশমাত্র সুখ হয় না।

যেমন আত্মীয়ের মৃত্যুদর্শনে আমাদের মনে একটা সুগভীর বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সেই বৈরাগ্য আমাদের মনে ক্ষণকালের জন্তও মোহবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়—সম্প্রতি আমাদের মনে সেইরূপ একটা রাজনৈতিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমরা যখন অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলাম সেই সময় হঠাৎ আমাদের গবর্নমেন্টের ধ্বংস চোরা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম আমরা তাঁহাদের আপনার নহি। এবং তৎপূর্বে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে, রাজ্যের বিধিব্যবস্থা সমস্তই পাকা, কিন্তু হঠাৎ যখন দেখিলাম তাহাও বিধাবিনীর্ণ হইল, এবং তাহার মধ্যে দুই নাটু-ভ্রাতা কোথায় তলাইয়া গেলেন, তখন রাজবিধানের প্রতি আমাদের ঘে একটা অটল শ্রদ্ধা ও নির্ভর এতদিন লালিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অপঘাতমুহূর্ত্ত হইল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আশ্রয়পাশ্বে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের মনে একটা সুগভীর রাজনৈতিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, মোহ ছুটিয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম নিজের চেষ্টায় যতটুকু হয় তাহারই উপর যথার্থ স্থায়ী নির্ভর।

এই বৈরাগ্য এই চৈতন্য পরম হিতকর। ইহাতে আমাদের যথার্থ অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি এবং আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা নিজের দিকে কিরিয়া আসে। ভিক্ষাবৃত্তির অনিশ্চিত আশ্বাসের প্রতি একান্ত দৃষ্টিকার জন্মে। কিন্তু সেদিনের কঠিন শিক্ষা আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই যেন ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে-শিক্ষা ভুলিবার নয়; অন্তত দেশের দুই-চার জনের মনেও তাহা মুদ্রিত থাকিবে; এবং সেই শিক্ষা কনগ্রেস ও কনকারেন্সকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই দিক্‌কৃত ভিক্ষাবৃত্তির অনন্ত লাঞ্ছনার পথ হইতে স্বচেষ্টায় স্বকর্ষসাধনের দিকে নিঃসন্দেহ কিরাইয়া আনিবে। তাহা যদি না আনিতে পারে তবে একদা এই কনগ্রেসকে লজ্জা, নৈরাশ্র ও অপমৃত্যুর হাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এক সম্প্রদায় জমিদারের মুখপাত্র হইয়া কনগ্রেসপক্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, দেশের যাহারা “গাচারাল লোভার” বা স্বাভাবিক অধিনেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে।

রাজত্ব কাহার হইবে ইহা লইয়া অনেক দেশে অনেক লড়াই হইয়া গিয়াছে। কুরুপাণ্ডবের মধ্যেও একটা খুব বড়ো রকম তর্ক হইয়াছিল যে, রাজ্যো কাহার স্বাভাবিক অধিকার। উভয় পক্ষ হইতে যে-সকল সূক্ষ্ম এবং স্থূল, তীক্ষ্ণ এবং গুরুতর মারাত্মক যুক্তি প্রয়োগ হইয়াছিল মহাভারতে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দাদা ধৃতরাষ্ট্র বড়ো বটে কিন্তু তিনি অন্ধ, সেইজন্য কনিষ্ঠবংশে রাজ্যের ভার পড়িয়াছিল। আমাদের জমিদার-কৌরবপক্ষীয়ের যদি স্বাভাবিক অন্ধতা না থাকিত তবে কনিষ্ঠ কনগ্রেস-পাণ্ডবগণের নেতৃত্ব-সিংহাসনে দাবি থাকিত না।

যাহা হউক, গৃহবিবাদে মঙ্গল নাই। কতকটা সুখের বিষয় এই যে, এ-বিবাদ একটা মৌখিক অভিনয়মাত্র। মুখুজ্যেমহাশয় মনে মনে বেশ জানেন যে, বাঁড়ুজ্যে-মহাশয় কম লোক নহেন কিন্তু সরকারের কাছে সে-কথা বলিয়া সুবিধা নাই। তাঁহাদের বলিতে হয়, হজুরেরা যে কনগ্রেসকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না আমাদেরও ঠিক সেই দশা।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, গান্ধারী সেই আক্ষেপে নিজের চোখে কাপড় বাঁধিতেন, কারণ তিনি সাক্ষী ছিলেন। গবর্নেন্ট যদি কাহারও প্রতি অন্ধ হন, তবে মুখুজ্যে মহাশয়ের কর্তব্য চোখে কাপড় বাঁধা, কারণ তাঁহারা খয়ের থা।

কেবল রাজভক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটু পাকা চালও আছে। উপরওআলা রাজপুরুষেরা আজকাল যখন স্পষ্টত নূতন জনসভাসকলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন এ-কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সরকার যদি মুখুজ্যেমহাশয়দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাঁড়ুজ্যেমহাশয়রা আর এত বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না। আমরা স্বভাবতই বড়োলোক, তোমরাও আমাদেরই বড়ো করিয়া রাখো, কনগ্রেস আপনি ছোটো হইয়া বাইবে। আমরা স্বীকৃত আছি বটে কিন্তু আরও স্বীকৃত হইতে পারি তোমরা আর-একটু ফুঁ দাও যদি। তাহা হইলে ওই চাকরিবঞ্চিত নৈরাশ্রপীড়িত ক্লান্ত কনগ্রেসটাকে আরও অনেকটা ক্ষীণ দেখিতে হয়।

কনগ্রেসকে নির্বাসনে দিয়া নিজেরা পরিপুষ্ট হইবার জন্য জমিদার-সমাজ এ একটা দ্যূতক্রীড়ার সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সময় বুঝিয়া যে অক্ষ কেলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অকপট নহে ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। এইবার পৌরাণিক ভুলনাট্যকে ধতম করিয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করি।

প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা কে? উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, “লীডার” ইংরেজি শব্দ যদিচ আমাদের অভ্যস্ত এবং তাহার বাংলা অনুবাদও সুকঠিন নহে, এবং সৈন্তগণের নেতা, ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নেতৃত্বের ভাব আমাদের নিকট পরিচিত বলিয়া জনসাধারণের নেতা শব্দটা আমাদের কানে ধট করিয়া বাজে না কিন্তু জিনিসটা এখানকার নহে। এই নেতৃত্বের কোনো ঐতিহাসিক নজির নাই সুতরাং কাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ চিরপ্রথাসংগত, তাহা হঠাৎ বলা যায় না।

প্রথম কথা এই যে, জনসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ এ-দেশে ছিল না। গ্রাম ছিল, পল্লী ছিল, পরিবার ছিল, পঞ্চায়ত ছিল, মোড়ল ছিল, কর্তা ছিল, কিন্তু জনসাধারণ ছিল না এবং তাহার অধিনেতা আরও দুর্লভ ছিল।

এক্ষেণে, ইংরেজের দৃষ্টান্ত, শিক্ষা এবং একেশ্বর রাজত্বের বিপুল পক্ষপুষ্টের তা লাগিয়া জনসাধারণ যদি ছুটিয়া উঠিবার উপক্রম করে, সে আপনার মাথা আপনি লইয়া আসিবে, গবর্নেন্ট জোর করিয়া মুখ্যজ্যোমশারদিককে তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিলে আর-কিছু না হউক তাহা তাঁহাদের কথিতমতো স্ভাচারাল অর্থাৎ স্বাভাবিক হইবে না।

এমন কি জনসাধারণ নামক বিরাট বিহঙ্গমের মুণ্ডটাই সব-প্রথমে চক্ষুদ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভিন্ন বিদারণ করিয়া আলোকপথে দেখা দেয়, পুচ্ছ-অংশ পরে বাহির হইয়া পড়ে। আমরা এখন সেই অবস্থায় আছি। জনসাধারণের মুণ্ড বাঁহারা তাঁহারা ই সম্প্রতি বহুকলরবসহকারে প্রকাশমান, তাঁহাদেরই চক্ষুঃশূল মুক্তিপথের কঠিন আবরণ অপসারণে প্রবৃত্ত, স্রবশিষ্ট অংশ এখনও বাধাধারা গুপ্ত। মুখ্যজ্যোমশারদেরা যে সেই পুচ্ছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন তাহা না হইতে পারে। তাঁহারা জনসাধারণ নহেন, তাঁহারা বিশিষ্টসাধারণ, মাটিতে তাঁহাদের বাসা নহে, উচ্চ শাখায় তাঁহাদের নীড়—কিন্তু তাঁহারা বতই মহৎ হউন না কেন জনসাধারণের মুখপাত্র নহেন।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতেই হয় বাঁহারা হস্তে ক্ষমতা অধিক অনেক লোক তাঁহার অঙ্গবর্তী হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এবং দেশাচারে ক্ষমতা এমনি ধণ ধণ বিভাগ করিয়া দিয়াছে যে, যতবড়োই লোক হউন তাঁহার ক্ষমতা পদে পদে সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে জমিদার জমিদারমাজ, তিনি জুলুম করিয়া

স্বাধীনতা আদায় করিতে পারেন কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। তাঁহারই একজন দীন প্রজা সমাজে হয়তো তাঁহা অপেক্ষা প্রতাপশালী। এইজন্য জাতি ও সমাজ লইয়া রাজা-মহারাজাকেও হিমসিম খাইতে হয়।

ইংলণ্ডে ইহা সম্ভবপর নহে। একজন ইংরেজ বড়ো জমিদার তাঁহার কোনো দীন প্রজা অপেক্ষা সমাজে খাটো হইতে পারেন না। তাঁহার ধনসম্পদ ও ক্ষমতা, সমাজে তাঁহাকে উচ্চাসন দেয়। তাঁহার অধীনস্থ কোনো কাম্বার (বাংলার জোতদারের সমতুল্য ব্যক্তি) সোসাইটিতে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব সে-স্থলে একজন ইংরেজ বড়ো জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে সর্বতোভাবে মর্যাদালাভ করিতে পারেন।

কেবল তাহাই নহে। ইংলণ্ডে উপাধিধারী প্রাচীন জমিদারবংশ আছে। শুনা যায় এই সকল প্রাচীন উপাধিধারীর প্রতি মুগ্ধভাব ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহার কারণ, এই সকল লর্ড প্রভৃতি উপাধির সহিত অধিনায়কতার ভাব দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল। পূর্ব-ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ শাস্তিস্থাপন এবং সর্বপ্রকার সাধারণকার্যের নেতৃত্বে ইহারাই এককালে প্রধান ছিলেন। এখন যদিচ ইহাদের কার্যকারিতা হ্রাস হইয়া ইহারা অনেকটা অলংকারের কাজ করিতেছেন তথাপি কাল-পরম্পরগত সেই সম্মানপ্রবাহ তাঁহাদিগকে সমাজের অগ্রভাগে বহন করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে তাহার অমূল্য আদর্শ ব্রাহ্মণমণ্ডলী। কিন্তু শ্রান্ত উপমা খাটাইয়া আমাদের জমিদারবর্গ আপনাদিগকে ইংলণ্ডের সেই লর্ডপ্রেনীর সহিত তুলনীয় জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গি অমূল্যবোধেরও চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা অ্যারিস্টক্রেসিটাস।

অ্যারিস্টক্রেসিটাস শব্দের বাংলাই পাওয়া যায় না। প্রাচীন “অভিজাত” শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত। “কুলীন” শব্দ সর্বজনবিদিত। কিন্তু কৌলীন্য বিলাতিভাবের অ্যারিস্টক্রেসিটাসি নহে।

আমাদের দেশে ধনের সম্মান যুরোপের মতই অধিক নহে। এমন কি, যে-সকল জাতির মধ্যে ধনী মহাজন বিস্তর আছে তাহার সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে নাই।

আমাদের দেশে রাজা-রায়বাহাদুরদের দেখিয়াও লোকে অত্যন্ত অভিজ্ঞত হইয়া পড়ে না। তাহার একটা কারণ এই যে, এই সকল পদবীদ্বারা উপাধিধারিগণ সমাজে এক ইচ্ছা উপরে উঠিতে পারেন না। বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে যাহাদের সহিত তাঁহাদের আদানপ্রদান চলে তাহাদের কেহ হয়তো স্বাক্ষর দলে বেহালা স্বাক্ষর,

এমন কি, কেহ হয়তো কনগ্রেসের উপাধিহীন প্রতিনিধি। ইংলণ্ডীয় সমাজে বাহারা উপরকার দশজন্য বলিয়া বিখ্যাত নিচেকার দশলক্ষের সহিত তাঁহাদের ব্যবধান দুর্গম—এই অস্ত্র সেই দশলক্ষের ভক্তি সেই রহস্তাবৃত দশজন্যর দিকে ধাবিত হইতে থাকে। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টের খেতাব দশলক্ষের সন্নিধান হইতে সেই দশজন্যকে কাটাগাছের মতো বেড়িয়া রাখিতে পারে নাই। বৈবাহিক মহাশয়ের আভিজাত্যের বাহ চারিদিক হইতেই ভেদ করিয়া দেন।

আবার রাজা-রায়বাহাদুরবংশের শাখাপ্রশাখা আত্মীয়কূটুম্ব ভাগিনের-ভাতৃপুত্র খুড়তুত-মাসতুত ভাইরা মিলিয়া উচ্চ বংশকে বংশমর্যাদার বহুদূর বাহিরে ব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বটের উচ্চশাখা যেমন তাহার নিম্নগামী অসংখ্য কোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না, যতই অস্ত্রুত এবং যতই গুরুতর হউক তাহাদিগকে রাজিদিন ঘনিষ্ঠ-ভাবে বহন করিতে থাকে তেমনি আমাদের দেশে নিম্নগামী দূরতম এবং নীনতম কূটুম্বজনকেও ত্যাগ করিবার জো নাই ;—যদি বা তাহাদিগকে অন্ন হইতে বঞ্চিত করা যায় তথাপি সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মে লৌকিকাচারে তাহাদের স্পর্শক্রামকতা হইতে আপন আভিজাত্যকে বাঁচাইয়া চলিবার কোনো উপায় নাই। এইরূপে উচ্চ পদবী বাহিরকে ভিতর হইতে এবং ভিতরকে বাহির হইতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সাধারণ এবং অসাধারণের মার্মধানে মায়াগতি কিছুতেই ঠিকে না।

আমাদের দেশে কঠিন জাতিভেদ যেমন একদিকে ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান স্থাপন করিয়াছে তেমনি অন্তরিকে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, রাজটিকা-লাহিত ও খেতাববঞ্চিতদিগকে সমান করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বংশের একটা মোহ আছে বটে। কিন্তু বর্তমান ধনী জমিদারদের মধ্যে নাটোর প্রভৃতি দুই-এক ঘর ছাড়া প্রাচীন বংশ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে যেদ্রুপ সম্পত্তিবিভাগ তাহাতে ধনগৌরবকে প্রাচীন করিয়া তোলা একপ্রকার অসাধ্য ; দায়ভাগের শতরীপ্রহারে সে দেখিতে দেখিতে শতধা বিভক্ত হইয়া অকালে পঞ্চত এমন কি, পঞ্চাধিকত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই তো গেল গৌরবের কথা। কিন্তু আমাদের দেশে ধনের গৌরব অস্ত্রাপি যথেষ্ট আগে নাই বটে ভবু তাহার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। অতএব বাহাদের হাতে ধন আছে তাঁহারা প্রয়োজনসাধন করিয়া সাধারণের আত্মগত্য আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে নেতা হইবার সেই একটা সোনার রাস্তা আছে।

কিন্তু আমাদের অভিজাতগণ বাহাকে রাজপথ জ্ঞান করেন তাহা রাজা হইবার পথ ;—অস্ত্র পথের শেষে দেশের কল্যাণ ও সাধারণের কলর ধাকিতে পারে কিন্তু

খেতাবের খনি নাই, এইজন্ত সে-পথে বড়োলোকের জুড়িগাড়ি প্রায় দেখা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা সকলের প্রতীত হইবে। সার আলফ্রেড ক্রক্‌ট হরতো ভালো লোক এবং বড়োলোক, কিন্তু বিত্তাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়োলোক, এবং সকলের বেশি, তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রক্‌ট সাহেব ভারত ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণে ধনিগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, আর, বিত্তাসাগর ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না! ইহারা দেশের স্ভাচারাল লীডর! আমাদের স্বাভাবিক চালক! ইহারা কোন্‌দিকে আমাদের গকে চালনা করিবেন? আমাদের দেশের মহোচ্চ মহদাশ্রয়দিগের দিকে নহে, ইংরেজ মেজো-সাহেব সেজোসাহেব ছোটোসাহেবের দিকে; আমাদের দীনহীন দেশের সহস্র অভাব মোচনের দিকে নহে, সাহেবের নিকুঞ্জবনে গড়ের বাস্তের শ্রীমুখিসাধনের দিকে? সাহেব রাজকর্মচারীরা বিলাতে চলিয়া গেলে দেশীয় ধনিগণ তাঁহাদের প্রতিমা স্থাপন করিবেন ইহাতে আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু দেশীয় পূজাগণের জন্তও যদি সেই পরিমাণে কিছু ত্যাগস্বীকার করেন তবে দেশের নায়কত্বে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দাবি থাকে।

সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব-সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবী লাভের জন্ত কিরূপ চেষ্টা করিতেন ও কোনো চেষ্টা করিতেন কিনা তাহা আমরা ভালোরূপ জানি না। তখন নবাব-দরবারের প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত, অতএব তাহা লাভের জন্ত অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য,— অর্থাৎ দিঘি খনন, মন্দির স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ, এই সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভকে নহে। দেশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই সকল হিতকার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না,—ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না। রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহারা তৎকালীন নবাবদত্ত বিশেষ অলঙ্কারের দ্বারা উজ্জ্বল নহেন, ইহারা বিচিত্র কীর্তিদ্বারা লোকসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আপন অক্ষয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তখন জনগণের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে খেতাব লাভ করিতেন, তাহা আধুনিক দেশী বিলাতি সর্বপ্রকার খেতাবের অপেক্ষা অনেক উচ্চ; তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল :

আর্তানাম্ ইহ অন্তনাম্ আতিছেদং করোতি যঃ

শম্ভচক্ৰগদাহীনো বিভূষঃ পরমেশ্বরঃ।

কীর্তিস্থাপনের দ্বারা লোকহিতসাধন অথবা সাধারণের নিকট ধ্যাতিলাভ এখনকার ধনিগণের নিকট তেমন স্পৃহণীয় নহে।

আরব্য উপমহাদেশে সিংহবাদের কাহিনীতে পড়া যায় যে, চূষকশৈলের আকর্ষণে দূর হইতে জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেক ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিত, তেমনি আমাদের যে-সকল ধনী জমিদার আপন আপন কুখণ্ডের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন, দানধ্যান ক্রিয়াকলাপ এবং লোকহিতকর বিচিত্র স্থায়ী কীর্তিদ্বারা এই জীব দেশটাকে একপ্রকার জুড়িয়া রাখিয়া বহুলোকবহনকার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, প্রবল ইংরেজ রাজ্যের সমুদ্র চূষকশৈল অলক্ষ্যে অনায়াসে তাঁহাদিগকে দেশের লোকের নিকট হইতে ছিঁড়িয়া যেন একমাত্র নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। সমস্ত পূজা-অর্চনা দান-দক্ষিণা সাহেবের অভিযুক্ত, সমস্ত ধ্যাতিপ্রতিপত্তি সম্মান-সমাদর সাহেবের হস্ত হইতে। সেকালে রাজ্যের আকর্ষণ এবং স্বদেশী সাধারণের আকর্ষণ অন্তত সমান ছিল—নবাব-বাদশারা আমাদের ধনী জমিদারগণকে দেশের কাছ হইতে এমন করিয়া টানিয়া গ্রাস করিতে পারে নাই; কর্তব্য-অকর্তব্যের আদর্শ, স্তুতিনিন্দার চরম দণ্ড-পুরস্কার বিধান দেশের লোকের হাতে ছিল।

অন্তএব দেখা যাইতেছে, সেকালে বিশিষ্ট ব্যক্তির সর্বসাধারণের সহিত যে হিতাহুষ্ঠানস্বত্বে বদ্ধ ছিলেন একালে তাহাও নাই, আবার নিজের মধ্যে একটা অভিজাতমণ্ডলীবদ্ধন করিয়া সম্প্রদায়গত মহত্বকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষণ ও পোষণ, তাহারও সম্ভাবনা নাই। ইহারা নিজগোঁরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইহারা বিলাতের লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইহারা বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মত ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন; ইহারা কুয়াগুলতার ন্যায় একমাত্র গবর্মেণ্টের আশ্রয়শষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন,—তুলিয়া যান যে সেই সংকীর্ণ রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুলাসমাজের ধর্মতা শ্রেয় এবং তুণসমাজের নম্রতা শোভন।

পুরাকালের বড়ো জমিদারগণ রাস্তাঘাট করিয়া সাধারণের অভাব মোচন, যাত্রাগান প্রভৃতি উৎসবের দ্বারা সাধারণের আমোদ বিধান এবং গুণী, পণ্ডিত ও কবিদের প্রতিপালন দ্বারা দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণ ও পালন করিতেন। তাঁহারা ই আমাদের দেশে দানশীলতার ও সমাজহিতৈষ্যতার উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। শুভাহুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ত্যাগস্বীকারে পরাধুখতা যে লক্ষ্যকর তাহা তাঁহারা ই দেশের ক্ষয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অঙ্গুলারে কেবল রাজ্যের মুখ না চাহিয়া,

খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণপালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।

যখন আমাদের রাজা বিদেশী, এবং তাঁহাদের রুচি, ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র তখন দেশী ভাষা ও সাহিত্যের অবহেলা অবশ্যস্বাভাবিক। যাহারা জীবিকাসংগ্রামে প্রবৃত্ত, বাংলা ভাষার দিকে তাকাইবার সময় তাঁহাদের নাই। সর্বত্রই দেশের ধনিগণ স্বদেশীয় তরুণ সাহিত্যের পালনকর্তা। আমাদের বিদেশী-শাসিত দেশে সাহিত্যের পক্ষে ধনীদিগের সহায়তা বিশেষ আবশ্যিক।

কিন্তু মুখ্য জমিদারগণ, জমিদার সভার প্রধান প্রতিনিধিবর্গ, ইংরেজি লেখেন, ইংরেজি লেখেন, ইংরেজি বলেন। পিতাকেও চিঠি লিখিতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন ইংলণ্ডের অভিজাতবর্গের মতো আমরা রক্ষণশীল, কিন্তু মাতৃভাষাকেও তাঁহারা রক্ষা করেন না। দেশের জনসাধারণের ন্যায় দেশের ভাষাও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ নহে।

তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি,—এমন কিছুতে তাঁহাদের উৎসাহ নাই রাজার নিকট যাহার কোনোপ্রকার আদর না থাকে,—যাহা কেবলমাত্র দেশের।

দেশীয় রুচি এবং শিল্প এখনও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের আদর পায় কিন্তু তাহাও ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিলাতি রুচির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি পণ্য তাঁহাদের গৃহ হইতে দেশের শিল্পকে অবমাননা সহকারে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে।

সংক্ষেপত, এ-দেশে পূর্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না,—তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছন্দ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুচি তাঁহারা দিতেছেন প্রস্তর,—বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ, তাহার বিচ্ছিন্নতা, তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর তাঁহারা স্বদেশ-প্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাবাণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।

সাহেবের জন্ত তাঁহারা অনেক করেন কিন্তু সাহেবেরা চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগকে দেশীয় সাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা করিতে পারিবেন না। কারণ ইংরেজ রাজা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন না। যদি তাঁহারা আপন পুরাতন উচ্চ-স্থান অধিকার করিতে চাহেন তবে গবর্ণমেন্ট-প্রাসাদের গম্বুজটার দিকে অহরহ উর্ধ্বমুখ না তাকাইয়া নিম্নে একবার দেশের দিকে সাধারণের দিকে মুখ ঝরাইতে হইবে।

অপরপক্ষের কথা

ভাঙ্গমাসের ভারতীতে “মুখ্যো বনাম বাঙাল্যো” প্রবন্ধের লেখক বাঙাল্যোমশারদের হইয়া যে ওকালতি করিয়াছেন, তাহা পক্ষপাতবিহীন নহে। ইংরেজ-প্রসাদবুদ্ধি উপাধিভিক্ষুদের পক্ষে আমি কোনো কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু লেখক অন্তর্পক্ষীয়দের প্রতি যে-সমস্ত গুণের আরোপ করিয়াছেন তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই।

এ-কথা সত্য হইতে পারে এখনকার জমিদারবর্গ রাজপুরুষদের অত্যন্ত “জ্ঞাওটো” হইয়া পড়িয়াছেন, দেশের লোকের দিকে তাঁহারা তাকান না। স্বদেশীর নিকট হইতে খ্যাতিলাভের জন্য এবং স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক বদান্ততাবশত পুরাকালের জমিদারগণ যে-সকল কীর্তিকলাপ স্থাপন করিতেন, এখনকার জমিদারগণ তাহাতে উৎসাহ বোধ করেন না।

কেন করেন না? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাহার কতকটা হেতু দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজের প্রভাব আমাদের দেশে এত অধিক প্রবল হইয়াছে যে, তাহা সকল প্রভাবকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে আমরা গণ্য জ্ঞান করি না। দেশের লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার কোনো স্বাদ নাই।

মুসলমানদের আমলে আমরা স্বদেশকে তুচ্ছ বোধ করিতাম না। কারণ, বিজেতার আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদেরও নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ছিল। অন্তত আমাদের উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল না।

কিন্তু ইংরেজরাজার সঙ্গে আমাদের প্রভেদ সর্ববিষয়ে এত অত্যধিক, তাহাদের বুদ্ধিবল স্বতন্ত্র বিলাসবিত্তি সর্বদাই আমাদের পক্ষে এত চুরাস্ত বলিয়া বোধ হয় যে, অলঙ্কিতভাবে আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

যে অনিবার্ধ শ্রদ্ধার অভাবে ইংরেজ অনেক সময় আমাদের প্রতি সদ্বিচার করিতে পারে না, সেই শ্রদ্ধার অভাবে স্বদেশের লোকও আমাদের প্রতি বিমূখ হইয়াছে।

সেইজন্য আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোক এবং বিলাতকেরতরা সাধারণ লোকদের হইতে- আপনাদিগকে যেন স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। বাহু বেশভূষা-আচারব্যবহারেও তাঁহারা আপনাদের পার্থক্য কিছু যেন অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সহিত আহির করিয়া রাখিতে চান।

কতকটা পার্থক্য যে আপনিই হইয়া পড়ে সে-কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। ইংরেজি-শিক্ষিত এবং ইংরেজিতে অনিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে কেবল শিক্ষার তারতম্য

তাহা নহে শিক্ষার শ্রেণীভেদ বর্তমান। পরস্পরের বিশ্বাস, সংস্কার, ক্রটি এবং চিন্তা করিবার প্রণালী ভিন্নরকমের হইয়া যায়। এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি আপনাদিগকেই শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ এবং অপরসাধারণকে অশিক্ষিত এবং পশ্চাদ্বর্তী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

জ্ঞানস্পৃহা ও বসবোধ, বুদ্ধি এবং কল্পনা, সাহস ও বাহুবল, অধ্যবসায় ও আত্মসম্মানে যুরোপীয় জাতির যে এক মহোচ্চ আদর্শ ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মনে জাজ্জল্যমান করিয়া তুলিতেছে তাহার যদি কোনো আকর্ষণ না থাকিবে তবে আমাদের শিক্ষাকে ধিক্!

সেই আকর্ষণ আমাদের অনেক সময় ছদ্মবেশ এবং আত্মপ্রতারণায় লইয়া যায়। কেবল ইংরেজি শিখিয়াই আমরা যেন ইংরেজের মহত্ত্বকে কতকটা আপনার বলিয়া মনে করি। এবং যাহারা ইংরেজি শেষে নাই তাহাদিগকে কতকটা বাহিরের লোকের মতো করিয়া দেখি। ইংরেজের মহত্ত্ব যে ঐতিহাসিক, তাহা যে বংশপরম্পরাগত, কর্মগত, চরিত্রগত,—ইংরেজের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান যে সেই ইতিহাস সেই চরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা যে শুদ্ধমাত্র স্কুলে অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পাস হইতে নহে ইহা আমরা চোখ বুজিয়া তুলিতে ইচ্ছা করি। এবং ইংরেজের স্কুলে পড়িয়াছি বলিয়াই আমরা নিজেকে ইংরেজশ্রেণীয় জ্ঞান করি।

এইরূপ ইংরেজের টানে দেশ হইতে পৃথক হইয়া যাইবার যে ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহা কোনো এক পক্ষের মধ্যে বদ্ধ নহে; তাহা নানা আকারে নানা দিক হইতে প্রকাশ পায়। মুখ্যজ্যোমশায় এবং বীড়ুজ্যোমশায় কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

আজকাল জমিদারবর্গ ইংরেজের মুখ না তাকাইয়া উপাধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া দেশহিতকর কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান না—দেশের লোকের স্বতিনিষ্ঠা তাহাদের কাছে এতই ক্ষুদ্র হইয়া গেছে।

তেমনি আমাদের দেশে বাহারা জননায়ক বলিয়া সর্বদা সম্রাটের উপরে আরোহণ করেন তাহাদেরও ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না। বরঞ্চ আমাদের জমিদারদিগকে দেখিতে শুনিতে ঠিক আমাদের দেশের লোকের মতো, কিন্তু আমাদের জননায়কদের অনেকেই যে-দেশের মুকুনি বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করেন সে-দেশকে আচারে ব্যবহারে জীবনযাত্রায় অহরহ অপমানিত করেন। ইংরেজরাজকর্তৃক জমিদারদের যদি অর্থগ্রাস হইয়া থাকে ইহাদের একেবারে পূর্ণগ্রাস।

জমিদারগণ দেশের জন্ত যাহা করেন তাহা গবর্ণমেন্টের মুখ তাকাইয়া, ইহার বাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাবা ইংরেজি, তাহার প্রণালী

ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে। ইংরেজ-দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে ইহারা আপনা-
দিককে প্রাণ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না।

এই স্থলে আমাদের কোনো বন্ধুর লেখা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমরা
উদ্ধৃত করি।

“বর্গীয় জুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশপ্রেমের বিষয় অনেকেই অবগত
আছেন। দুই-তিন বার কনগ্রেস হইবার পর একজন ভ্রাতৃলোক তাঁহাকে কনগ্রেস
সম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, ‘ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ ; এই
মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের মধ্যে যদি সমস্ত দেশ মিলিত
হইতে পারে তাহা হইলে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান কল্পনা করিতে পারি বটে,
কিন্তু বর্তমান কনগ্রেসওআলাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না তাহা
নিশ্চয় বলা যায়। ইহাদের উত্তম-আলোচনা-আন্দোলনের ফলে চাই কি আমাদের
অনেক অভাব-অবিচার দূর হইতে পারে কিন্তু রাজার নিকট সুবিচারপ্রাপ্তি
কিংবা দুই-এক স্থলে রাজার সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তিই যদি কনগ্রেসের
লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কনগ্রেসের উদ্দেশ্য যে অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী
তাহা বলিতে বাধ্য হইব। কনগ্রেসওআলারা যদি সুসজ্জিত পট্টাবাসের পরিবর্তে
হোগলার ঢালা, চেয়ারের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাদুর, পেটলুনের পরিবর্তে ধূতি,
এবং ইংরেজির পরিবর্তে ভারতবর্ষীয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হইয়েন
তাহা হইলে বর্তমান কনগ্রেস দ্বারা দেশের কোনো স্থায়ী উপকার সম্ভবপর নহে।”

মুখে মুখে কথা বিকৃত হয় এবং জুদেববাবু ঠিক কী-কথাটা বলিয়াছিলেন তাহা
জানি না। আমাদের মনে উদ্বেগ বাহাই থাক, তাহা যতই সংকীর্ণ হউক কিন্তু
অহুত্থান যদি বৃহৎ হয় তবে উদ্বেগও আপনি বাড়িয়া চলে। সূচির মুখে নুতা
পর্যন্তই যদি বাতি জালি তবে সেই বাতিতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া উঠে।
তেমনি যে-উদ্বেগেই কনগ্রেস হউক তাহা যতাবতই আপন উদ্বেগকে বহুদূরে ছাড়াইয়া
গিয়া দেশের বৃহৎ মঙ্গলের অবতারণা করিবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু
জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে জুদেববাবু যে-সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও
আমাদের ভাবিবার কথা। আমরা যাছ ধরিতে চাই কিন্তু জলের সহিত
সংস্রব রাখিতে চাই না,—আমরা দেশের হিত করিব কিন্তু দেশকে আমরা স্পর্শ
করিব না !

দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয় ? দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া।
ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং জাতীয় বস্ত্র হইতে আমাদের দিককে

দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে বাওরা নিতান্তই অসংগত।

কিন্তু, ভিন্নভাষী ভারতকে এক করিবার জন্য কনগ্রেসের ভাষা ইংরেজি হওয়া উচিত এমন তর্ক বাঁহারা এ-স্থলে উত্থাপন করিবেন তাঁহারা আমার কথা সম্পূর্ণ বৃথিতে পারেন নাই। যেখানে ইংরেজি বলা দরকার সেখানে অবশ্য ইংরেজি বলিবে,—কিন্তু তোমার ভাষাটা কী? তোমার লেখাপড়া ধ্যানধারণা মস্তস্তম্ভ সমস্তই ইংরেজিতে কি না? জনসভার বাহিরে দেশের সহিত তুমি কিরূপ সংশ্রব রাখিয়া চল? ইংরেজি ভাষায় যেটুকু কর্তব্য তাহা যেন সাধন করিলে কিন্তু দেশী ভাষায় যে-কর্তব্যপুঞ্জ পড়িয়া আছে, যাহা কাগজে রিপোর্টের জন্ত নহে, যাহা সমুদ্রপারে উদ্বেলিত হইবার জন্ত নহে, যাহার ফলাফল যাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শুদ্ধমাত্র আমাদের দেশী মণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ তাহাতে হাত দিতে তোমার মন উঠে? গবর্নমেন্টের সম্মান বাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধির আশ্রয়দণ্ড তাঁহাদিগকে তোমরা নিন্দা কর, কিন্তু ইংরেজ-করতালির এলাকার বাহিরে বাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধি পদনিক্ষেপ করে না তাঁহারাই কি 'প্রচুর সম্মানের অধিকারী'!

কনগ্রেস যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের মিলনসভা, কনকারেন্স তেমন সমস্ত বাংলার। সেই সমগ্র বাংলার মিলনক্ষেত্রে বাঙালির কী অভাব বাঙালির কী কর্তব্য সেও যদি আমরা ইংরেজি ভাষায় বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারি তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়? এই প্রমাণ হয় যে, দেশকে বাঁহারা চালনা করিতে চাহেন তাঁহারা, হয় দেশী ভাষা জানেন না, নয় কর্তব্যের ক্ষতি করিয়াও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের অভিমান চরিতার্থ হয় না।

অন্তএব ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যায় জমিদারের চরিত্রে যে-ঘৃণ চুকিয়াছে আমাদের জননায়কদের চরিত্রেও সেই ঘৃণ। ইংরেজের কৈশিকাকর্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে। ইংরেজকে বাদ দিলে আমাদের কর্তব্যে স্বাদ থাকে না, সম্মানে গৌরব থাকে না, বেশভূষায় মর্যাদা থাকে না; আমাদের দেশের লোকের খ্যাতি অপেক্ষা গবর্নমেন্টের খেতাব, আমাদের দেশের লোকের আশীর্বাদ অপেক্ষা বিলাতি কাগজের রিপোর্ট আমাদের কাছে শ্রেয়।

ইংরেজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরেজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়। বাঁহারা বদেশ অপেক্ষা আপনাকে অনেক উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন,

বীহারী স্বদেশের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে লজ্জাবোধ করেন তাঁহারও স্বদেশকে অহুগ্রহ করিয়া থাকেন স্বীকার করি; কিন্তু সেটুকু না করিয়া যদি তাঁহার নিজের দেশকে নিজের উপযুক্ত জ্ঞান করেন এবং নিজেকে স্বদেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদেরও আত্মসম্মান থাকে এবং দেশকেও সম্মান করা হয়।

১৩০৫

আলফা-কনসার্ভেটিভ

মুখ গোপন করিয়া কেবল পুচ্ছটুকু বাহির করিলে পরিচয়ের সুবিধা হয় না। যে বাঙালি পায়োনিয়রে পত্র লিখিয়া কেবল “আলফা-কনসার্ভেটিভ” বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কেমন করিয়া জানিব তিনি কে ?

জানিতে কৌতূহল হইতে পারে কারণ তিনি যে-সে লোক নহেন সবিনয়ে এমনতরো আভাস দিয়াছেন। তিনি না উকিল, না মোক্তার, না স্কুলমাস্টার।^১ অহো, তিনি এত মশু লোক ! তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় বড়ো হইতে হয় নাই; নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, এবং হয়তো অসম্ভব; যে ইংরেজি চিঠিখানা কাগজে ছাপা হইয়াছে সেও হয়তো বা তাঁহার নিজের রচনা নহে, হয়তো তাঁহার সেক্রেটারি লিখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য গবর্নমেন্ট-কালেক্টরের ভূতপূর্ব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার এত অবজ্ঞা এবং বর্তমান স্কুলভ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার এত বিদ্বেষ।

উকিল, স্কুলমাস্টার, এবং গবর্নমেন্ট কালেক্টরের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ শিক্ষিত সন্দেহ নাই, শিক্ষাই তাঁহাদের-প্রধান সম্মান এ-কথাও কবুল করিতে হয়; অতএব আলফা

১ “Have vakils, attorneys, pleaders, mukhtars, and schoolmasters a greater stake in the country than the zamindars ?”

২ “The self-elected delegates who make up that body (Congress) are lawyers, to whom notoriety means more fees, disappointed office-seekers, and ex-students from Government colleges, whose vanity is gratified by the honour—whatever may be its value—of being a Congress delegate. Their number is, I fear, likely to increase under the present system of practically free education.”

বলিতেছেন, যিক তাঁহাদিগকে। অতএব আলট্রা-কনসার্ভেটিভগণই দেশের স্বাভাবিক অধিনেতা,—কারণ, শিক্ষা বল, বুদ্ধি বল, অভিজ্ঞতা বল, আত্মনির্ভরই বল, কিছুতেই তাঁহাদের লেশমাত্র প্রয়োজন নাই—দেশেতে তাঁহাদের “স্টেঁক” গাড়া আছে।

তবে আমাদের এই আলট্রার এত সংকোচ কিসের? যদি ইনি উকিল না হন, যদি ইনি স্কুলমাস্টার অথবা স্কুলমাস্টারের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত কেহও না হন তবে কোন্ লক্ষ্যের অহুরোধে আপনার এতবড়ো নিষ্কলঙ্ক নামটা গোপন করিলেন? যদি তিনি জাত-সিংহই হন তবে শিকারের পূর্বে একবার গর্জনসহকারে নিজের নামটা ঘোষণা করিয়া দিলেন না কেন—দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় কালেজের কক্ষ হইতে আদালতের প্রাঙ্গণে, মুনিসিপাল সভা হইতে কনগ্রেসের পাণ্ডালে পর্যন্ত কম্পাষিত হইতে থাকিত।

যদি অবাধে নামটা প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে দেশের সমস্ত গণিতশাস্ত্রবিৎ উকিল, স্কুলমাস্টার ও গবর্নেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ যদি পাতিয়া আঁক পাড়িয়া একবার গণনা করিতে বসিত তাঁহার “নোবিলিটি” কতদিনকার, একবার মাপিয়া দেবিত হতভাগ্য দেশের বন্ধুস্বলে তাঁহার “স্টেঁক” কতদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

হায় বঙ্গদেশ, তোমার উচ্চতাবিহীন সমতল ভূমিতে “নোবিলিটি”, প্রাচীন আভিজাত্য টিকিতে পারে না। তোমার নানাস্রোতঃসংকুল পলিমাটিতে আজ যেখানে স্থল কাল সেখানে স্থল, আজ যেখানে গ্রাম কাল সেখানে নদী, আজ যিনি উকিল কাল তিনি জমিদার, বাণ বাহার জমিদার পুত্র তাহার স্কুলমাস্টারমাত্র, অস্ত যে “প্রজেক্ট সিস্টেম অফ প্র্যাকটিক্যালি ফ্রী এডুকেশন”কে অবজ্ঞা করে তাহারই পৌত্র বি.এ পাস পূর্বক বিবাহের হাটে উচ্চ দরে বিকাইয়া যায়।

বৌদ্ধ সাধু মশাটিকে মারিতেও কুণ্ঠিত হন পাছে সেই মশা তাঁহার কোনো পূজনীয় পূর্বপুরুষের নূতন সংস্কার হয়, পাছে হয়তো সেই বংশে অদূরভবিষ্যতে তিনিও জন্মলাভ করেন। আমাদের দেশেও বাঁহারা প্রভাতে জাগিয়া অকস্মাৎ আপনাদিগকে অ্যারিস্ট-ক্র্যাট বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা উকিল-মোক্তার-ই-স্কুলমাস্টারের প্রতি চপেটাঘাত উদ্ভত করিবার পূর্বে যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন যে, হয়তো তাঁহাদের অনতিদূরবর্তী পূজনীয় পূর্বপুরুষ উকিল, মোক্তার অথবা তদনুরূপ কেহ ছিলেন অথবা অনতিদূরবর্তী ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই “আত্মা বৈ” উকিল-মোক্তার হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল শিক্ষিত ও সুযোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি বধোচিত সন্মোচিত বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয়েরা অত্যন্ত স্তবী। তাঁহাদের গায়ে

কথা সহ্য না। সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁহাদের সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিল। অস্তায় করিয়াছিল কি জ্ঞায় করিয়াছিল তাহা অর্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসারভেটিভ মহাশয় বুদ্ধবুদ্ধ হইতে সরিয়া দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাহেবের নিকট সোহাগ লইতে গিয়াছেন। দুই বাহ মেলিয়া পায়োনিয়রের কোলের উপরে কাঁপাইয়া পড়িয়া বলিতেছেন, “দেশের আর-সকলে উকিল অ্যাটর্নি ইন্সলমান্টার এবং কালেক্‌জের ছাত্র, তাহারা শিক্ষিত, দেশের উপরে তাহাদের কোনো অধিকার নাই—বিশাল ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আমাদেরই করেকজনের খোঁটা গাড়া আছে, “We the ultra-conservatives” আমরা জমিদার, আমরা নোবিলিটি; কিন্তু সাহেব উহারা কেন আমাদেরকে ধারাপ কথা বলে।” আহা কী আদর! পায়োনিয়রের কোল হইতে ইংলিশ-মানের কোলে কত সাহায্য! একদিকে সোনার-গোট-পরা ফুটপুট তৈলচিহ্ন আলট্রা-কনসারভেটিভ প্রোট শিণ্ডি, অন্যদিকে কালো-কোঁটা-পরা গুপ্তহাস্তকুটিলমুখ রক্তবর্ণ ইংরেজ সম্পাদক,—অশ্রুপরিবিক্ত বাংসল্যের কী অপরাধ দৃষ্ট। কি সুপবিত্র স্নেহসম্মিলন।

আমাদের আলট্রা-কনসারভেটিভ কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে তাঁহাদের স্বদেশীয়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া পায়োনিয়রের বক্ষদেশে মুখ গোপন করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, “সাহেব এও কি হয়! তোমরা কি কেহ নও! কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটি কেবল দিশি লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল। আমরা যে-সম্প্রদায়ের লোক আমরা কি ইহা সহ্য করিতে পারি?”^১ তাঁহাকে এ-কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, তোমরা যে দশশালা বন্দোবস্তে দেশের কর্তা হইয়া উঠিয়াছ তাহাই বা চিরদিন থাকে কেন? ইংরেজ যে রক্তপাত দ্বারা দেশ জয় করিয়াছে এবং দেশ রক্ষা করিতেছে তাহা কি কেবল তোমাদের মতো অলস বিলাসীদের মুখে নিরাপদে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্ত? ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে পেনশন না দিয়া কেন এক-এক টুকরা জমিদারি দেওয়া হয় না? জীবনের অধিকাংশ কাল তাহারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গেলেন তাঁহারা কি বৃদ্ধবয়সে ইংলণ্ডের কোনো এক অধ্যাত বাসাবাড়িতে মরিতে বাইবেন? তাঁহাদের মুখ হইতে ভাষা লইয়া এ-কথা কি কেহ বলিতে পারে না যে, I do not think that any one will venture to seriously deny that the Permanent Settlement has proved a failure in this country? আমাদের আলট্রা-কনসারভেটিভ বেকপ-ভাবে দেশের মধ্যে খোঁটা গাড়িয়া তাঁহাদের জমিদারি শাসন করেন একজন ইংরেজ প্রভু কি তাহা অপেক্ষা ভালো শাসন করিতে পারে না? তাহার দ্বারা কি স্থানীয় স্বাস্থ্য, শস্ত, শিক্ষা ও শিল্প বর্তমান বন্দোবস্তের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি লাভ করিতে পারে না?

১ “Under the present system the municipality exists for the Native Commissioners, their friends and canvassers.”

এ-প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ পারোনিয়রের বক্ষস্থলে হেলিয়া ছলিয়া ঝিকিয়া চুরিয়া বলিবেন, পারে, অবশ্য পারে, তোমরা সাহেব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কিসের ? কিন্তু যে-অধিকার দিয়াছে সে কি কিরাইরা লইবে ?

হায় আলট্রা-কনসার্ভেটিভ, তুমি যন্তলোক এবং আমাদের উকিল-ইন্সলমাস্টারগণ তোমার সহিত তুলনীয় নহেন কিন্তু আমাদের সকলেরই অধিকার অতি সামান্য, এবং ইংরেজের কথার উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর। তোমারও কোনো জোর নাই, উকিল মোস্তারদেরও কোনো জোর নাই। যদি একটা অধিকার, একটা উন্নত আশ্বাসের কারণ আমাদের দান করিয়া আবার তাহা ইংরেজ কাড়িয়া লন তবে তোমরা “নোবিলিটি” বর্গই বা কী করিবে আর যাহারা স্ববুদ্ধিজীবী তাহারাই বা কী করিবেন ?

হে আলট্রা-কনসার্ভেটিভ, কংগ্রেসের শূন্য বাগ্মিতার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ এবং একটা পাকা কথা বলিয়াছ যে, কঠিন কার্যের দ্বারাই দেশের উন্নতি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আগামী শাসনকর্তা কার্জন সাহেব আসিয়া যদি তোমাদের দশশালা বন্দোবস্তটি কাড়িয়া অন্য দশজনের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেন তবে তোমারাই বা কী কঠিন কার্যে প্রবৃত্ত হও ? তোমরা কি তোমাদের লাঠিয়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া লড়াই কর, না, কংগ্রেসেরই মত বাগ্মিতা অবলম্বন কর ?

কংগ্রেস ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট যাহা চায় তাহা কেবলমাত্র বাগ্মিতায় দ্বারা চায়, কঠিন কার্যের দ্বারা চায় না,—আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয়েরা কি তাহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছুক আছেন ?

আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ যদিচ মহোচ্চ জমিদার-সম্প্রদায়ভূক্ত তথাপি তাহার সংসারজ্ঞান যে একেবারেই নাই তাহা বলিতে পারি না। তাহার একটা কথার অত্যন্ত চতুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস যে প্রচুর রাজভক্তি প্রকাশ করে, গোড়াতেই মহারানীর জয়কীর্তন করিয়া কার্য আরম্ভ করে ইহার অপেক্ষা চালাকি তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না।

বাস্তবিক চোরের কাছে চোর ধরা পড়ে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, “অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।” সেই অতিভক্তি কংগ্রেসই প্রকাশ করুন আর আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ-সম্প্রদায়েরাই করুন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য চুরি। যাহারা ডাকারিন-ফণ্ডে টাকা দেন, ভূতপূর্ব সাহেব-কর্মচারীদের অভূতপূর্ব পাষণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশকে ভারাত্মর করিয়া তোলেন, পারোনিয়রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করে দেখি তাহাদের অতিভক্তির মূল্য কি সাহেবেরা বোঝে না ? ইহার মধ্যে কীকি দিয়া কিছু কি আমাদের চেটা নাই ? আলট্রাগণ না হয় নিজের জন্ত উপাধি সন্ধান করেন, কংগ্রেস না হয় দেশের

অন্ত একটা কিছু সুযোগের চেষ্টার থাকেন, পরন্তু ভক্তি-জিনিসটাকে ব্যবহারে লাগানো হইয়া থাকে। এ ভক্তিকে ঠিক বলা যায় না।

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow !

ভবু অতিভক্তিতে তোমাদের কাছে কনগ্রেসকে হার মানিতে হইবে। একবার ভাবিয়া দেখো তুমি যে রাজভক্তির প্রচুর তৈল লেপনে পায়োনিয়র পত্রটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহার মধ্যে কত অভিসন্ধিই আছে। ওই যে মুঞ্চচক্ষু সাহেবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অঙ্গগদগদ কণ্ঠে বলিতেছ, সাহেব তোমারই অন্ত দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম—(অতএব কিছু আশা রাখি !) ঘর কৈছু বাহির বাহির কৈছু ঘর, পর কৈছু আপন আপন কৈছু পর। (অতএব কিঞ্চিৎ সুবিধা চাই।) নাথ, তুমি বল কনগ্রেস মন্দ আমিও বলি তাই; (অতএব দেশের লোকের মাথার উপরে আমাকে চড়াইয়া দাও।) ঐধু, তুমি মুনিসিপালিটি হইতে দিশি জঞ্জাল বিদায় করিয়া বিলাতির আমদানি করিতে চাও সেই হচ্ছে “জেনারেল সেক্সিমেন্ট অফ দি ক্লাস টু স্মিচ আই ছান্ড দি অনার টু বিলদ” (অতএব তোমার পাদপীঠপার্শ্বে আমাদিগকে স্থান দিয়ো !) ভারতবর্ষের মঙ্গলভাই বল আর পৌরসভাই বল সমস্ত আগাগোড়া নূতন নিয়মে পরিবর্তন করা আবশ্যক (অর্থাৎ সকল সভাতেই তুমি বসো সিংহাসন জুড়িয়া, আর আমি বসি তোমার কোলে।) ইতি তোমার আদরের অতিভক্ত আলট্রা-কনসার্ভেটিভ।

এমন শুভদিন কখনোই আসিবে না কিন্তু যদি দৈবাৎ আসে, যদি কোনো কারণে সাহেবের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া কনগ্রেসের নিকট হইতেই সম্মান, সৌভাগ্য ও সহায়তার প্রত্যাশা অল্পে তবে অতিভক্তির প্রবল স্রোত কি কনগ্রেসের দিকেই কিরিয়া আসে না ? তখনও কি রাজা-রায়বাহাদুরগণ সাহেবের ডালি জোগান এবং পায়োনিয়রে পত্র লেখেন ?

সাংসারিক ভক্তির এই নিয়ম। তাহা নিঃস্বার্থ নহে। যেখানে পাওনার সম্পর্ক নাই সেখানে আলট্রা-কনসার্ভেটিভেরও বজ্রপ মনের জাব গবর্নেন্ট-কালেক্টর ভূতপূর্ব ছাত্রেরও তর্জপ। মুঞ্চচরিত্রের মধ্যে বৈবম্য এতই যৎসামান্ত।

উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। ভূতপূর্ব ছাত্র দেশের হিতোদ্দেশে “হার্ড ওআর্কে” যদি বা অপটু হন অন্তত তাঁহার “এম্পাট এলোকোরেন”ও আটু ছি কিস্ত আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভিট বে-সম্প্রদায়ের মুখোজ্ঞল করেন তাঁহার

বাগ্মিতার জন্তও বিখ্যাত নছেন “কঠিন কর্ম”ও তাঁহাদের কর্ম নহে। তাঁহারা শিক্ষাকেও অবহেলা করেন এবং সামর্থ্য হইতেও বঞ্চিত। তাঁহাদের ধন আছে; দেশের হিতোদ্দেশ্যে সে-ধন যদি ব্যয় করিতে পারিতেন তবে বাক্যবীর ও কর্মবীর সকলের উপরে উঠিতে পারিতেন,—কারণ, কবি বলিয়াছেন,

শতেন্দু জায়তে বক্তা, সহস্রেন্দু চ পাণ্ডিতঃ,

শূরো দশসহস্রেন্দু, দাতা ভবতি বা ন বা।

কিন্তু সম্প্রতি দানে যিনি আমাদের দেশে আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি অধ্যাপক ছিলেন, দেশে তাঁহার কোনো স্টেক ছিল না এবং তাঁহারই উদার বদান্ততায় “গ্রেজেন্ট সিস্টেম অফ প্র্যাকটিক্যালি ফ্রী এডুকেশন” এই দীনহীন দেশে বহুমূল হইতে পারিয়াছে।

১৩০৫

বিরোধমূলক আদর্শ

গুগুসং ব্রেমাল কনটেম্পোরারি রিভিউ পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, কন্নাসি ইংরেজকে জানে না, ইংরেজ কন্নাসিকে বোঝে না।

কন্নাসিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরেজের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন—উত্তর পাওয়া যাইবে, ইংরেজ মানুষটাকে আমার ধারণা লাগে না, কিন্তু ইংরেজ জাতটার উপর আমার ঘৃণা।

ইউরোপের বিদ্যালয়ে যে-ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে অল্প দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়। প্যাট্রিয়ার্টিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছেলেদিগকে, অল্প দেশের সহিত সম্বন্ধের লাবেক কালের ঝগড়ার কথা শ্রবণ করাইয়া, ভবিষ্যৎ পর্বন্ত সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়। কসিকার দেশের মাতৃগণ, অল্প পরিবারের সহিত অপরিবারের কুলক্রমাগত যে বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের প্রতি যে প্রতিহিংসা করিবার আছে, শিশুকাল হইতে সন্তানের কানে তাহা জপ করিতে থাকে,—ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোও ঠিক সেইরূপ।

আজকাল ইংলণ্ডে খুব একটা লড়াইয়ের নেশা চাশিয়াছে। সৈনিকমলে ভিড়িবার জন্ত ডাক পড়িয়াছে। এই ডাক অল্প সকল বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিত হইতেছে

ক্লাসও যে এ-বিষয়ে নিরপরাধ, তাহা নহে। এখন দুই পক্ষের পালোয়ান সাহিত্যে পরস্পরকে শাসাইতেছে। ব্রিটিশ চ্যানেলের দুই পারে একদল ধবরের কাগজ সৈনিকতার রাস্তা দিয়া বর্বরতার পৌঁছবার জন্য খুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—ব্যক্তিগত ধর্মনীতি হইতে জ্ঞানদায়ী ধর্মনীতির আদর্শের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, সেবে তাহার কি এইরূপ সমন্বয় হইবে? যুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্বরতার ফিরিয়া যাইবে?

আজকাল দুই পয়সা দিলেই ধবরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, বাতুগত বিরোধের ভাব, অনিবার্হ পার্থক্য এবং জাতিগত বিবেচ্যে পরস্পরের বংশাভ্যুত্থানিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক বা কাল হউক, একটা সংঘর্ষ হইবেই। তাহাদের মতে মাহুদের প্রবলতম প্রবৃত্তি এবং জ্ঞানধর্মের উচ্চতম নীতিসকল দুই জাতিকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেছে। তাহার্য্য বলে, নেশনদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের আশা বাতুলের খেলালমাত্র। ইত্যাদি।

এই সকল বিরোধ-বিবেচ্যের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে বিদেশে বিতরণিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিষয়ের মাত্রা নিয়মমতো পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই।

প্যাট্রিয়ার্টিজম, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাধিবোল আছে, যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ করে, এবং সে-সম্বন্ধে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিয়া যায়। বাধিবোল মুখে মুখে চলিয়া যায়—লোকে নিঃসংশয়ে জীবনযাপন করে। প্যাট্রিয়ার্টিক খুনাখুনি অথবা ষোড়ধর্ম, এইরূপের একটা বাধিবোল।

যুরোপীয় লেখক যে-কথা বলিতেছেন, তাহার উপরে আমরা আর কী বলিব? তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া নাই বলিয়া লেখক অনেক দুঃখ করিয়াছেন—আর ইংরেজ ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব দাঁড়াইয়াছে, সেজন্য আমাদের কী দুর্গতি ঘটতেছে, তাহা প্রত্যাহই প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি, ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরেজ সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ বালকদিগকে ইংরেজ-বীরত্বের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিবার জন্য যে-সকল ছেলেতুলানো গল্প খুঁড়ি খুঁড়ি বাহির হইতেছে তাহাতে ম্যাটিনি-গল্পের উপলব্ধি করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে রক্তপিপাসু পশুর মতো ঝাঁকিয়া দেবচরিত্র ইংরেজের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে। ফরাসিকে ইংরেজের ঠিক খুঁকিবার উপায় আছে—পরস্পরের আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বর্ণ, একই প্রকার,—কিন্তু আমাদের

মধ্যে যথার্থই পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, এমন কি, সেই পার্থক্যবশতই পরম্পরের প্রতি প্রীতি আকর্ষণ কবে ঘটবে, তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অভ্যুত্থি ও মিথ্যার দ্বারা অন্ধতা, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করিতেছে।

বস্তুত এই অন্ধতা নেশনতন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেরের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অল্প নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাটিয়-টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অস্ত্রায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশন-তন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনও যুরোপে দেখিতে পাই না।

পরম্পরকে যথার্থরূপে জানা শুনা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? নেশনের মেকদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যজ্ঞাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনোপ্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে, ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও, পরম্পরের সম্বন্ধিতেও পরম্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অল্প নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ-স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ। হিন্দুরা বলে, স্ব স্ব ধর্ম পালন করাই পুণ্য। অবস্থান্তরে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটিতেই পারে এবং সে-পার্থক্য পরম্পরের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ, একথা শাস্ত্রচিন্তে নির্মলজ্ঞানে অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এবং ভিন্ন সমাজের প্রতি প্রীতিসম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও স্বসমাজের কর্তব্যপালন করা কঠিন হয় না। সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিওগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারও সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না। সর্বপ্রকার বিদ্বেষ, অসত্য, হিংসা সেই উন্নতির প্রতিকূল। সদ্ভাব ও সত্যই সমাজের মূল আশ্রয়। নেশন অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহ্যবলকে জায়ধর্মের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া মনেটাই ঘোষণা করে—সমাজ কদাপি তাহা করিতে পারে না; কারণ ধর্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আমরা যদি বাধিবোলে না তুলি, যদি 'প্যাটিয়টি'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে, জায়কে, ধর্মকে, জ্ঞানশালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে। আমরা নিকট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা, প্রবঞ্চনা ও

অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এবং ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ-কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ক্রাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে যুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব ?

আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের শৈত্বক মূলধন আছে। সেখানে কেহ আমাদেরকে ঠেকাইবে না—সেখানে পিতৃলোক এবং দেবতা আমাদের সহায় হইবেন এবং বাঁধিবোলে যদি না তুলি, তবে ইহা জানা উচিত যে, সেখানে যে-মহত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্বের উচ্চে।

কিন্তু একুশ উপদেশ শুনা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ, অতএব বিরোধের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয়, তবে আমিও তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না। এইজন্ত শিশুকাল হইতে ভিন্নজাতির সহিত বিরোধ-ভাবের একান্ত চর্চাই ‘প্যাটিয়টি’র সাধনা। হিন্দুজাতি সেই পোলিটিকাল বিরোধভাবের চর্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য দেয় নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিব আত্মরক্ষাই মানুষের অপবা লোকসম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্ম নহে। ধর্মে যদি নাশ করে, তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।

ক্রাশনালধর্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে’না। ক্ষুদ্র বোয়ারজাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্ত ? তাহাদের হৃদয়ে ক্রাশনালধর্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে-ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই ?

তা ছাড়া বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছদ্মবেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ তাহার মুখোশের মতো। কথিত আছে, ক্ষয়কালে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিষ্টের রক্তিমায় যুরোপের গণ্ডহল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ ? তাহার ক্রাশনালত্বের ব্যাধি, অতিমেদন্যত্বের জ্বায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না ?

অধর্মেরূপে তাৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলন্ত বিনশতি ।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে, শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে—কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ যুরোপের যেকোন অটল বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিচারেই যে ঋষ মুক্ত্যুতাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যতিচারেও ঋষ বিনাশ। ধার্মনৈতিক নিয়মের অমোঘত্বে যুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। আমাদের রাজার এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপরে যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই।

নদী তাহার ছুই তটভূমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নদীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদ্ধ করিবার জন্ত বাধ দেওয়া যায়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্রাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত প্রাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্তমানের আদর্শেই একেবারে বাধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা ভীষণ হইয়া প্রলয় সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ, যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রক্তহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। যুরোপের নেশনতত্ত্বে এই স্বার্থ, বিরোধ ও বিরোধের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনতত্ত্বের দিকে বিশ্বনেশনতত্ত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যাহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর-সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি জুড়ুটিজুড়ুটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্ধশযি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অধমে বৈধতে তবং ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলম্ বিনশ্রুতি ।

এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য, স্ত্রাশনালঙ্কার মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক। নেশন শব্দের অর্থ যখন লোকে ভুলিয়া যাইবে, তখনও এ-সত্য অগ্নান রহিবে এবং ঋষি-উচ্চারিত এই বাক্য স্পর্ধাময়মন্ত মানবসমাজের উর্ধ্বে বজ্রমন্ত্রে আপন অস্থশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি

এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাসের কারাবরোধের কথা সকলেই জানেন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অবিচার মাসিকপত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বর্তমান ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্যনিবেশ করিয়াছে। সেইজন্য এ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে ণ্ডটিকরেক কথা বলিতে হইতেছে।

পারোনিয়র লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে নানান্নাতীয় লোক একত্রে বাস করে। ইহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের একটি দুর্লভ কর্তব্য। সুতরাং যে-ঘটনায় ভিন্নজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা হয়, সেটার প্রতি বিশেষ কট্টর বিধানের প্রয়োজন ঘটে। সে-হিসাবে সোমেশ্বর দাসের কারাদণ্ডকে গুরুদণ্ড বলা যায় না।

সুযোগ্য ইংরেজি সাপ্তাহিক “নিউ ইণ্ডিয়া” পত্রে পারোনিয়রের এই সকল যুক্তির অবধারিতা ভালোরূপেই দেখানো হইয়াছে। ইংরেজের যে-সকল ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে বিকোভ উপস্থিত হয়, ইংরেজ বিচারক তাহাকে যে কত লঘুভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রত্যহ দেখিতে পাই। এই সেদিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে কোনো ইংরেজ পাদুকা বহন করাইয়াছিল—দেশের উচ্চতম আদালতে পর্যন্ত স্থির হইয়া গেছে, ব্যাপারটি অত্যন্ত তুচ্ছ।^১ তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু পারোনিয়রের যুক্তি অল্পসারে তুচ্ছ নহে। ভদ্র ব্রাহ্মণের একরূপ নিষ্ঠুর অপমান ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুতর।

তাহা হইলে কথাটা কী দাঁড়াইতেছে, বুঝিয়া দেখা যাক। যে-সকল জাতি law-abiding অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। বাহারা কিছুতেই শাস্তিভঙ্গ করিবে না, তাহাদিগকে অন্তায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ। আর বাহারা অসহিষ্ণু, বাহারা নিজের আইন নিজে চালাইয়া বসে, সংগত কারণেও তাহাদের গায়ে হাত দিবার উপক্রমমাত্র অপরাধ। ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে-গোয়ালে একঘাটে জল খাওয়াইবার উপায় বাধকে দমন করিয়া নহে, গোল্‌ফটারই শিং ভাঙিয়া।

কিন্তু পারোনিয়রের এ-কথাটা লইয়া রাগ করিতে পারি না। পারোনিয়র বন্ধু-ভাবে আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতই বাক্‌দে আশুন দেওয়া যতবড়ো

১. তুলনীয় “ব্রাহ্মণ”, “ভারতবর্ষ”, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ, ভিজা তুলায় আগুন দেওয়া ততবড়ো অপরাধ নহে। যাহারা চিরসহিষ্ণু, তাহাদের অপমানকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব আঘাত-অপমান সম্বন্ধে আমরা আইন বাঁচাইব, কিন্তু আইন আমাদেরিগকে বাঁচাইবে না। Mild Hindu-দের প্রতি পাষোনিয়রের ইহাই নিগূঢ় বক্তব্য।

আর-একটা কথা। বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনের কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিস আছে, সেটা যেদিকে ভর করে, সেদিকে নিক্তি হলে। এ-দেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অল্প সময় একটা পোলিটিকাল প্রয়োজন, অতএব সরূপ স্থলে স্বস্ববিচার অসম্ভব। জায়বিচারের মতে এ-কথা ঠিক বটে যে, ইংরেজের প্রতি দেশী লোক ঘে-ব্যবহার করিয়া যে-দণ্ড পায়, দেশী লোকের প্রতিও ইংরেজ সেই ব্যবহার করিয়া সেই দণ্ডই পাইবে। আইনের বহিতেও এ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন জায়বিচারের চেয়েও নিজেকে বড়ো বলিয়া জানে।

এ-কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্স সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নিচে। যেখানে পোলিটিকাল প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে, সেইখানেই ধর্ম বসিবার স্থান পাইবে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে সভ্য বিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, অন্য প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেছে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে জায়বিচারকেও বিকারগ্রাপ্ত হইতে হয়, পাষোনিয় তাহা একপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। লজ বার্কিট সোমেন্সরের ব্যবহারকে audacity অর্থাৎ দুঃসাহস বলিয়াছেন। স্বত্বস্বাকার উপলক্ষে ইংরেজকে বাধা দেওয়া যে দুঃসাহস, বিচারকই তাহা দেখাইয়াছেন, এবং এই সাহসিকতার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়া বিচারক যে মানসিক স্তরের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে আমরা কোনো-মতেই সাহসের কোটার ফেলিতে পারি না। বস্তুত তিনি অস্বাস্তর কারণে সোমেন্সরের প্রতি অপকৃপাত ন্যায্য বিচার করিতে সাহসই করেন নাই। এ-স্থলে দণ্ডিত যদি audacious হয়, তবে দণ্ডদাতার প্রতি ইংরেজি কোন্ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ বিচারের ফলাফলকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া সাপ্তাহিক পত্রের এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাহার সমাধি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল প্রয়োজনের যে বিধান, তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

ইহাতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কী হইতেছে, তাহা লইয়া

দৃষ্টিভঙ্গ্যগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ঋব ধর্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মবুদ্ধিতে বিধা অসম্ভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে-শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, সে-শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কী করিয়া? ধর্মকে যদি অকর্মণ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করি, তবে কিসের উপর নির্ভর করিব? বিলাতি সভ্যতার আদর্শের উপর? বিশ্বজগতের মধ্যে এই সভ্যতাটাই কি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী? দুর্ভাগ্যক্রমে, যে-জিনিসটা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বুকের উপরে চাপিয়া বসে, সেটা আমাদের পক্ষে পৃথিবীর সব-চেয়ে ভারী—আমাদের পক্ষে হিমালয়পর্বতও তাহার চেয়ে লঘু। সেই হিসাবে বিলাতি সভ্যতার নীতিই আমাদের পক্ষে সব-চেয়ে গৌরবান্বিত—তাহার কাছে ধর্মনীতি লাগে না।

অতএব ইচ্ছা করি আর না করি বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া ধরিয়া যে-সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। আমরা ক্লাইভকে, হেষ্টিংসকে, ড্যালহৌসিকে আদর্শ নরোত্তম বলিয়াই স্বীকার করিব,—ইংরেজের সহিত স্ত্রাঘ্য-অস্ত্রাঘ্য সর্বপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষস্থলে আমরা স্ত্রাঘবিচারের প্রত্যাশাই করিব না—যেখানে ভারতশাসনের প্রয়োজনবশত প্রেক্ষিজের দোহাই পড়িবে সেখানে বিশ্ববিধাতার দোহাই মানিব না—ইহাই ঘাড় পাতিয়া লইলাম,—কিন্তু এই গুরুই যখন শিবাজির রাষ্ট্র-নীতিকে অধর্ম বলিয়া আমাদের নিকট নীতিপ্রচার করিতে আসিবেন, তখন আমরা কী করিব? তখনও কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্মনীতিশাস্ত্রও বর্তমান ক্ষমতাসীলীকেই ওয় করিয়া নিজের রায় লিখিয়া থাকেন, অতএব থিক শিবাজি।

১৫-৯

রাজকুটুম্ব

“নিষু ইণ্ডিয়া” ইংরেজি কাগজখানি আমরা প্রচার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভূলাইবার ঝাঁঝাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাভীর্ষ আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার লেখা সাময়িক সংবাদে তুচ্ছতাকে অনেকদূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।

১২ই মার্চের পক্ষে সম্পাদক “ভারতবর্ষে যুরোপীয় ক্রিমিনাল” নাম দিয়া একটি উপাদেশ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৃথা অল্পবাদের চেষ্ঠা না করিয়া ক্রিমিনাল-শব্দটা আমরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

যুরোপীয় ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কেন যে সন্দিগ্ধতা হয় না, সম্পাদক বিচারকের মতো ধীরভাবে তাহার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিনি বলেন, একপক্ষে অপরিমিত সহিষ্ণুতা ও আর-একপক্ষে অপ্রতিহত শক্তি যেখানে সম্মুখীন হয়, সেখানে স্বভাবতই এইরূপ ঘটিতে বাধ্য। এ-স্থলে আমরা হইলেও এমনই করিতাম—এমন কি, সম্পাদক টিপ্পনী দিয়া বলিয়াছেন, এশিয়াবাসী হয়তো সুযোগ পাইলে “রিকাইও” পাশবিকতায় যুরোপীয়কে জিনিতে পারিত।

শুদ্ধমাত্র প্রসঙ্গক্রমে আমরাও একটি মনস্তত্ত্বের কথা বলিয়া লই। সম্পাদকের এই টিপ্পনীটুকুতে একটি দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজের বক্তব্যকে সবার করিবার জন্য অপেক্ষাপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বজাতির প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতও যেমন স্থলবিশেষে একপ্রকার কৌশলমাত্র, জাতিনির্বিশেষে একান্ত অপক্ষপাতও স্থলবিশেষে সেইরূপ কৌশল ছাড়া আর কিছু নহে। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের পক্ষে এটুকুর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি দুর্বল নহেন।

প্রাচ্যদের সম্বন্ধে ইংরেজদের কতকগুলি বাধিবুলি আছে, আমাদের “রিকাইও” নিষ্ঠুরতা তাহার মধ্যে একটা। পূর্বদিকটা একটা মস্তদিক—এদিকে যাহারাই বাস করে, তাহাদের সকলকে এক নামের অধীনে একশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া ভূগোলবৃত্তান্ত রচনা করিলেই যে তাহারা দানা বাধিয়া এক হইয়া যায়, তাহা নহে। বিদেশীরা সামান্য বাহ্যসাদৃশ্যের ভিতর দিয়া বৈসাদৃশ্য ধরিতে পারে না। একজন চাবার চক্ষে এক গোরার সঙ্গে আর-এক গোরার ভেদ সহজে ধরা পড়ে না—ইংরেজের অনভ্যন্ত দৃষ্টিতে একজন বাঙালিও যেমন, আর-একজনও প্রায় সেইরূপ। এই কারণেই যুরোপীয়েরা সমস্ত প্রাচ্যজাতিকে একটা পিণ্ড পাকাইয়া দেখে এবং সকলের দোষগুণকে একটা নামের কোলার মধ্যে ভরিয়া “ওরিয়েণ্টাল” লেবল আঁটিয়া দেয়।

যুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু, সুতরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি। রিকাইও পাশবিকতায় এশিয়া যুরোপীয়ের চেয়ে অধিক বাহাদুরি কী পাইতে পারে, ইতিহাস আঁটিয়া তাহার প্রশংসা সংগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতের অপবাদটুকু শিরোধার্য করিয়া একথা অন্তরের সহিত, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, হিন্দুকে অবদ্বন্দ্ব্য বল,

অবোধ বল, দুর্বল বল সহ করিয়া বাইব, কারণ, সহ করা আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু হিন্দুজাতির সত্যমিথ্যা নানা অপবশের মধ্যে রিকাইণ্ড প্যাশবিকতার অপবাদটা সব-চেয়ে অশ্রাব্য। আর এশিয়াটিক-নামক বক্তনবিহীন একটা প্রকাণ্ড বিচিত্র ব্যাপারের সহিত যুরোপীয় বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের পতন, মহন্যত্ব, বা দেবত্ব তুলনা একেবারেই অসংগত, অনর্থক। একটা মানকচূর সহিত একটা বাগানের তুলনা হইতেই পারে না।

এটা একটা অবাস্তব কথা। মোটের উপর, সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে চাপা কথা চের আছে, তাহা চাপাই থাক। আমরা কেবল একটি কথা যোগ করিতে চাই মাত্র।

যাহার হাতে শক্তি আছে, সে যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মাহুষের স্বভাব। ইংরেজও মাহুষ, তাই সে ইংরেজ-ক্রিমিনালকে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না। যাহার হাতে শক্তি নাই, সে প্রবলের অস্বাভাবিক অগত্যা সহ করে, ইহাও মাহুষের স্বভাব। আমরাও মাহুষ, তাই আমাদের ইংরেজের আক্রমণ চূপ করিয়া সহ্য করিতে হয়। এই এক জায়গায় মহন্যত্বের সমনিরুদ্ভূতিতে ইংরেজের সঙ্গে আমরা একত্রে মিলিতে পারিয়াছি।

নূতন ইঙ্গুল হইতে বাহির হইয়া যখন সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি বিদেশী বচনগুলি বাংলায় তর্জমা করিবার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা এই জানিতাম যে, যুরোপ বাহুবলে প্রবল হইলেও মহন্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে দুর্বলের সহিত আপনার সাম্য স্বীকার করেন। তখন আমরা ইঙ্গুলের উত্তীর্ণ ছেলেরা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ইহারা দেবতা। আমরা চিরকাল ইহাদিগকে পূজা করিব এবং ইহারা চিরকাল আমাদের প্রসাদ বিতরণ করিবে—ইহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধই শাশ্বত। আমরা মনের ভিত্তর হইতে ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ হার মানিয়াছিলাম।

আজ যখন বুঝিতেছি, ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে—আমরাও দুর্বল, ইহারাও দুর্বল—আমাদের অক্ষমের দুর্বলতা, ইহাদের সক্ষমের দুর্বলতা—তখন অভিভূতির ভার কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি। ইংরেজ ক্রমাগত আমাদের ইঙ্গুলের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, জ্ঞানপূরক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের অশ্রেণীর কোনো জাতির সহিত আমাদের তুলনাই হয় না। এক সময়ে ইংরেজ যেন এই ধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রেক্ষিত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে-ব্যক্তি অক্ষমের নিকট ধর্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহার কাছে হার না মানিয়া থাকা যায় না—সেকালে আমাদের

মন হার মানিয়াছিল। এখন ইংরেজ প্রভাপের প্রেক্ষিত সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে—বঙ্গেশী ও এ-দেশীকে ধর্মের চক্ষে সমান করিবার বল ও সাহস এখন তাহার নাই—এখন ইংরেজের কাছে ইংরেজ-গবর্নেন্ট দুর্বল। এখন ম্যাক্লেটার রাজা, বার্মিংহাম রাজা, নীলকর রাজা, চাঁকর রাজা, চেম্বর অফ কমার্স রাজা,—তাই আজকাল আমাদের প্রতি ভয়-শেষ-ঈর্ষার নানা লক্ষণ দেখিতে পাই। দেখি, এল্লিনিয়ারিং কলেজ হইতে আমরা তাড়া ধাইতেছি, আপিস হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ডাক্তারিশিক্ষায় বাধা পাইতেছি, বিজ্ঞানশিক্ষায় গৃহভাবে প্রতিহত হইতেছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু এই সাহসনাটুকু পাইতে পারি যে, কর্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড়ো নহে। ইহারা আমাদের অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচে না—ইহাদের মনে এ-আশঙ্কটুকু আছে যে, সুযোগ পাইলে আমরা বিজ্ঞান ক্ষমতায় ইহাদের সমান হইয়া উঠিতে পারি। ইংরেজ-ক্রিমিনাল দেনীয়ের প্রতি অন্ত্রায় করিয়া স্ত্রায়সংগত শাস্তি পাইলে ইংরেজকে দেনীয় আপন সমতুল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, এই ভয়টুকু এখন ইংরেজের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার আত্মসম্মান নষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিন্তাও ইংরেজের কাছে নতিস্বীকারের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে—প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সম্পাদকমহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘৃষির পরিবর্তে ঘৃষি কিরাইতে পারি, তবে রাস্তায়-ঘাটে ইংরেজকে অনেক অন্ত্রায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার ঐকিত্তক কারণ আছে।

একটি কারণ এই যে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি—পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন সমস্তই শিশুকাল হইতে আমাদের কাছে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘৃষাবুঝি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একান্নবর্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালোমানুষ হইবার, পরস্পরের অসুখকলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘৃষি শিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্ৰকারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না। নিজের অসুবিধা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিবার তাবই আমাদের স্বভাব ও অভ্যাসসংগত—পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্তি পাইবার স্থান পায় নাই।

এক, ইচ্ছার ছেলের মধ্যে যেটুকু বীররসের অবসর আছে, কর্তৃপক্ষ তাহা সহজে

প্রার্থ্য দিতে চান না। তাঁরা কেবলই বলেন, আমাদের ছাত্রদিগকে যথেষ্ট শাসনে রাখা হয় না। তাঁহাদের অদেশে ছাত্রেরা যে-ভাবে মানুষ হন, এ-দেশের ছাত্রদের ব্যবহারে তাহার আভাসস্বাক্ষর তাঁহারা সহ করিতে পারেন না। বাহা দলন করিতে হইবে, তাহা অল্পেই দলন করা ভালো, এ-কথা ইংরেজ জানে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোনো কলেজের ছাত্র ফুটবল খেলিতে খেলিতে আহত হইয়াছিল। তাহার শরীর শুক্রবার প্রয়োজনে কাছের একটি সরোবর হইতে কাপড়ে ভিজাইয়া জল লইয়াছিল। সেই সরোবর সাহেবদের পানীয় জলের অন্ত স্বরক্ষিত ছিল। সেখানে ছাত্রকে নাবিতে দেখিয়া পাহারাওআলা নিবেদন করে। সেই উপলক্ষে উভয়পক্ষে বচসা, এমন কি, হাতাহাতিও হইয়া থাকিবে। ম্যাজিস্ট্রেট সেই ছাত্রকরটিকে লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার ডিক্রিষ্টেব যত দুর্গম স্থানে যে-কোনো ঘুরাইয়া-মারিয়া অবশেষে অসুস্থানা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সেই ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকেরা কোনো-কালে ভুলিতে পারিবে না। বাল্যলীলার একদম দণ্ডবিধি ইংরেজের নিজের দেশে যে নাই, সে-কথা সকলেই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো বিভাগস্বয়ং, দেশীয় প্রিন্সিপালের বিচারেও, ছাত্রদিগকে যে-সকল লঘুপাপে গুরুদণ্ড সহ করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের পৌরুষচর্চা হয় না।

এই তো গেল ঘরে এবং বিদ্যালয়ে। তাহার পরেও যদি ইংরেজ-অন্তায়কারীর গায়ে ঘৃষি তুলিবার মতো ক্ষুতি কাহারও থাকে, তবে বিচারালয় আছে। দেশীয়দের বিরুদ্ধ-চারী ইংরেজ-ক্রিমিনালের প্রতি ইংরেজ-বিচারকের মানবস্বভাবসংগত পক্ষপাত সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন—সেই স্বাভাবিক পক্ষপাত দেশীয় অপরাধীর পক্ষে কী আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-যুব গড়ের মাঠে গাড়ি হইতে অন্ত গাড়ির একজন ইংরেজকে চাবুক মারিয়া জেলে গিয়াছিল মনে আছে—এলাহাবাদের সোমেশ্বর দাসের কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। ইংরেজের গায়ে হাত দিতে দিয়া গ্রামব্রহ্ম দোষী-নির্দোষী বহুতর লোকের বিরূপ অসহ লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহার কারণ, এ-দেশে পোলিটিকাল নীতিতে অন্ত নীতিকে অটল করিয়া ফেলে। এদেশে ইংরেজকে মারার মধ্যে ব্যক্তিগত মার এবং পোলিটিকাল মার, দুই আছে—ইন্ডুলের ছেলের তুচ্ছ ক্রীড়ার মধ্যে ভাবীকালের পোলিটিকাল সংকটের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে—মৃতরাং আমাদের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা হঠাৎ পোলিটিকালের মধ্যে পা দিয়া ফেলি, তখন সহসা কাঁধের উপরে যে-দণ্ডটা আসিয়া পড়ে, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়। দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব করিয়া ইংরেজ অল্প দণ্ড ও ইংরেজের গায়ে

হাত দিয়া আমরা গুরু দণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মহুষ্যধর্ম আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রাজধর্মও যোগ দিয়াছে। এ-স্থলে ঘৃষি তোলা কম কথা নহে।

মহুষ্যধর্মভাবে সাহসের একটা সীমা আছে। জাহাজের একজন কাপ্তেন হাজার অস্তায়কারী হইলেও তাহার অধীনস্থ যুরোপীয় নাবিকদল সংখ্যাধিক্যসত্ত্বেও সকলপ্রকার অপমান ও দৌরাভ্যা অগত্যা সহ করিয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা অনেক শুনা গিয়াছে। আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা শস্ত। জার্মিস হিল ইংরেজ-ক্রিমিনালকে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তোমার স্বদেশীয় ভৃত্য তোমার এরূপ ব্যবহার সহ করিত না। না করিবার কারণ আছে। বিচারের চক্ষে স্বদেশীয় ভৃত্য ও স্বদেশীয় মনিব সম্পূর্ণ সমান। সে-স্থলে মনিবের চূর্বাবহার সহ না করিবার প্রভূত বল ভৃত্যের আছে। সে-বল ভৃত্যের একলার বল নহে, তাহা তাহার সমস্ত স্বজাতির বল। এই বিপুল বলের সহিত একজন দেশীয় ভৃত্যের একলার বলের তুলনা করা ঠিক নহে।

এখানেও একাদম্বর্তী পরিবারের কথা পাড়িতে হয়। একজন ইংরেজের উপর অন্য লোকেরই নির্ভর—আমরা প্রত্যেকেই বহুতর আজীয়েবের সহিত নানাসম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ আমাদের ত্যাগপরতা, সংযম, মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মহুষ্যধর্মের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে—সেই সকল সম্বন্ধই হিন্দুজাতিকে বিফাইও ও অকৃত্রিম পাশ-বিকতা হইতে দূরে রাখিয়াছে—আমাদের পক্ষে হঠকারিতা সহজ হইতেই পারে না, আমাদের পক্ষে জেলের দিকে আকর্ষণ করিলে অনেকগুলি শিকড়েরই সাংঘাতিক টান পড়ে। অতএব আমাদের জীর্ণ প্রীতি ইংরেজের বুটাদের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরেজের নাসাঙ্গ আমাদের বহুমুখীর পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে। সেজন্য ইংরেজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন তো করুন—কিন্তু আমরা কেন ইংরেজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি? যে-ভাবে আমরা চিরকাল মহুষ্যধর্মচর্চা করিয়া আসিতেছি, ইংরেজের সহিত সংঘাতে তাহাতে আমাদের অনুবিধা ও অপমান ঘটিতেছে। তা হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া মহুষ্যধর্ম আমরা ধাটো, এ-কথা আমরা তো স্বীকার করিতে পারিব না। মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের খর্বতা ঘটিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি লক্ষ্য পাইব? রোমের সম্রাট নর-নিরস্ত্র খ্রীষ্টানদিগকে ক্রীড়াক্ষেত্রে পশু দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—ধর্মরাজ যদি তাহার বিচার করিয়া থাকেন, তিনি কি রোমরাজের পৌকষকেই সম্মান দিয়াছেন? আমরা যদি ধর্মার্থভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্ত নিজেকে হের বলিয়া অন্তায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রচনানীতির খাতিরে বা যে-কারণেই হউক, এ-কথা আমরা যেন অনায়াসেই উচ্চারণ করিয়া না বসি যে, আমরা হইলেও ঠিক

এইরূপ কবিতাম বা ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতাম। না, আমরা হইলে একপ কবিতাম না। ইহাই আমাদের সাধনা। আমাদের সমাজের আমাদের ধর্মের যে-আদর্শ, আমাদের শাস্ত্রের যে-অনুশাসন, আমাদের সভাবের যে-গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম। আমরা ভিক্ষকে, দুর্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই।

রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্ব-দেব উৎপাত সহ্য করিতেই হয়। বৃহৎকটিকের রাজশ্রালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন। প্রভেদ এই যে, উক্ত কুটুম্ববর্গের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গেছে।

বৃহৎকটিকের সেই রাজশ্রালকটি যতই উপদ্রব করুক না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে-মুখে পরিহাস-বিদ্রুপ করিতে ছাড়িত না। এখনকার রাজশ্রালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে-পরিমাণ হান্তরস আদায় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহারা প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-পরিমাণে সন্ত্রম হারাইতেছেন, তাহা যেন আমাদের মাথা তুলিবার সহায়তা করে।

১৩১০

ঘুষাঘুষি

গত বৈশাখমাসের বঙ্গদর্শনে “রাজকুটুম্ব”-শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্ন ইণ্ডিয়ান প্রকাশিত কোনো রচনার সমালোচনা করা হইয়াছিল। নিম্ন ইণ্ডিয়ান সম্পাদকমহাশয় আমাদের কাছে ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, এক গালে চড় খাইয়া অল্প গাল কিরাইয়া দেওয়া যদি বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজলপ্রবাহে আহতগণের আঘাত-বেদনার উপশমচেষ্টাই আমাদের মতে শ্রেয়।

ইংরেজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকিসুরে নালিশ করা এ-দেশে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত অধিকমাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে ঢেলা মারিলে পৃথিবীহুঙ্ কাক যেমন চীৎকার করিয়া মরে, দেশী লোকের মার খাইবার খবরে আমাদের খবরের কাগজ-গুলি তেমন করিয়া অবিশ্রাম বিলাপপরিতোপে আকাশ বিদীর্ণ করিত।

আমরাই সর্বপ্রথমে ‘সাধনা’ পত্রিকায় এই নাকিকান্নার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি—এবং কথঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি, তাহাও দেখা যাইতেছে। আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোনো কারণ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

ছবিতে যেমন চৌকা জিনিসের চারিটা পাশই একসঙ্গে দেখানো যায় না, তেমনি প্রবন্ধেও একসঙ্গে একটা বিষয়ের একটা, বড়োজোর, দুইটি দিক দেখানো চলে। “রাজকুটুম্ব” প্রবন্ধেও আমাদের বক্তব্য বিষয় খুব ফলাও নহে। নিম্ন ইণ্ডিয়ান সম্পাদক-মহাশয় যখন ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সম্ভবত আমাদের রচনায় কোনো ভ্রুটি থাকিতে পারে। এবারে ছোটো কবিতা এবং স্পষ্ট কবিতা বলিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়, এই দুই পক্ষের অবস্থা লইয়া আমরা কিকিৎ শুধালোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। আমরা কোনো পক্ষকেই কর্তব্যসম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিই নাই।

যে লোক জলে পড়িয়াছে, ভাড়া হইতে তাহাকে টিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ। অপর-পক্ষের সে-মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। একদম স্থলে কোন্ পক্ষকে কাপুরুষ বলিব? যে মারে, না যে মার ফিরাইয়া দেয় না?

ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ—কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে-কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাত্তের বল আরও অনেক বেশি। তাহার দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আমি যেমন একটি মানুষ, সে-ও যদি তেমনি একটি মানুষমাত্র হইত, তবে আমরা কতকটা সমকক্ষ হইতাম। কিন্তু এ-স্থলে আমি একটি ব্যক্তিমাত্র, আর সে ইংরেজ, সে রাজশক্তি। বিচারকালে, মানুষ বলিয়া আমার বিচার হইবে, আর তাহার বিচার হইবে ইংরেজ বলিয়া।

আর, আমি যখন ইংরেজকে মারি, তখন বিচারক সেটাকে এই বলিয়া দেখে যে, ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে আমি আঘাত করিলাম, ইংরেজের প্রেক্ষিককে আমি ক্ষুণ্ণ করিলাম—অতএব সামান্য আঘাতকারী বলিয়া আমার বিচার হয় না।

আমাদের মধ্যে এই গুরুতর অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায়, তাহার চেয়ে যে মারে, সেই কাপুরুষ বেশি। এই কাপুরুষতার জন্য ইংরেজ আঘাতকারী বিচারে নিষ্কৃতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে দিক্‌কারলাভ করিত, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম। কিন্তু দেখিতে পাই, উলটো তাহারা বেশি করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আলা-উদ-দ-দ্বালা থাকে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এইরূপ কাপুরুষতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে তিক্তোন্মিত্তি জস দেওয়া হয় না, এই পর্যন্ত।

সম্প্রতি একজন দেশী লোককে খুন করিয়া মার্টিন বলিয়া একজন ইংরেজের

বিভীষণের বিচারে তিন বৎসর জেল হইয়াছে। ইহার পর হইতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজে কিরূপ আতঙ্কের আভিনায় উঠিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত নমুনাট কৌতুকজনক :

There are some things that foreign Governments, and even Native States in India, manage better than we do ; one of these is the protection of their own kith and kin, and the maintenance of that prestige so necessary for upholding constituted authority. To the disinterested observer in India, it seems that the white man is becoming very much discounted under the ægis of the British "Raj." Time was when the Britisher, as conqueror and ruler of this land, enjoyed certain rights and privileges, and one of these was his right to be tried by jury. Quite recently we have had the spectacle of the unanimous verdicts of juries, acquitting Europeans, charged with offences triable by these tribunals, set aside, not because there was any outcry against such acquittals, or on the application of the prosecution, but on appeal by the Government against the acquittal. To quote one specific instance, we may refer to the trial of Mr. Rose, of Dulu Tea Estate, Cachar. The relations between Europeans and natives are becoming acutely antagonistic, and this racial gulf is being widened by the violent writings of the native press. The time has arrived to look into this question a little more closely. The unprovoked assaults on Europeans, especially soldiers, are becoming increasingly frequent. Europeans are insulted, abused and jeered at by the lowest type of natives and if they retaliate, they are set upon by a mob. If the European gets badly mauled, nothing is done, no one cares, but if in the brawl he happens to seriously hurt one of his numerous assailants, in the exercise of his right of self-defence, he is tried for his life and liberty. This we say is one-sided and it behoves the Government to look a little deeper into the causes at work that bring about these frequent conflicts between Europeans and natives.

যেথো, এই একটি সামান্ত ঘটনায় ইংলিশম্যান কম্পাধিত। অস্তায় করিবার অপ্রতিহত কমতা যদি কোনো উপায়ে একটু খর্ব হয়, তবে কী আতঙ্কের বিষয় ! ইহা

হইতে এই প্রমাণ হয় যে, এ-দেশে ইংরেজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে। করিতে পারে করুক—কিন্তু ইহার পরে ভীকতার অপবাদ আমাদেরকে দেওয়া আর চলে না।

ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অপক্ষপাত বিচারে “কঙ্কর” ও “কলর”-দের যে প্রেক্ষিতের হানি হয়, এ-আশঙ্কা এ-দেশের সাধারণ ইংরেজের মনে জাগিয়া আছে—জ্ঞান এবং ভুরি নিতান্ত অসাধারণ না হইলে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অপক্ষপাতে স্থবিচার করিতে যাহারা ভয় করে, তাহারা একদিকে আমাদের পক্ষে ভয়ানক, তেমনি আর-একদিকে তাহাদের এই ভীকতাই আমাদের কাছে তাহাদের দুর্বলতা প্রতিলক্ষ করে। আমাদের কাছে ইহাতে তাহাদের মর্যাদা কমিয়া গেছে। এখন আমরা ইংরেজকে ঘরে-ঘরে এবং মনে-মনে খাটো করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি এক সময়ে আমাদেরকে যেরূপ সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, এখন আমরা ক্রমশই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্মনীতির যে-আদর্শ, তাহা প্রত্যহ আমাদের কাছে উজ্জলতর হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য বর্বরতার নথ-মূর্তি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্রয়লাভের জন্য আমাদের নৃদেহী কুলায়ের মধ্যেই একে একে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি। এইরূপে আমাদের অপমানের মধ্য দিয়াও আত্মসম্মানের পথ কিরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার আভাস ছিল।

আর-একটি কথা ছিল, বোধ হয় “নিম্ন ইণ্ডিয়া”-সম্পাদক মহাশয় সেইটেতেই আপত্তি করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে একাদমবর্তী পরিবার-প্রথা এমন যে, বাল্যকাল হইতে আমাদেরকে সর্বপ্রকারে বিরোধের অপেক্ষা মিলনের জন্যই প্রস্তুত করে। আমাদেরকে আত্মত্যাগ এবং ধৈর্যই শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা যদি ক্রমশ দীক্ষিত না হই, তবে এতগুলি লোকের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়। অতএব আমরা যে খণ করিয়া কাহারও নাক-চোখের উপর ঘৃণা মারিতে, বা ভূপতিত ব্যক্তির মুখের উপর বা রাগ করিয়া কাহারও তলপেটে উপস্থাপি লাঘি মারিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের সাহসের অভাব নহে—তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শে আমাদেরকে নিরীহ করিয়াছে। ইংরেজ কথকিং পরিহাসের ভিত্তিতে আমাদেরকে “mild Hindu” বলিয়া থাকে—বস্তুতই আমরা মাইল্ড হিন্দু। ইহাতে আমাদের অস্থবিধা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতেছি এবং এখন বর্তমান অবস্থায় কী করা কর্তব্য, তাহাও বিচার্য—কিন্তু মাইল্ড বলিয়া আমাদের লক্ষ্য বাড় হেঁট

করিবার কথা নহে। ভারতবাসী যুদ্ধকে ভয় করে বলিয়া যে কাহাকেও আক্রমণ করে না, তাহা নহে—বোম্বার-বুকে ভারতবর্ষীয় ডুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে যে, তাহারা বিনা উত্তেজনাতেও অবিচলিতভাবে যুদ্ধের মুখের সম্মুখে আপনার কাজ করিয়া বাইতে পারে—^১ কিন্তু তাহার ধর্ম, তাহার সমাজ তাহার হিংস্রপ্রবৃত্তি গোপন করিয়া দিয়াছে—এতদূর করিয়াছে যে, তাহাতে তাহার স্বার্থহানি ও অন্ত্রবিধা ঘটে এবং তাহার মান-হানি ঘটিতেছে। এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়, তবে ভীকৃতাকে যে-ভাষায় করিবে, ইহাকেও কি সেই ভাষায় করিবে ?

যাহাই হউক, ইংরেজের মার খাইয়া মার কিরাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কী কী কারণে সহজ নহে, “রাজকুটুম্ব” প্রবন্ধে তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিরাইয়া দেওয়া উচিত কিনা, সে-কথা তুলি নাই। কর্তব্য দুঃসাধ্য হইলেও কর্তব্য—বরঞ্চ সে-কর্তব্যের গৌরব বেশি। এলাহাবাদের কোনো দেশীয় ধনী ব্যাকর স্বত্বরক্ষা উপলক্ষ্যে তাহার কোনো ইংরেজ ভাড়াটিয়াকে ফুলগাছের টব লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন—সেই স্পর্ধায় তাহার কারাদণ্ড হয়। স্বত্বরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোনো ইংরেজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে এ-আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও বন্ধন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখনই ইংরেজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এই অভ্যস্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়ম সম্বন্ধে আমার সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

স্বভাবের নিয়মের অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে। কিন্তু সে-নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বাধা পরাস্তৃত্ব করিয়া নিজে এক দুর্নিবারভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবের নিয়মকেই আশ্রয় করিতে হয়।

কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ঘৃণাঘৃণির উত্তেজনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের ধর্মনীতিতে আঘাত না করিয়া থাকিতে

১ প্রাক্তন ল্যাওর নামক ব্রহ্মচরী বন্দন তিরস্কৃতপ্রণেয় গিয়াছিলেন, তখন তাহার সমুদয় ভৃত্যই প্রাপ্তবয়স্ক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কেবল চন্দনসিং ও মানসিং বলিয়া তাহার যে দুটিমাত্র হিন্দুভৃত্য ছিল, তাহার কখনো পলায়নের চেষ্টামাত্রও করে নাই—তাঁহারা আসন্নযুদ্ধের শঙ্কার এবং অসহ্য উৎপীড়নেও অবিচলিত থাকে—অথচ নূতন বেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা, সমাজে বশের প্রত্যাশা বা ব্রহ্মবৃত্তান্ত হাপাইয়া অর্থলাভের প্রলোভন, তাহাদের কিছুই ছিল না। তাহাদের প্রভুও বিদেশী এবং অজমিনের—কিন্তু তাহারা হিন্দু, অন্তর্গত বারিবার জন্ম তাহারা সর্বদাই উদ্ভূত নয়, অথচ বহিতে ভর করে না।

পারে না। অশুভপ্রবৃত্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্ধান করে না। তাহাকে দাসত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়। কোনো কোনো দুর্বৃত্ত মদ না খাইলে যেমন কাজ করিতে পারে না বিবেচ্য সেইরূপ অন্ধ না হইলে পুরানমে কাজ করিতে পারে না। গুণাগিরিকে যদি একবার রীতিমতো জাগাইয়া তুলি, তবে সে অন্ধবিবেচকের নেশায় না মাতিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে উঠিয়া-পড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চতন মহুশ্যত্বের বৃকের বক্ত হইতে সে প্রতিদিন তাহার খোরাক আদায় করিতে থাকিবে। গুণাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মহুশ্যত্বকে শোষণ করে—বাহাহুরির নেশা জাগিয়া ওঠে।

এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, শুদ্ধ উপদেশে কোনো ফল হয় না—অভ্যাস তাহা অপেক্ষা দরকারি জিনিস। মারা উচিত বলিলেই মারা যায় না, মারা অভ্যাস করা চাই। যাহাদের ঘৃণি প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহারা শিশুকালে প্রতিবেশীর ছেলেকে মারে, বিদ্যালয়ে সহপাঠীকে মারে, কলেজে *gownsmen* হইয়া *townsman*কে মারে—এমনি করিয়া একেবারে এমন পাকিয়া যায় যে, তাহাদের ধর্মগ্রন্থের উপদেশ অরণ্যে বোদনে পরিণত হয়। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার তাহার *Facts and Comments* গ্রন্থের ৩০তম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :

But the refusal to recognize the futility of mere instruction as a means to moralization, is most strikingly shown by ignoring the conspicuous fact that after two thousand years of Christian exhortations, uttered by a hundred thousand priests throughout Europe, pagan ideas and sentiments remain rampant, from emperors down to tramps. Principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood : the obligation being so peremptory that an officer is expelled from the army for even daring to question it. And in international affairs the sacred duty of revenge, supreme with the savage, is supreme also with the so-called civilized.

ইহা না হইয়া যায় না। চালের একটি খড় পোড়াইতে গেলেও সমস্ত চালে আগুন লাগে। কাড়াকাড়ি-খুঁচাখুঁচিকে সমাজের সর্বত্র প্রচলিত করিলে, তবেই আবক্তকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।

ঐচ্ছ প্রভৃতি বিলাতি কাগজে পুলিশ-আদালতের বিবরণে নিজের ত্রীকে, পুত্র-কন্তাকে, আত্মীয়-প্রতিবেশীকে যেরূপ নির্মম পাশবভাবে আঘাত করার উদাহরণ

দেখিতে পাই, আমাদের হিন্দুসমাজে তাহার সিকির সিকিও দেখা যায় না। শিকারি বিড়ালের গোক দেখিলেই চেনা যায়,—কে পিলা কাটাইবে এবং কাহার পিলা কাটিবে, এই পুলিশের বিবরণী হইতেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

আমাদের দেশে ছেলেতে-ছেলেতে স্বগড়া যদি মারামারি পর্বন্ত ওঠে, তবে বাহাতে আঘাত গুরুতর না হয়, লড়াইকারীর সে-চেটা বরাবর থাকে—গালে চড়, পিঠে চাপড়ের উর্ধ্বে প্রায় ওঠে না। সে আমাদের সমাজের শিক্ষা; দূর হইতে যুঁহুয়ে আত্মীয়তা বিস্তার করাই আমাদের অভ্যাস,—আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়া বাস করি—আমরা যদি ক্ষমা না করি, ধৈর্য না ধরি, তবে আমাদের সমাজ ভাঙিয়া যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

অতএব আমাদের দুই জাতের দুইরকম আচরণ। যুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী। আমাদের সমাজ ক্ষমা, ধৈর্য, সন্তোষ ও সর্বভূতে দয়া, এই শাস্ত্রমতের অঙ্গুলে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে সুদীর্ঘকাল হইতে আমাদের চরিত্র গঠিত। অতএব মারামারিতে আমাদেরিগকে ইংরেজের কাছে হঠিতে হয়—কেবল ভয়ে নহে, অনভ্যাসে।

যদি হঠিতে না চাও, তবে শিশুকাল হইতে ঘরে-পরে সর্বত্র তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহা আমার, তাহাতে কাহাকেও অংশ বসাইতে দিব না; যাহা পরের তাহা জবরদখল করিতে চেষ্টা করিব; দুর্বল সহপাঠীর উপর অত্যাচার করিব; যুঁহুি মারিবার সময় কাহারও নাকচোখ বাঁচাইয়া চলিব না, এবং নিষ্ঠুরতায় বিমুখ হওয়ার পৌরুষের অভাব বলিয়া গণ্য করিব।

এইরূপে যখন আমাদের আমূল পরিবর্তন হইবে, তখন ইংরেজে-দেশীতে হাতাহাতি সমানভাবে চলিবে। বাঘে-সিংহে থাবা-মারামারি যেমন অত্যন্ত আয়োজনক দৃশ্য, আমাদেরও দাঁত-ভাঙাভাঙি সেইরূপ পরমকৌতুকাবহ হইতে পারিবে।

নতুবা কী হইবে? যে-ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে ও পুরুষাঙ্কুরে স্বভাববর্ষন নহে, সে যদি কর্তব্যের অহুরোধে চোখকান বুজিয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভীষণ বর্ষনতাকে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত নখদন্ত কোথায় মিলিবে? আমরা উপদেশের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ আরম্ভ করিব, কিন্তু যে নিষ্ঠুর বিষের উল্লিখিত হইয়া উঠিবে, সেই হলহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদের নাই।

আমি এ-কথা ভয় হইতে বলিতেছি না। দাঁত ভাঙা, নাক খাঁচড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অন্তঃ বলিয়া গণ্য না-ই হইল। কিন্তু যে-গরলকে পরিপাক

করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম, সেই গরলকে উদ্ভিস্ত করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা, জানি না।

কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন কলাকল বিচার অসংগত এবং অজ্ঞায়। ইংরেজ যখন অজ্ঞায় করিয়া আমাদের অপমান করে, তখন বতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয়তো ঘুঘর পারিব না এবং হয়তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব; তথাপি অজ্ঞায় দমন করিবার জন্ত প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মহাত্মার নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অজ্ঞায়, তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অজ্ঞায় এবং বিধাতার স্ফায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে। বিশেষ হইতে, বাহাদুরি হইতে, স্পর্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া, জ্ঞাননীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুঃশাসনের কর্তব্য আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। পারীৱিক কষ্ট, ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিন্দুত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাড়ে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি। আমরা দেখিয়াছি, দুই দিক বাঁচাইয়া চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভালোমন্দ ওজন করিয়া অনেক সময় আমাদের একটা দিক অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সেরূপ রক্ষা করিতে গেলেই সেই ছিত্রযোগে শনি প্রবেশ করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে, তাহা অত্যন্ত দুর্বল হইলেও তাহাই আমাদের নিয়তবদ্ধে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশশ্রাব্য হইতেই হইবে। ধর্মের এই অমোঘ নিয়ম হইতে যুরোপ বা এশিয়া কাহারও নিকৃতি নাই।

অতএব ঘুঘাবুধি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তুণও অস্ত্র আছে, দানবের তুণও শূন্য নহে—অগ্রমস্ত হইয়া অস্ত্র নির্ধাচন যদি করিতে পারি, তবেই যুদ্ধের অধিকার অয়ে, তখন

কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা কলেশু কলাচন।

বঙ্গবিভাগ

বঙ্গবিভাগ এবং শিকাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, একথাও কোনো কোনো ইংরেজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,—এমনতরো নৈরাত্তের তাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কনগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কুল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোবার মনোহরণব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরকের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিফল কলকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হাস্ত করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীকর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাক্ত প্রবীণ ব্যক্তিরও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে-ছুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, সে ছুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ-ছুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে, কি না আছে, তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ চাপক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুজ্ঞেয়। এবং বাহা দুজ্ঞেয়, আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, দুনিভার্গিণী বিলের দ্বারা তোমরা এ-দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার চরম সঞ্চল। এই দুটার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন যদি সম্ভবমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি অপর পক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং বাহারা আমাদের পক্ষে আশ্রয় করিতে উত্তম হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব-চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। যুরোপ কার্যমনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা কণকালের জন্য রাগ করি আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরাপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। বোলো আনা অবিশ্বাসকে আগাইয়া রাখিবার যে-শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরেজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল, তখন তাঁহাকে তাহার এক ইংরেজ স্ত্রীদল বলিয়াছিলেন, "Spare him not, crush him like a worm!" কিন্তু বাঙালি সে-স্বযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফল এখনও ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদেরকে বাধা দেয়—এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, "আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক।" পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদেরকে চর্চা করিতে দেয় নাই—সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা শুলিকা নহে।

যুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে; আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাস-পরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে প্রভা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের "ত্রীষু রাজকূলেষু চ" শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ—কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা কণ্ঠস্থ তাহার ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, শুধু পুথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকূল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা:

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার

উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে, যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, হুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে-কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? উক্ত কুঠারকে গাছ যদি করুণাবশে এই কথা বলে যে, “তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব,” তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না ? গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে ?

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াশুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, “তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদেরকে নষ্ট করিতে চাও।” এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, “তোমরা বাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।” বলিহারি এই “অতএব”।

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষার্থীও যথানিয়মে পালিত হয় না—স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয়, তাহা গ্রহণ না করি কেন ? আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজাধ-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেক্ষণ বনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম, তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো কল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো গলিসি উপলক্ষ্যেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বুধা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি বা কপটভাবে তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরেজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ভড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তার-ঘাটে, আগিসে-আগালতে, রেল-ট্র্যামে, কাগজে-পত্রে, সভাসমিতিতে উক্তমন্ত্রণে পরস্পরের মন-জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরেজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরেজি সাহিত্যে

বিলাতি কান্দে বাড়ালিছাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদেরকে বিশেষভাবে সন্ধানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরিবাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন? গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না, আমাদের কি এমন কপাল।

পরের কাছে সম্পূর্ণ আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য হ্রদ্বত হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম? আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ-সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই, এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধধারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্রের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া বাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল ধরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্রের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ-কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেঁচাতেই আমাদের ঐক্যপ্রকৃতি হিতগণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে স্ফুটভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিফল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি আগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টার প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেঁচাই আমাদের বর্ধার লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা বর্ধারভাবে অসুস্থ করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাহার বহু বাহুপাশে বাধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাহার প্রসারিত

কোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্বপশ্চিম, দ্ব্যপিন্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের দ্বারা একই সনাতন বস্তুত্বোত্তে সমস্ত বস্তুদেশের শিরা-উপশিরার প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদেরকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে, এ-ভর যদি আমাদের জন্মে, তবে সে-ভরের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শক্তির কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, হৃদে-হৃদে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই হইল প্রাণের কথা,—ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভকতির কথা যদি কিছু থাকে, যদি এমন সম্বন্ধ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বস্তুবিভাগস্বত্রে ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরিবাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে, তবে সে-সম্বন্ধে আমাদের বস্তুত্ব এই যে, গুরে বটে। কিন্তু কী করিবে? কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক, কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই—আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা কান্ড হইবেন কেন? মনে করো না কেন, কথামালার বাধ যখন মেঘশাবককে বাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, “তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিল, তোকে মারিব”—তখন মেঘশাবক বাধকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, “আমি স্বরনার নিচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা ইহল কী করিয়া?” তর্কে বাধ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেঘশব্দের কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল?

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর, সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদেরকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজ-প্রতিনিধি তাহা অঙ্কশে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন, “তোমরা কোনো কর্মের নও।” আমরা হাহাকার করিয়া মরিয়া, “আমাদের অধিকার গেল।” অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারানী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, বোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব—কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি, তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী? সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে? ময়দানে মহারানীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে, না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে

এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রেতান্মাকে কলিকাতা টাউনহল হইতে উদ্বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদের কাছে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে, সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশাস হইব না। এ-কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্নেন্ট একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই আমরা আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো তিকালক অসুগ্রহে আমাদেরকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নিচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত করণ করিলে কললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গবর্নেন্ট নানাবিধ অসুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদেরকে মাহুষ করিতে পারিযেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অসুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হত্যা করিয়া তাহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবে, তখনই আমাদের নিজের ভাগ্যের কী আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে,—আমাদের নিজের শক্তি দ্বারা কী সাধ্য, তাহা জানিবার সময় হইবে,—আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত, তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবে। যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু গ্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোষ্ঠিলি অঙ্ককারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূলা বুঝিব—তখন মাতৃভাষার ব্রাহ্মণের সহিত সুব্রহ্ম-লাভক্ষতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বস্ত্য করিতে পারিব, প্রোভিনশাল কনফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষার ছর্ষোধ্য বক্ষুতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরেজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চোটার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্নেন্টকে

বলিব ধৃত—তখনই অস্বস্তি করিব, বিদেশীর এই রাজস্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন, আমাদেরকে বাহা ঘাচিত ও অবাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদেরকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রেরণ চাহি না, প্রতিকূলভার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিজের সহায়তা করিয়া না, আমরা আমাদের অস্ত্র নহে, পরবশতার অহিংসের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়া না—তোমাদের কল্পমূর্তিই আমাদের পরিজ্ঞান। অগতে অড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে;—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, হৃদয় নহে।

১০১১

দেশের কথা

শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউসর মহাশয়ের রচিত ‘দেশের কথা’ নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আনন্তে তিনি লিখিতেছেন :

“এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ভিগবি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসজ্জনগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অশ্লষ্টভাবে আমাদের ধারণার ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুশ্লষ্ট, জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

“কোনো সাধুপুণ্ডিত হুসর উজান দাববদ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো হুসরন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কন্ডাল দেখিলে মনের বেদন অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউসরমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেসস ও স্ট্যাটিস্টিক্স হইতে সমৃদ্ধ কথ্য বিশ্লেষণে একটি বর্বরোত্তরী দৃষ্ট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃষ্ট একটি বিরোধান্ত নাটকের দ্বার,—প্রত্যেক এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজের দুঃখদারিত্ব ও দুঃখের চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। এইরূপ ভাবের দ্বার আমাদের কতকগুলি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।”

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন :

“দেউসরমহাশয় বলেন, পুনঃপুনঃ আলোচন করিলে পরবর্ত্তক অবস্থাই আমাদের কথার কর্ণপাত করিবেন।”

শিক্ষাটা কি এই হইল? ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই শিক্ষাস্ত হইতেছে যে, সেই প্রবলজাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপপ্রাপ্ত্য ফিরিয়া পাওয়া যায়? ব্যাপারটা এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব? একটা ভোঁ কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় তো ওই অরণ্যে বোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে: ইংরেজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমূর্ণ হইতেছিল। মুখে আশ্বাসন করিয়া বাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মতো সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজম-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্তর্গত বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ওই নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোকালুক্ষি করিয়া কোনো কল নাই। প্যাট্রিয়টিজমের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে কতি নাই—যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে “বাদেশিকতা” কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বাদেশিকতার ভাবধানা এই যে, স্বদেশের উর্ধ্ব আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না, সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উপাধন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সভ্য দয়া মঙ্গল সমস্ত নিচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে-ব্যাপারটা হয়, তাহাই প্যাট্রিয়টিজম শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের অন্ত আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের অন্তই করে। ইংরেজ কখনোই এক-কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে করাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা

আছে, অতএব সে-সত্যতার আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি ; —নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বাটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, বিধামাত্র করে না। তাহার বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাত কীণজীবী নহে, অতএব কী জানি, লাভ করিতে গিয়া মূলধনহীন হারানো, অসম্ভব নহে। এ-স্থলে স্থানিবুদ্ধির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ভালগালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিক্ততে শাস্তিহীন প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলবৃগ লক্ষ্যের বক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, বার্ষিকরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। বর্ষেকীয় বার্ষিকরতা আজ সেইজন্য কেবলই পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে শুদ্ধ ভয় দেখাইয়া তত্ত্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী স্বেন হেডিন Sven Hedin-এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন ইংরেজের তিক্তত-আক্রমণপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :

"The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words "Love thy neighbours as thyself", "Thou shalt not steal", "Thou shalt do no murder", "Peace on earth and goodwill towards men", instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ-সকল কথাই তাৎপর্ষ্য আমাদেরকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইঞ্জিনবই যে সত্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে, তাহা নিশ্চয় জানিয়া বর্ষাক্ষ মনুষ্যজাতির জন্য অন্ততঃ সন্ধান করিতে হইবে—তখন জান হইতেও পারে যে, মনুষ্যজাতির জন্য পাক্কাৎ শত্রুগণীদের হাতের স্বীকার করা আমাদের পক্ষে

অত্যাশঙ্কক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিভাত অবজ্ঞায় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অল্পের অভাবে ক্লশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া করিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায়, ধর্মই বা কোথায়? আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়? কাজেই সেক্ষেত্রে দরখাস্ত করিতেই হয়—শুধু ইংরেজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলিই না।

একদিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপরদিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উত্তম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরেজিতে বাহাকে নেশন অর্থাৎ পোলিটিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে বাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সঙ্কে অভিমাত্রায় মুগ্ধতাব থাকা কিছু নয়। এ-কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতত্ত্বই মহুগ্ধত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে,—মহুগ্ধত্বকে জ্ঞানশালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। জ্ঞানশালত্বের সুবিধার খাতিরে মহুগ্ধত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা বাটবে, জ্ঞানশালত্ব শুধু দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরেজের তরফের বসদের মধ্যে রাশি রাশি ভ্যাঙ্গাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মহুগ্ধত্বের মঙ্গলকে যদি জ্ঞানশালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে জ্ঞানশালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্তথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।

বালাশিক্ষায় প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও নীনেশবাবুর জায় মনীবী ব্যক্তি ‘দেশের কথা’র সমালোচনার হলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন :

“গবর্ষেট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভারী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তাহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা খেতবীপাখিটাদ্রী বাণিজ্যালক্ষীর চরণনখপ্রাণ্ডে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা আমরা কোনোক্রমেই অস্তায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।”

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এপারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে ভ্রমও কতকটা মিথ্যে থাকিত। কিন্তু দেউড়রমহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল কথা, আজকাল অনেকেই মনে করি, ভ্রাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অস্ত্র সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমাদের নেশন বাধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে-নিত্যপদার্থটি, যে-প্রাপ্যপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিন্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ-কার্যে অদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, অদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অস্ত্রদিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউড়রমহাশয়ের বইখানি আমাদের সেইপথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদের পুনঃপুন নিঃফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

১০১১

ব্যাধি ও প্রতিকার

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন সে-বেদনার বেগ আমাদের গবর্নমেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্নমেন্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই।

কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিন্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলই নীড়িত করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু তথু কি তাই? এই কি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা? রাজ্যই যেন আমাদের পর কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে?

যখন দেখি পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে একটা আতঙ্ক

জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পদের অল্পগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র ঝিকিয়া চলিবে ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায় চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে।

কিন্তু আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদূর উপেক্ষার কারণ কী? ইহার কারণ, আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই? আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জ্বরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনো কারণে ইহার সঙ্গে আপস করিবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি, তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আশ্বাসনকে কখনোই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাহা স্পর্ধা।

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই “স্বদেশী” উদ্যোগ হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিস কিনি বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম অতএব ওইখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অন্তঃশত্রু নাই কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিস আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে।

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালানিবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানাস্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল—সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে শুধু কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাধ্যম এই উদ্যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না।

কিন্তু সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আশ্বাসন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা ছাড়া একমুহুর্তেই যুদ্ধ দেখি বলিয়া যে-পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহুর্তেই তাহাকে ভুজ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভার তাল চুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল, তখন আমরা নিজের আত্মশত্রু-দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ আমরা দেশকে যে বতই ভালোবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমতো কেহ কোনোদিন জানি না।

চিরদিন আমাদেরকে দুর্বল বলিয়া স্থণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদেরকে প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই কনগ্রেসি চাল, কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কনগ্রেসের মনঃসম্মতিক্রমেই নয়, দুটো একটা করিয়া লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন-তাড়নের পালা পুরাদমে আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইংরেজ আমাদেরকে যতই পর মনে করুক না কেন, প্রজাদের প্রতি ঈর্ষা উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ-প্রকার বেআইনি কৃত্যের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্পবয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে-সব ইংরেজ এ-দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া যায়—এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভিভূত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সম্মানের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত-রাজ্যশাসন-ব্যাপারে হান্ধামার পালা সহজে আরম্ভ হয় না—ইংরেজই তাহাতে বাধা দেয়। এইজন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরেজি দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন, তাহা ভয় ইংরেজ-পক্ষের দৃষ্টিতে বড়োই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল।

এখনকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের ওই একটা ভাবি মুশকিল আছে। তাহারা যখন খাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় ভুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি পড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে আমাদের উপরে খুব করিয়া হাত চালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার করে না—কারণ অল্পে অল্পে আমাদেরই শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষেত্র আমাদের দেশের মতো আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্রপারে যে-ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনও সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান কায়দাকে লক্ষ্য করিবার সংস্কার এখনও তাহাদের আছে।

এই জন্য আমাদের মতো অন্তর্দীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্যাদিক আঘাত পাইয়া চাকলা প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিসপিস ও দাঁত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য বহু—তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ঊর্ধ্ব তাহাদের কাছে অত্যন্ত অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েন্টালদের সঙ্গে

এ-রকম চাল ঠিক নয়—যেমন অন্তঃশত্রু কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌকষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুটি চালিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়গাটা বৃদ্ধিতে পারিবে।

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্ত ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজে চাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত আধমরা লোকদিগকেও মরিবার জন্ত মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না; বোম্বার-যুদ্ধের পূর্বে এবং সেই সময়ে যে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদবুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্ত। কিন্তু আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও গায়ের জালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয় ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়তো ভুলাইতে পারে কিন্তু এ-দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মতো সন্মম নষ্ট হয়।

যাহা হউক এ সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম। এই স্পর্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে, অপরপক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?

অপরপক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ-কথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কোভুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইনরক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই-একটা মাথা-কাটাকাটি ঘটিলেই আমরা এমন ভাব করি কেন, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখো দেখি ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্ধে মাতরম্ হাকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের স্তায়দণ্ড অন্ত্রাঘের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, স্তায়দণ্ডটা মাহুকের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে-হাত টলে। আজ নিয়-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলার স্তায়ের কাটা যে নানা ভিগির কোথ লইয়া

হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

অবশ্য তর্কে জিজিলেই যদি জিত হইত তবে এ-কথা বলা চলিত যে, রাগত্বের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি—এ সমস্তই সদ্বৃক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চল না। বাহা ঘটে, বাহা ঘটতে পারে, বাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এত-বড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ারভাঁটা রৌত্রবৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদেরিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, যে-কোনো কারণেই এবং যে-কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষতি করিতে যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে-চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই সহজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্বের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম—ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় নাই।

এই তো দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে-কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইরা থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে?

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিন্ন না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিন্ন সঙ্কেতই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই বিত্বকার হিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার বা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যন্তর পালের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শরতান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় তো পাইলাম কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। বাহা আমরা কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদের কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন—তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরম্ভ হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল;—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যাকথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষার কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে-সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, বাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক কর্ণাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—যে মুসলমান আসিলে জাজ্জিমে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হাঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায় শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে-শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে-দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে বাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া

যাহাদিগকে জাতিবন্ধা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ক্ষেত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ক্ষেত্রের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সত্ত্ব করিতে হইবেই।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা স্ফুটান্ধভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত; যাহারা সামান্ত অলসনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না; সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্ত শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে; মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয় মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যানীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্ত্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন মুক্তি পাইবে না।

যাহা হউক “বয়স্কট”-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজ্যমন্ত্র ও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর স্পন্দিত আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, এ-কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদের বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে; কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে সে কি কেবল নিজের জোরে? আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমতো প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষাদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, তুচ্ছ বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্ত প্রাণপণ করিয়া থাকে ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্ত এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজিপড়া শহরের লোক যখন নিম্নকর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া

চেষ্টার যুগে আছে, এ-কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যাশ্চর্য্যযোগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে চূর্ণ করিয়ো না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত স্পর্শ ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও দ্রষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অস্ত্রায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জাহুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সকলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে-শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদেরকে সামান্ত বলিয়া ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয় উপহাস করে তবে তাহা অমানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্ত কেহ নহি, আমরা যে কিছু-একটা করিতেছি ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পনেরো করিয়া ফলাইয়া কেবলই সাগরপারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না মনে করি। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা। আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী রচনা লইয়া আমাদের তর্কবিতর্কের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া বাধা কাটাইয়া সিঁড়ির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদেরকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল—এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শরতান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অত্যাশ

আমাদের পাকা হইতে হইবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজ্যগঠনের স্বার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

এ-কথা নিশ্চয় জানি অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্ম-ভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই আত্মভিমান আমাদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার স্বাধাচা চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সংকল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লক্ষ্যকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আভিলাষকে এইরূপ নিষ্ফলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অন্তরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা মার্কেস্টরের রুট বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জ্বলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাহুল্য কী? ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি এ যে মগের মুহূর্ত হইল—মলির মুখে লিবারেল নীতির উলটা কথা শুনিলেই আমরা বলি এ কি পুর্বের স্বর্ষ পশ্চিমে উঠিল।

আমার নিবেদন এই এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংঘত অভিমান মনের তলদেশে হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া

ভাবিয়া দেখো দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সূদূরে। আমাদের “ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।” সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুধুমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। এই বাংলাদেশও জানে প্রেমের কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্ত আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার জন্তই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী স্নগভীর। ইহার কোন্ দৃঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে নানাদিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটি মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রৈতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি বতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝধানের এই সমুদ্রে সেতু বান্ধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদের অসম্মান কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি।

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুরাই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক। কিন্তু এখনই আমরা সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা যাহা পারিব তাহার গোড়া যদি মারিয়া দিই তবে আমাদের অগ্ৰকার সমস্ত আশ্রয়লাভ একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।

বড়াই করিয়া নিজের ও অন্তের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অগ্নায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে-সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব—স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিকর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পূর্বোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদের এই কথা বলিতেছে যে, আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি আমরা কতবড়ো ভয়ংকর সে-আলোচনার কাহারও কোনো লাভ নাই; কার্জন

আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন এবং যদি আমাদের কান্নার উপর কতবড়ো অম্লার ধমকটা দিলেন সে-কথা লইয়া অনবরত এক সভা হইতে আর-এক সভায় এক কাগজ হইতে আর-এক কাগজে মুহলধারে অঙ্গবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বলো কী কাজ করিতে হইবে? আচ্ছা মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেখলক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা স্তর আছে, সেটা একসময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্পরস্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে-দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্রাণ কী, তাঁহাদের আয়োজন কী? কর্মশূন্য উদ্বেজনায় এবং অক্ষম আশ্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম—কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে ঘেঁষে লইয়া যাওয়া না হয়। যে-অসংখ্য চরিত্রদুর্বলতার বিলাসমাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে—এ-সময়কে ঘেঁষে আমরা নষ্ট না করি।

১৩১৪

যজ্ঞভঙ্গ

কনগ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

এবারকার কনগ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ-আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে কিন্তু ঠিকমতো প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা বাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

সমস্ত দেশকে লইয়া যে-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞের কর্তারা কে কোন্ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খালাস পাইতে পারেন না। চারিদিকের অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাঁহাদের উপর। কোনো কারণে কর্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে গালি দিয়া তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বাকৃদের ভাঙারে দেশলাই জ্বালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে সন্দেহ নাই—এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই

না হয় বান্ধককেই কর্তৃপক্ষেরা আসামির দলে দাঁড় করাইয়া থাকেন—জগতের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। মণিপুরী হত্যাকাণ্ড যাহারা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের দণ্ড দিয়া তাঁহারা ধর্মবুদ্ধিকে তুষ্ট করিয়াছেন এবং আজ বাংলাদেশে যে বিচিত্র রকমের উৎপাত বাধিয়া উঠিয়াছে সেজন্য বাঙালিকেই বন্ধনপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে ওদিকে কার্জন ও মর্লির জয়ধ্বনির বিরাম নাই।

বস্তুত বান্ধককে ও দেশলাইকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে ও স্বীকার করে তাহারা এই দুটোর সংস্রবকে ঠেকাইবার জন্ত সর্বপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। দোষ যাহারই হউক বা রাগ যাহার পরেই থাকে সে-কথা লইয়া গরম না হইয়া হাতের কাজটা কী করিলে সিদ্ধ হয় এই ব্যবস্থা করিবার জন্তই তাহারা তৎপর হয়।

এবারকার কনগ্রেসের যাহারা অধাক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে-কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে এ-কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পার না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি-মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাচাইয়া কনগ্রেসের জাহাজকে কুলে পৌছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাক্সের পরিণাম নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিরোগ করিতে উৎসাহিত করাই যে ইহার সকলের চেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক উদ্বেজনার তিনি মনে রাখেন নাই। তিনি এমন ভাবে কনগ্রেসের হালের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন ওই চরমপন্থীর দলটা জলের একটা ডেউমাত্র, উহা পাহাড় নহে, যেন কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চলিবে।

আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাধিয়া কনগ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে-মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কনগ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন একটা বাধা বাহাকে ঠেলিয়া অভিস্রুত করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে বাধা হয় তা হ'ক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে—এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কনগ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা

সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্ত মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ ।

এই যে লুক্কাতা, এই যে অন্ধ নির্বন্ধ ইহা যদি দলবর্তী সাধারণ লোকের মধ্যেই বন্ধ থাকে তাহা হইলে সেটাকে মার্কিনীয় বলিয়া গণ্য করা যায়—কিন্তু বাঁহারা দলের কর্তৃপদে আছেন তাঁহারাও যদি না বুঝেন কোন্‌খানে রাশ টানিলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়, এবং কোন্‌খানে হার মানিলে তবেই স্বার্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই বলিতে হইবে সংসারে বাঁহারা বড়ো জিনিসকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, বাঁহারা কার্‌খানার লক্ষ্যকে কোনোমতেই তুলিতে পারেন না ইহারা সে-দলের লোক নহেন । ইহারা কবির লড়াইয়ের দলের মতো উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখেন—দায়িত্বদৃষ্টিকে অবিচলিত স্বৈর্যের সহিত স্মৃদুরে প্রসারিত করেন না ।

বিক্রম পক্ষের সম্বন্ধে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কনগ্রেস ভাঙিয়াছে । এক গাড়ির এঞ্জিন যদি সামনের গাড়ির এঞ্জিনকে একেবারে নাই বলিতে চায়, এমন কি, ঠেকাঠেকি হইলেও তখনও পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া যদি স্টীম চড়াইয়া দেওয়াকেই নিজের পথ খোলসার উপায় বলিয়া মনে করে তবে একটা চুরমার ব্যাপার না বাধিয়া থাকিতে পারে না । এ-অবস্থার বাঁহারা চালক তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না ।

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কনগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্ত যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কনগ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্নত হইয়া উঠিতেন না । কনগ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না ;—শনৈঃ শনৈঃ প্রত্যহ প্রত্যেকের অশ্রান্ত চেষ্টায় দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই পথের চরম গম্যস্থান সভাপতির আসন নহে, এমন কি, ওই মঞ্চটা তাহার পাছশালাও নহে ।

আর যদিই মনে কর কনগ্রেসের কর্তৃত্বলাভ দেশহিতসাধনের একটা চরিতার্থতা তবে কি এতবড়ো একটা সম্পদকে এমন অধৈর্য ও প্রমত্ততার সহিত কাড়াকাড়ি করিতে হয় । ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকেই কি অপমান করা হয় না ?

কাজির বিচারের কথা মনে আছে? দুই স্ত্রীলোক যখন একটি ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া কাজির কাছে নালিশ করিয়াছিল তখন কাজি বলিয়াছিলেন ছেলেটাকে দুইভাগে কাটিয়া দুইজনকে দেওয়া হউক। এই কথা শুনিয়া যথার্থ মা বলিয়া উঠিল ছেলে আমি চাই না অপরকেই দেওয়া হউক। যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ করা এবং মকদ্দমায় হার মানা অনায়াসে স্বীকার করে।

এবারকার কাজির বিচারে কী দেখা গেল? দুই দিকেরই এই জিদ যে বরং কনগ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো তবু হার মানিব না। ইহাতে এই প্রমাণ হয়, কোনো পক্ষই কনগ্রেসকে তেমন সত্য ও তেমন বড়ো করিয়া মনে করেন না। ইহা যে একটা জীবধর্মী পদার্থ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণহানি ও আঘাত লাগিলে ইহা দুর্বল হয় তাহা কেহ নিজের প্রাণের মধ্যে তেমন করিয়া অনুভব করেন না। তাহার কারণ কি এই নহে এই জিনিসটাকে বিশ বৎসর তা' দিয়াও ইহার মধ্যে প্রাণপদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই? সেইজন্যই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে, ধৈর্যে দীক্ষিত করে নাই। আমাদের 'পরে এইজন্যই কনগ্রেসের দাবি অত্যন্ত দুর্বল—ইহা অতি অল্পও ষেটুকু ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে চায় তাহাও পুরামাত্রায় পায় না। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য-অবসরের উদ্ভব হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই এই কনগ্রেসের জন্ত রাখিয়া থাকি এবং যাহারা রাখেন সেই কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে অতি স্বসামান্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, কনগ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কনগ্রেসের মধ্যে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ওই কনগ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কনগ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পক্ষীর হউক। তাহাকে এ-বৎসর বা ও-বৎসর কোনোরকমে দখল করিয়া বসিব এ-চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্ত দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিস্কিন্দ্যাকাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।

আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমানবশত জগতে যে-যুগে এবং যে-ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছে সেইকালে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ষ পও হইয়াছে তাহা

নহে মহান্ অনর্থ ঘটয়াছে। ক্ষমতাশালীর জিদ সত্যকে ক্ষণকালের জন্য নিজীব করিয়া ফেলিতেও পারে কিন্তু রক্তকে কখনোই ঠেঁকাইতে পারে না—এ-কথা ইংরেজ ভুলিয়াছে বলিয়া আমরা অভিযোগ আনিয়াছি কিন্তু আমরা নিজেও যদি ভুলি, বল ও কলকৌশলকেই অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি তবে প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে ধৈর্য শাস্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে; তবে বিলম্বে অসহিষ্ণু, পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশাস হইব না; বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকে সহ্য করিব এবং স্বাধীনতা বা স্বরাজ্যের যথার্থ ই অধিকার লাভ করিতে পারিব।

১৩১৪

দেশহিত

বঙ্গবাসীদের আধাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যে উদ্দীপনা জলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্তর্দেশের এ-শ্রেণীর উদ্দীপনার ঠিক নকল নহে, তাহা যে আমাদের দেশের স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ; এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।

এ-কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্ভোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

অন্তএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্য উদ্বোধিত করিয়া তোলে তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্তমান আন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কিনা তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায়

যে, দেশে যদি দুই-চারিজন মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাকল্য মাত্র বলিয়া অহুভব না করেন, তাঁহারা যদি ইহার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে-অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দহ্য করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় এবং আমাদের বাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য তাহাকেই তপ্ত স্রবণের মতো উজ্জ্বল করিয়া তোলে—তবে তাঁহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে।

কিন্তু আমরা যে এই ধর্মের মূর্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? যে ইহাকে দেখিয়াছে সে তো আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্বেগ একান্ত সতর্কতার সহিত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে—কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ফ্রটি সে সহ্য করিতে পারে না। সেই প্রাণান্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত কোনো উদ্বেগ সাধনের কুপণতায় আমাদের দুর্বল চিন্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই তবে ইহার মতো উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজ্যের সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারিদিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র চতুষ্পাশে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অহুভব করিতেছি না? তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে?

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম-জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে এইজন্য চৈতন্য যে বিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অমৃতগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা বিরূপ নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিয়াপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে বিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই? সে-বিপদ, কি কেবলই,

বাহাদিগকে আমরা শত্রুপক্ষ বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই? উন্নততা, অস্ত্রা ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না? যথার্থ চূর্ণলতাই কি উজ্জ্বলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার ভান করে না? বাহা শক্তি নহে কিন্তু শক্তির বিড়ম্বনা শক্তির্মসাধনার তাহার মতো সর্বনেশে বিয় আর তো কিছুই নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে কিন্তু আমাদের মধ্যে বাহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রভ্রয় দিতেছেন না তাঁহারাও তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভংসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। যে-শক্তি ধর্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলক্ষিগোচর হইতেন তবে তাঁহার এই সকল নকল উৎপাতকে কখনো এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দম্ভাবৃত্তি, তদ্ব্যবস্থা, অস্ত্রা পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে এ কি এক মুহূর্তের জন্ত তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন বাহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে-কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক না কেন কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্তও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।

আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়? যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই দেশহিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে? ধর্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম দ্বারা আমরা অন্তর্কে আঘাত করিতে চাই সেই অধর্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কী করিয়া, মিথ্যাকে অন্তর্যকে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রভ্রয় দিই তবে আমরা নিজেকেই মধ্যেই সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃবিদ্বেষের বীজ বপন করিব—এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে-আলোকের অভাবে পুত্র মাতাকে আঘাত করিবে, ভাই ভাইয়ের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিবে। যে-ছিন্ন দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিন্নকেই দলবৃদ্ধি-শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে-নামে যে-বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে

আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র কলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, কল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোনো কল—সে-কলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক না—সে-রূপ কোনো কল লাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, কলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে। কললাভ চরম লাভ নহে, ধর্ম-লাভেই লাভ, এ-কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না ধাটে তবে দেশহিত মাহুকের মথার্ম হিত নহে।

গ্রন্থপারচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

উৎসর্গ

উৎসর্গ ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উৎসর্গে প্রকাশিত সকল কবিতাই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) হইতে গৃহীত। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী গ্রন্থাক্রমে মুদ্রিত না হইয়া ভাবানুসঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সম্বন্ধিত হইয়াছিল; এবং এই সকল বিভাগের প্রবেশকরূপে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, পুরাতন কোনো কোনো কবিতাও অবশ্য প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সমসাময়িক কালে নূতন রচিত অনেক কবিতাও কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়, অল্প কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ পরে যখন রহিত হয়, এবং পূর্বের স্তায় স্বতন্ত্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা-গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে তখন যে-সকল কবিতা শুধু কাব্যগ্রন্থেই প্রকাশিত হইয়াছিল কোনো স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা আবশ্যক হয় এবং উৎসর্গ প্রকাশিত হয়।

১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থ হইতেই কবিতাগুলি সংকলিত বলিয়া, কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত স্বরণ ও শিশুর পরেই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে উৎসর্গ মুদ্রিত হইল।

কাব্যগ্রন্থের কোন বিভাগে কোন কবিতা প্রবেশকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল পর-পৃষ্ঠায় তাহার একটি তালিকা মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে যেগুলি উৎসর্গে মুদ্রিত হয় নাই, এবং যেগুলি স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইলেও রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় নাই পাদটীকার সেগুলির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিভাগ	প্রবেশক
১. যাত্রা	কেবল তব মুখের পানে
২. হৃদয়-অরণ্য	কুঁড়ির ভিতরে
৩. নিষ্কমণ	আঁধার আসিতে*
৪. বিশ্ব	আমি চঞ্চল হে
৫. সোনার তরী*	তোমায় চিনি বলে
৬. লোকালয়	হে রাজন তুমি আমারে
৭. নারী	সাক্ষ হয়েছে রণ
৮. কল্পনা*	মোর কিছু ধন
৯. লীলা	তোমারে পাছে সহজে বুঝি
১০. কোঁতুক	আপনারে তুমি করিবে গোপন
১১. ঘোঁবনম্বপ্ত	পাগল হইয়া বনে বনে
১২. প্রেম	আকাশসিদ্ধি মাঝে
১৩. কবিকথা	দূরারে তোমার
১৪. প্রকৃতিগাথা	তোমার বীণায় কত তার আছে
১৫. হতভাগ্য	পথের পথিক করেছে
১৬. সংকল্প	সেদিন কি তুমি এসেছিলে
১৭. স্বদেশ	হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
১৮. রূপক	ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে
১৯. কাহিনী	কত কী যে আসে
২০. কথা	কথা কও কথা কও*
২১. কণিকা	হার গগন নহিলে
২২. মরণ	চিরকাল এ কী লীলা গো
২৩. নৈবেদ্য*	প্রতিদিন তব পাশে*
২৪. জীবন-দেবতা	আজ মনে হয় সকলের নামে
২৫. স্মরণ	...
২৬. শিশু	জগৎপারাবারের তীরে*
২৭. গান	...
২৮. নাট্য	আঁধারে আসিয়া এরা

কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত-অগ্রকানিত অনেক কবিতাও উৎসর্গে সংগৃহীত হইয়াছিল :

বিভাগ	কবিতা
বিশ্ব	সব ঠাই মোর
সোনার তরী	মস্ত্রে সে যে পুত
নারী	যদি ইচ্ছা কর তবে
কবিকথা	বাহির হইতে দেখো না আছি আমি বিন্দুরূপে আমি ঘারে ভালোবাসি শূণ্য ছিল মন দেখো চেয়ে গিরির শিরে ওরে আমার কর্মহারা আমার থোলা জানালাতে আলো নাই দিন শেষ হল, ওরে ভোরের পাখি ডাকে আমার মাঝারে যে আছে না জানি কারে দেখিয়াছি আজিকে গহন কালিমা আমাদের এই পল্লীখানি হে নিস্তরু গিরিরাঙ্গ কাস্ত করিয়াছ আজি হেরিতেছি আমি ভূমি আছ হিমাচল হে হিমালয়, দেবতাস্বা ভারতসমুদ্র তার ভারতের কোন্ বৃক্ষ নিবেদিল রাজভূতা অত চুপি চুপি কেমন সে তো সেদিনের কথা নব নব প্রবাসেতে
প্রেম	
প্রকৃতিগাথা	
হৃদভাগা	
রূপক	
বদেশ	
কাহিনী	
মরণ	

১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থের যে-সকল কবিতা অল্প কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই এবং উৎসর্গে সংকলিত হয় নাই, এবং ১৩১০ সালে ও তৎপূর্বে রচিত যে-সকল কবিতা অল্প কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, (বা প্রকাশিত হইলেও ঐসকল গ্রন্থে এখন মুদ্রিত হয় না, বা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঐসকল গ্রন্থে মুদ্রিত হইবে না) কিন্তু সমগ্রাত্মকম বিবেচনায় কাব্যগ্রন্থে ও উৎসর্গে সংকলিত হইতে পারিত, এইরূপ কতকগুলি কবিতা উৎসর্গের সংযোজনে মুদ্রিত হইল ।

কাব্যগ্রন্থ হইতে :

বিভাগ	কবিতা
যাত্রা	হে পশ্চিক কোন্‌খানে*
সোনার তরী	কত দিবা কত বিভাবরী
স্বদেশ	হে ভারত আজি নবীন বর্ষে* নববৎসরে করিলাম পণ*
নৈবেদ্য	রোগীর শিয়রে রাখে কাল যবে সন্ধ্যাকালে নানা গান গেয়ে কিরি
লোকালয়	হে জনসমূহ আনি ভাবিতেছি*

সাময়িক পত্র ইত্যাদি হইতে :

ওরে পদ্মা ওরে মোর রাক্ষসী প্রেরসী*
বিরহ-বৎসর পরে মিলনের বীণা*
অচির বসন্ত হায়* ;
দিয়েছ প্রাণের মোরে ককণানিলয়*
কী কথা বলিব বলে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ “কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিয়ে গছ” কবিতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে—বসন্ত এই বেদনাই জ্ঞানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে—ইহাই গর্ভবেদনা ; এবং যত্নবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপৰ্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহিমুখী হইয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে—নিঃশিলের মধ্যে তাহার

বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম—ইহা মুক্তির বেদনা—একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা—বাহিরে আসিবে এবং পীড়া অবসান হইবে—“কুঁড়ির ভিতরে কাদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে” কবিতাটির ভিতরকার তাৎপৰ্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি “মুমুহু”। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে—যদি অন্য কোনো সূত্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চরনিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়া।

খেয়া

খেয়া ১৩১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

“আমার ধর্ম” প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪) প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ খেয়ার কোনো কোনো কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

খেয়াতে “আগমন” বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাতে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শ্রবণের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরাধ্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ঐ খেয়াতে “দান” বলে একটা কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম? “এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।”...

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।...

“অনাবস্তক” কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (৪ অক্টোবর ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

খেয়ার “অনাবস্তক” কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করি নে। আমাদের সুধার জগতে বা অত্যাবস্তক, তার কতই অপ্রয়োজনে কেলাহড়া বার জীবনের ভোজে, যে ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে দ্বার তাতে দৃষ্টি নেই—সেই আবস্তক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অবাচ্য বঞ্চিত হয় যে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ

চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুরপরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেইদিকে যেখানে তার জন্তে প্রত্যাশা নেই ক্ষুধা নেই।

রাজা

রাজা ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই “রাজা” প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া [প্রথম সংস্করণ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।—“লেখকের নিবেদন,” রাজা।

এই “বর্তমান সংস্করণ”ই এখন প্রচলিত, রচনাবলীতেও এই সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

রাজা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরে অস্ত্রান্ত নাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অরূপ রতন (মাস ১৩২৬) “নাট্যরূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।” “যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল” (পৌষ ১৩৩৮)। রাজা নাটকটি রবীন্দ্রনাথ পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বা প্রকাশিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি-আকারে রক্ষিত আছে।

“আমার ধর্ম” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনা করিয়াছেন :

“রাজা” নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে হুল রাজার গলায় দিলে মালা—তার পরে সেই কুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম বুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে বোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা বা-কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে বাধা। কিন্তু তাকে যদি বাধাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই বাধাতেই সৌন্দর্য তাতেই আনন্দ।

অরূপ রতনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাঙারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনব্যাপ্তি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অস্তিমাণে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে,

যুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সন্নিহী সুরক্ষমা তাহাকে নিবেদন করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আস্থান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার ঘারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজ্য বলিয়া ভুল হইবে। সূদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আশ্রয় লাগিল, অন্তরের রাজ্যকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজ্যের দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজ্যের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া হৃৎকের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে পাড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্কলিত করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দেরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষের কবিতা “নির্ঝরিনী” কবিতাটি স্বতন্ত্রভাবে পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত হইলে, কেহ কেহ তাহার অর্থব্যাখ্যানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। শ্রীমুনীলচন্দ্র সরকারের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

শেষের কবিতা গ্রন্থে “নির্ঝরিনী” কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিল্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তন ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া লোলে তার বরনার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে, যখন আমার চৈতন্তের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বের নিত্য-উৎসবের সঙ্গে মানবচৈতন্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩৪৩

এইরূপ অন্তান্ত পত্রের উত্তরে “নির্বিরণী” সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ প্রকাশ করেন :

শেষের কবিতায় নাট্যিকাকে সম্বোধন করে উপজ্ঞানের নায়ক বলছে, তুমি স্বরনার মতো, তোমার চিস্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিকলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাকুক,—তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে বাণী দাও তোমার প্রেমের যে-বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো, সত্য করো।

তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহবেগে, তার প্রেরণায় আমার স্বার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।

এক কথায় এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্তের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিকলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রাজা প্রজ্ঞা । সমূহ । পরিশিষ্ট

রাজা প্রজ্ঞা ও সমূহ গল্পগ্রন্থাবলীর দশম ও একাদশ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

আত্মশক্তি (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড), ভারতবর্ষ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড) রাজা প্রজ্ঞা, সমূহ ও স্বদেশ (গল্পগ্রন্থাবলী, দ্বাদশ ভাগ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড)—এই কয়খানি গ্রন্থে ১৩১৫ ও তৎপূর্ববর্তীকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ প্রায় সমস্তই সন্নিবিষ্ট হয়। যে-সকল রচনা সম্ভবত একান্ত সাময়িক বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই, বা অল্প কোনো কারণে বাদ পড়িয়াছে, ১৩১৫ বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক রচনার অধিকাংশই বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। কতকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথের বলিয়া অস্বীকৃত হইলেও সে-সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই ; পরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গেলে এবং রবীন্দ্রনাথের বলিয়া পরিজ্ঞাত আরো রচনা সংগৃহীত হইলে, সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ খণ্ডে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অন্তান্ত রচনার সহিত মুদ্রিত হইবে।

রাজা প্রজা, সমূহ ও বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম মুদ্রণের তালিকা নিচে প্রকাশিত হইল। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই সকল সাময়িক পত্রের অনেকগুলির সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন (সাধনা, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০১-০২; ভারতী, ১৩০৫; বঙ্গদর্শন, ১৩০৮-১২; ভাণ্ডার, ১৩১২-১৩—রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিচালিত বা সম্পাদিত সাময়িক পত্রের ইহাও সম্পূর্ণ তালিকা নহে। সাধনার প্রথম তিন বৎসরের সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থাকিলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান লেখক ছিলেন), এবং এই রচনার অনেকগুলি সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাজা প্রজা

ইংরেজ ও ভারতবাসী^১

রাজনীতির বিধা

অপমানের প্রতিকার

সুবিচারের অধিকার

কণ্ঠরোধ

অত্যাধিকার^২

ইম্পীরিয়ালিজম

রাজভক্তি^৩

বহুস্বত্বতা

পথ ও পাথেয়^৪

সমস্তা

সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০

সাধনা, চৈত্র, ১৩০০

সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১

সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১

ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৫

বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩০২

ভারতী, বৈশাখ, ১৩১২

ভাণ্ডার, মাঘ, ১৩১২

ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩১২

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৫

সমূহ

‘‘বদেশী সমাজ’’

বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট^১

দেশনায়ক^২

সকলভার সঙ্গপার^৩

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনের অভিভাষণ^৪

সঙ্গপার

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১১

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩

বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১১

প্রবাসী, কান্তন, ১৩১৪

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৫

পরিশিষ্ট

সার লেপেল গ্রিকিন

ইংরেজের আতঙ্ক

সাধনা, শ্রাবণ, ১২৯৯

সাধনা, পৌষ, ১৩০০

রাজা ও প্রজা

সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০১

প্রসঙ্গ কথা ১—৫

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫

মুখুজো বনাম বাঁড়ুজো

ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৫

অপর পক্ষের কথা

ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৫

আলট্রা কনসার্ভেটিভ

ভারতী, কার্তিক, ১৩০৫

বিরোধমূলক আদর্শ

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩০৮

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি

বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩০৮

রাজকুটুম্ব

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১০

ঘৃণাঘৃণি

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১০

বঙ্গবিভাগ

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

দেশের কথা

বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩১১

ব্যাপ্তি ও প্রতিকার^{১৫}

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪

যজ্ঞভঙ্গ^{১৬}

প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৪

দেশহিত

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১৫

স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্বে যখন দেশে মতানৈক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন “দেশনায়ক” প্রবন্ধে (পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহৃত মহাসভায় পঠিত, ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ “দেশের সমস্ত উজ্জমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায়”রূপে “কোনো এক জনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার” করিবার প্রস্তাব করেন,^{১৭} এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে “সকলে মিলিয়া প্রাকান্তভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্ত” সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন :

১৮ অল্পকাল পূর্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল, তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারিদিকে “নেতা” “নেতা” “নেতা” রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত শুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মত সাহিত্যরসবিহীন অকর্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিত্যন্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শাস্তিপ্রিয় ভ্রাতৃলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, “আমি নেতা নই” বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠগড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।

হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট ‘নেতা’-বান্ধুগ্ৰস্ত হইবার কারণ এই যে,

কাজের হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সর্ব-প্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সেই ডাকে প্রথম ধাক্কার বাজারে ছোটো-বড়ো খুঁটা-খাঁটি বহুবিধ নেতার আমদানি হয় এবং লোকে প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না,— নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার, অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই—নহিলে আমাদের আশা-উজ্জ্বল-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপত্যকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন “নেতা নেতা” করিয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্বার সর্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ-সমক্ষে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে ঐহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে, তাঁহার পরিচয় অল্প যেন পরিশুদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি, এই সভাস্থলে দেশনায়ক বলিয়া আমি যাহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ংবরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমালা পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য ও কৃত্রিমের তেজ ঐহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাহার অক্লান্ত কর্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্ভোগের দিনে যাহারা নেতা বলিয়া ধ্যাত, সকলের উপরে যাহার মস্তক অল্পভেদী গিরিশিখরের মতো বজ্রগর্ভ মেঘগুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই নুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্ত আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।

নুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নববর্ষাবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজশিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই—লোকে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে, অল্পবস্ত্র-পদমান সমস্তই রাজস্বাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে।

আমরা কদম্ব ধরিয়া ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম—ভাড়া হইতে উত্তর আসিল, “এস না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।” কিন্তু আমাদের নামিবার ঘাট নাই; আর-আর সমস্ত বড়ো-বড়ো জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এক-ইন্ধি নড়িতে চায় না। এদিকে কদম্ব আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল—দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না; বাধাও নাই, স্তবধাও নাই। আর-আর সকলে দিবা কেনাবেচা করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জলিতেছে, ব্যাণ্ড বাজিতেছে। আমরা সঙ্ঘাত্যাক্ষের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজবাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের “দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ” অঙ্কুশ অধাবসারের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কতদিন, কত বৎসর কাটিত, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার রূপার পশ্চিম-আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়োরকম বড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূর্বের মুখে দৃষ্ট করিয়া ছুটাইয়া চলিল অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যাণ্ড বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে চলুক্ষ্মি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অতৃপ্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়ো-বড়ো ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সমুদ্রে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞ আমাদের মাতা আমাদের জন্ত এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনিই আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চূষন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে বিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিম-বন্দরের শাখা-পাখরে বাঁধানো সোনার দীপে এমন সুস্বিষ্ট সার্থকতা একদিনের জন্তও লাভ করিয়াছেন? —এমন আশাপরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন?

বিধাতার রূপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পারিলাম, তো পারিলাম—নতুবা অতলক্ষ্মী লবণাবুগড়ে ডুবিয়া মরাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হইবে। কাপ্তেন, এখানকার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে আমাদের বিস্তর

লেনাসেনা করিবার আছে—শিক্ষাদান, সুবাসনা, অন্নবস্ত্র, সমস্ত আমাদিগকে বোকাই করিয়া লইতে হইবে—এবারে আর সেই রাজ-অট্টালিকার শূন্যগর্ভ শুষ্কজটীর দিকে একদৃষ্টিতে দূরবীণ করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা আজ যে-বাহার ছোটোখাটো মূলধন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি—এবারে আর বাধাবন্ধরে পুনঃপুন বন্দনাগীত গাওয়া নয়,—এবার পাহাড় ঝাটাইয়া, ঝড় কাটাইয়া আমাদিগকে পার করিতে হইবে কাপ্তেন।—তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে—হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত, ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে। এতদিন যে-নামের দোহাই পাড়িতে পাড়িতে দিন কাটিয়া গেল, সে-নাম ছাড়িয়া আজ যথার্থ কাজের পথে পাড়ি দিবার বেলায় ঈশ্বরের নাম করো, আমরাও এককণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে তোমার চতুর্দিকে সম্মিলিত হই।...

১৯ আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গ-দেশের এই মঙ্গলমহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, একরূপ কোনো প্রস্তাব কখনোই সর্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। ষাঁহার প্রস্তুত আছেন, ষাঁহার সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত কুদ্রবন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।...

২০ ষাঁহার সাধক, ষাঁহার দেশের গুরু, তাঁহারা স্বাতিপ্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া, বিরোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও দেশের মতি কিরাইতে চেষ্টা করিবেন—আর ষাঁহার দেশের নায়ক, তাঁহারা দেশকে গতিদান করিবেন। যে-সকল জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, ষাঁহার চলিতেছে, তাহার এইভাবেই চলিতেছে। এক দল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর-এক দল বন্ধের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রাণশক্তি-গতিশক্তিকে প্রবর্তিত করিতেছে। এই উভয় দলের পরস্পরে অনেক সময়েই একমত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া ষাঁহারা চলাইতেছে, তাহাদের বসিয়া থাকিলে চলে না। কারণ, শিক্ষা শুধু উপদেশে নহে, চলার মধ্যেই শিক্ষা আছে।

অতএব এতদিন যে সুরেন্দ্রনাথ বিনা নিয়োগে নিজের ক্ষমতাবলেই দেশকে সাধারণছিতের পথে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে নিয়োগপত্র দিয়া

নায়কপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। নিয়োগপত্র দিলে তাঁহার ক্ষমতা স্থানস্থিত এবং তাঁহার দায়িত্ব গভীরতর হইবে এবং তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইংরেজিবিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন—যে-সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এ-দেশে যাহা অসংগত আবর্জনারূপে গণ্য হইবে, অল্পকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না,—বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা যুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনোই এ-দেশের মুক্তিকার মূলবিস্তার করিয়া ফলবান হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্তমানকালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সংগত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি কী করিবেন না-করিবেন, এ-স্থলে তাহা অসুমান ও আলোচনা করা বৃথা—কেবল ইহাই সত্য যে, তাঁহার করার মধ্যে আমাদেরই কর্ম প্রকাশ পাইবে, দেশ তাঁহারই মধ্য দিয়া নিজেকে বাস্তব করিবে, তাঁহারই এক হস্ত দ্বারা নিজের প্রাণা গ্রহণ করিবে ও তাঁহারই অন্ত হস্ত দ্বারা নিজের দান বিতরণ করিবে—ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে, সত্যকে লঙ্ঘন না করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিব না এবং এই নিয়ম ও নিয়ন্তাকে স্বেচ্ছাকৃত স্তব্ধতাং অসজ্জা বাধাসহকারে মান্ত করাই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আবশ্যসম্মান বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত বলক্ষয়কর দ্বিধা ও সমস্ত আত্মাভিমানের ক্লেশকণ্টক সবলে উৎপাটিত করিয়া যদি একের মধ্যে আমরা আমাদেরইকে নিবিড়ভাবে একত্র করিতে পারি, তবে আর আমাদেরইকে নিজের শক্তির অহংকার করিবার জন্ত সর্বদা আশ্ফালন করিতে হইবে না, পরের বিমূঢ়তাকে ফিরাইবার জন্ত প্রাণপণে অত্যাশ্রিত সৃষ্টি করিতে হইবে না—তবেই আমরা শাস্তভাবে, বলিষ্ঠ ও ধীরভাবে মহৎ হইতে পারিব এবং নিজের দেশের মধ্যে নিজের স্বার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া কর্মগৌরবের মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া পোলিটিক্যাল ধনুঃ-কারের অভ্যাগ্ন আক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইব—আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত-আত্মসংযুক্ত হইব এবং নিজের চাপসাবিহীন মর্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।

“দেশনায়ক” প্রবন্ধ বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের “বক্তৃত্ত্ব” হইবার পর লিখিত। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় বলেন :

এবারে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙালি খুব একটা আঘাত পাইয়াছে, সে-কথা সকলেই জানেন। ভাতে মারার চেয়ে হাতে মারাটা উপস্থিতমতো গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। আইন কলের রোলাবের মতো নির্মমভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিশের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কী বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভবতঃ ভদ্রলোকদের সদাসর্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্তগণ্য লোকের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা প্রতিকারের পথ, একটা কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে, বেদনা নিজের প্রতি উত্তেজনার সমস্ত বেগ আকর্ষণ করিয়া অসংবত হইয়া অপরিমিত-রূপে বড়ো হইয়া উঠে। আমরা জানিতাম, ব্রিটিশরাজ্যে আইন-জিনিসটা ধ্রুব—এইজ্ঞাক্ত সকল উপদ্রবের উপর আইনের দোহাই পাড়িতাম—কিন্তু আইন স্বয়ং বিচলিত হইয়া উপদ্রবের আকার ধারণ করিলে ক্ষণকালের জন্তও মনকে শান্ত করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্যে তুফান উঠিলে লোকে ডাঙার দিকে ছোটে—কিন্তু ভূমিকম্পে ডাঙা যখন স্বয়ং দুলিতে আরম্ভ করে, যাহাকে অচল বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যখন চঞ্চল হইতে থাকে, তখনই বিভীষিকা একেবারে বীভৎস হইয়া উঠে।

এইরূপ সাধারণ চঞ্চলতার সময় সংপরামর্শের সময় নহে। আমিও এই দেশব্যাপী ক্ষোভের সময় স্থিরভাবে মন্থণা দিতে অগ্রসর হইতাম না। কাল—যিনি নীরব, যিনি বিধাতার সুদৃঢ় দক্ষিণহস্ত, যিনি সকল কলকে ধৈর্যের সহিত পাকাইতে থাকেন, আমিও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারই নিগূঢ় নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিঃ স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি মহান আশ্বাস এই অসময়েও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে কর্তৃপক্ষদের সহিত সংঘাতে বাঙালি জরী হইয়াছে। এই সংকট-কালে বাঙালি যে-বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সন্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অস্ত্র উপস্থিত হইয়াছি।

সেদিনকার উপদ্রবে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নারকবর্গের অবিচলিত শৈর্ষ দেখিয়া বিশ্বাসঘিাত হইয়াছেন। যে উৎপাত কোনোমতে আশা করা যায় না, তাহা সহসা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িলে তখনই মানুষের গভীরতর প্রকৃতি আপনাকে অনাবৃতভাবে

প্রকাশ করিয়া ফেলে। সেদিন বাঙালি নিজেকে যেক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের লক্ষ্যের কোনো কারণ ঘটে নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, সেদিন সভাপতিকে লইয়া যখন প্রতিনিধি ও সভাসদগণ মন্ত্রণাসভার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নায়কবর্গের আদেশ অনুসারে যাত্রিগণ কেহ একটি যষ্টিও গ্রহণ করেন নাই। এবং পুলিশ যখন নিরস্ত্র-তঁাহাদের উপর পড়িয়া আঘাতবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনও নায়কদের উপদেশ স্মরণ করিয়া তঁাহারা দৃঢ়তার সহিত সমস্ত সঙ্ক করিয়াছেন।

আমি জানি, এ-সম্বন্ধে অবিচারের আশঙ্কা আছে।

“ভেজবিত্তবলিগতা মুখরতা বস্ত্রখাশক্তিঃ হিরে”

তেজস্বিতাকে অহংকার, বাগ্মিতাকে মুখরতা এবং সৈবর্ষকে অশক্তি বলিয়া নিন্দকে নিন্দা করে। সময়বিশেষে সৈবর্ষ অশক্তির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন তাহা বীৰ্য হইতে প্রসূত হয়, তখন তাহা বীৰ্যের শ্রেষ্ঠলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। বরিশালে কর্তৃপক্ষ অসংযমের দ্বারা হাঙ্গরর কাপুরুষতা এবং আমরা সৈবর্ষের দ্বারা শক্তির গান্ধীর্ষ প্রকাশ করিয়াছি, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে সাময়িক উৎপাতের দ্বারা আত্মবিস্মৃত না হইয়া সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা উদ্বেল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিয়াছিলাম, ইহার দ্বারা ই আশাবিত্ত হইয়া উত্তেজনাশাস্তির পূর্বেই অগ্গকার সভায় আমি দুই-একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থতাসাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গুণে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা, ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদের পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

“বয়কট”-আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন :

“আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে ‘বয়কট’ শব্দের আশ্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বলিয়াছি, এ-কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিয়াছি — ‘আমরা যুনিভার্সিটিকে বয়কট করিব।’ কেন করিব? যুনিভার্সিটি যদি ভালো জিনিস

হয়, তবে তাহার সঙ্গে গারে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। যদি যুক্তিভিত্তিক অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদেরকে অস্বীকৃত দান না করে, তবে তাহাকে বর্জন করাকে বরকট করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম ছাড়িয়া দেওয়ারকে বরকট করা বলে না। কচ দৈত্যগুপ্তর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদেব উৎপীড়ন ও গুপ্তর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য ও কোঁশল অবলম্বনপূর্বক বিদ্যালান্ড করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপান ও যুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতোই বিদ্যালান্ড করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের বাহাতে ইট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সঙ্কল্প করা পৌরুষেরই লক্ষণ--তাহার পর সংগ্রহকার্য শেষ হইলে স্বাভাবিকপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনোই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বরকট তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনোই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্যোগের আত্মমানমাত্র দেশ একমুহূর্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জন এতবড়ো লোক নহে; এই আত্মমান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহবারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাদর পাইয়াছে। আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এতবড়ো অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগি যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্বরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।

আরও লক্ষ্যের কারণ এই যে, বরকটের মধ্যে আমরা যে স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছি, সেই স্পর্ধার শক্তিটা কোথায় অবস্থিত? সে কি আমাদের নিজের গায়ের জোরে, না ইংরেজশাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! যখনই সেই ক্ষমাগুণের লেশমাত্র বৈলক্ষ্য্য দেখি, যখনই মানবধর্মবল্লভ স্পর্ধার বিক্ষুব্ধ ক্ষমতাপালীর আক্রোশ আইনের বেড়ার কোনো-একটা অংশ একটুমাত্র আলগা করিয়া কেলে,

অমনি আমরা বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি এবং তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করিয়া করিয়া দিই যে, পরের ধৈর্যের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমরা পরকে উৎকণ্ঠিত করিতেছিলাম। আমাদের স্পর্ধা যদি বার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপরপক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্দ আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিষ্টো-মর্গির মোহাই পাড়িতে ও আদালতের আবদার কাড়িতে ছুটিতাম না।

এ-কথা মানিতেই হয় যে, স্বভাবের নিয়মে স্পর্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে। যদি আমরা ইংরেজকে বলি, “তোমাকে জখ্ম করিবার জন্তই আমরা দেশের ভালো করিতেছি” এবং তার পরে ইংরেজ রক্তচক্ষু হইবামাত্র বলি, “বাং, আমরা দেশের ভালো করিতেছি, তোমরা রাগ করিতেছ কেন”, তবে গান্ধীধরক্ষা করা কঠিন হয়।

জখ্ম করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশের ভালো করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড়ো হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হয়। আমরা বয়কট করিয়াই দেশী কাপড় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ-কথা বলিবামাত্র দেশী কাপড় চালানো বিয়সংকুল হইয়া উঠে, সুতরাং জখ্ম করিবার সুখ ভোগ করিতে গিয়া ভালো করিবার সুখ গর্ব করিতে হয়। দেশী কাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ-কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার, তাহাকে মন্বৈশ পরাইয়া পোলিটিকাল আখড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্দেশ্যকে কেবল যে নিজের দেশের তাঁতির লোকসান বলিয়া দেবে, তাহা নয়, এই হারজিতির ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে কল হয় এই যে, নিজের দুর্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছা-পূর্বক বিপদের মুখে কেলিয়া দিই। আমাদের দেশে তো অন্তরে-বাহিরে, নিজের চরিত্রে ও পরের প্রতিকূলতায় বিস্তৃত ভ্রূরিকুরি আছে, তাহার পরে আশ্চর্যজনক করিয়া নূতন বিয়কে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আনিব, এতবড়ো অনাবস্তক শক্তিকরের উপযুক্ত সক্ষম যে আমাদের কোথায় আছে, তাহার সম্বন্ধ তো আমি জানি না।

বড়ো-বড়ো স্বাধীনজাতিকেও বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, শুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। স্বজাতির মঙ্গলসম্বন্ধে বাহাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহারা তেজস্বী হইলেও অনেক লাজলমর্দন বিনয়কণায় নিঃশেষে স্বীকার করে—ইংলও-

ফ্রান্স-জার্মানিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াও রাশিয়ার চক্রান্তে লড়াইয়ের ফল যখন ভোগ করিতে পারে নাই, তখন চূপ করিয়া ছিল—আজ রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়াও বন্ধুদের মধ্যস্থতার যখন রক্তপাতের পুরা মূল্য আদায় করিতে পারিল না, তখন হস্তমুখে বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইল। কেন? ইহার কারণ, অসহিষ্ণু হইয়া তেজ দেখাইতে যাওয়াই দুর্বলতা, দেশের মঙ্গলকে শিরোধার্য করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকাই যথার্থ বীরত্ব। যদি ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জাপানের পক্ষে এ-কথা সত্য হয়, যদি তাহারা ঐক্যতাপ্রকাশ করিয়া উন্নতির যাত্রাপথে স্বজাতির বোঝা বাড়াইয়া তুলিতে সর্বদাই কুষ্ঠিত হয়, তবে আমাদের এই অতিক্রম কর্মক্ষেত্রে কেবল কথায়-কথায় সশব্দে তাল ঠুকিয়া বেড়ানোই কি আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? যথাসাধ্য মৌন থাকিয়া, শুদ্ধ থাকিয়া আমাদের চলিবার পথের বিপুলকায় বিয়দৈত্যগুলিকে নিদ্রিত রাখাই কি আমাদের কর্তব্য হইবে না? অবশ্য, কারণ ঘটিলে ক্ষোভ অল্পভব না করিয়া থাকা যায় না—কিন্তু অসময়ে অকিঞ্চিৎকরভাবে সেই ক্ষোভের অপব্যয় করা না-করা আমাদের আয়ত্বাধীন হওয়া উচিত।

১২০৮ সালে (১৩১৪-১৫) মজঃফরপুরে বোমা-নিষ্ক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলা নিহত হইলে ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার হইলে রবীন্দ্রনাথ “পথ ও পাথের” প্রবন্ধ রচনা ও সভায় তাহা পাঠ করিয়া এ-বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে শ্রীমতী নির্বরিণী সরকারকে লিখিত এই পত্রগুলি উল্লেখযোগ্য :

মাত ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। বিধাতার এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। দেশের যে দুর্গতিদুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পালের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে-সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমতা ব্যক্তি না হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদের পক্ষে এই বেদনা দিলেন—কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারেনা—সহিষ্ণুতার

সহিত এ সমস্তই আমাদের কাছে বহন করিতে হইবে—এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের পথে পথ-সংক্ষেপ হয় বলিয়া আমরা ভ্রম করি সেইজন্যই অধৈর্য হইয়া আমরা সেইদিকে ধাবিত হই কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়াই সফলতাকে বিসর্জন দিই। আজ আমাদের পথ পূর্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল—এখন আবার আমাদের কাছে অনেক দুঃখ অনেক বাধা অনেক বিলম্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিয়া পুনরায় আমাদের যাত্রা করিতে হইবে—যত কষ্ট হউক, যত দুঃপথ হউক অবিচলিতচিত্তে যেন ধর্মেরই অনুসরণ করি। সমস্ত দুর্ঘটনা সমস্ত চিন্তাক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বর যেন আমাদের সেই শুভবুদ্ধি দান করেন। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩১৫

মাতৃ তুমি যে দুঃখ প্রেমের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্তব্য বোধ করি, তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি। উদার দৃষ্টি দ্বারা জগৎপারকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে থাকো—সমস্ত বিষয়বস্তু ও দুর্বিসহ দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ বাণিত চিত্ত সাধনা লাভ করুক এই আশীর্বাদ করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

...আমার প্রবন্ধ সভাস্থলে পড়া হয়ে গেছে। পুস্তিকা আকারে ছাপা হচ্ছে—তোমাকে দুই-একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্তেই কি দেশের জন্তেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য। কোনো উপস্থিত ক্রোধে, লোভে বা কোনো ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনার ধর্মকে খর্ব করতে গেলে কখনো মঙ্গল হতে পারে না। নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ না করে মরুভূমির পথে ঋণভারের মতো একাগ্রলক্ষ্যে তার দিকে দৃষ্টি রাখলে দুঃখ পাই আর বাই পাই, পথ হারিয়ে বিনাশের মধ্যে পড়তে হবে না। ইতি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দমননীতি অবলম্বিত হইলে রবীন্দ্রনাথ যে “স্বদেশী আন্দোলনে নিঃস্বার্থদের প্রতি নিবেদন” প্রকাশ করেন তাহাও এইখানে মুদ্রিত হইল :

বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজহত ও ধাংরাধিপকে

পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতের পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির কল্লণ করম্পর্শে তাহা বরমালা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের লগাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাহারা মহাত্মা গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা অগতঃসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অল্প কঠিনব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার অল্প বিধাতা-কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দে মাতরম্।

—ভাণ্ডার, কাল্কান, ১৩০২

১ এই কবিতাটি নৈবেদ্য হইতে সংকলিত হইয়াছিল, কাব্যগ্রন্থের অন্ত নূতন রচিত নহে; ইহা উৎসর্গের বস্ত্র সংস্করণে নাই, রচনাবলীতেও ইহা নৈবেদ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

২ এই নামের যে বস্ত্র গ্রন্থ আছে তাহা কাব্যগ্রন্থের এই বিভাগ হইতে পৃথক।

৩ বস্ত্র কথা ও কাহিনীর কাহিনী বিভাগের প্রবেশক রূপেও মুদ্রিত হইয়া থাকে, রবীন্দ্র-রচনাবলীও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না। বস্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

৪ বস্ত্র কথা ও কাহিনীর কথা বিভাগের প্রবেশকরূপেও মুদ্রিত হইয়া থাকে; রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না। বস্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

৫ এই কবিতাটি বস্ত্র সংস্করণ নৈবেদ্যে সর্বদা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে; রচনাবলীতে সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বস্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় না, রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গেও মুদ্রিত হইল না।

৬ এই কবিতাটি বস্ত্র সংস্করণ শিশুতে মুদ্রিত হইয়া থাকে, রচনাবলীতেও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বস্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় না, রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গেও মুদ্রিত হইল না।

৭ ইহা কথা ও কাহিনী ও উৎসর্গ উভয়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ইহা কথা ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না।

বস্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত তিনটি কবিতা রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে বাহু ধেল : "কত কী যে আসে;" "কথা কও কথা কও;" "দিবেছিল রাজকৃত্য।"

৮ পূর্ববীর (প্রথম সংস্করণ, ১৯৩২) “সন্ধিতা” অংশে সংকলিত হইয়াছিল ; পূর্ববীতে এই “সন্ধিতা” অংশ এখন আর মুদ্রিত হয় না।

৯ কাব্যগ্রন্থের অংশ, ও বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত, সংকলন ও স্বদেশে মুদ্রিত। সংকলন ও স্বদেশের অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংকলিত বলিয়া এগুলি রচনাবলীতে সংকলন ও স্বদেশ নামে মুদ্রিত হইবে না।

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক সমীপে। সম্মিলন নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্যগ্রন্থে আমার ‘নিখরিলী’ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। ছাত্রেরা অনেক জানাচ্ছেন মানে বোকা সেল না। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পক্ষে বোঝাতে গেলেন অপরাধের চেয়ে শাস্তি বড়ো হয় ওঠে—অভিভাবের কয়েকটা মতো শেষ মেয়াদ সম্বন্ধেও অনিশ্চিত থাকতে হয়। একজন আনন্দবাজার পত্রিকার বক্তব্যটি পাঠানো গেল, অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করে আমার দায় লাঘব করবেন। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৪০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে পঠিত ; ত্রুটি রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

১২ ভারতবর্ষ গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত ; রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে ভারতবর্ষে প্রথমটি মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রজা গ্রন্থে আর মুদ্রিত হইল না।

১৩ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৪ আত্মশক্তি গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত ; রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে আত্মশক্তিতে প্রথমটি মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া সমূহ গ্রন্থে আর মুদ্রিত হইল না।

১৫ রবীন্দ্রনাথের প্রচাপদ বন্ধু রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে নির্দিষ্ট “পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দিষ্ট” করিয়াও “সেই পথেও কিনা বাধায় চলিতে পাইব কিনা” তাহা আলোচনা করেন, এবং এসময়ক্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তাহার প্রবন্ধের উপক্রমণিকা এইরূপ :

“দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা প্রায়বিক অবস্থানে, কতকটা ইংরেজের অকুটমর্গনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদেরকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।

“আজ যিনি আমাদেরকে আশ্বাসনে কাস্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাহারই কৃতিত্ব মেলিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট ‘আবেদন নিবেদন’ করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই হারী লাভ হইবে না, ইংরেজের সুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই হারী লাভ, বঙ্গবিশ্বাসের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাহার কঠোর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহূর্ত্তে ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল।...

“বঙ্গেশ্বর আগুন ধরান হুগলি উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাজান দিতে ফ্রুট করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হুগলি হুগলি তাহার এক একটা নূতন

গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের প্রায়ত্তর কাপিয়া আর দাচিয়া উঠিত। বিফল ও অনাবৃত্তক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে-সময়টার যে উত্তেজনা ও উদ্বোধনা ঘটাইয়াছিল, তাহার অন্তরীক্ষনাধেয় কৃত্তির নিষ্ঠান্ড অঙ্গ ছিল না।

“উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অসুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনবন্ত্র অচল করি। বিব বলিয়া লাকালাকি করিয়া আসিতেছি; এবং ইংরেজরাজা যখন সেই লাকালাকিতে ঐখ্যলট হইয়া লণ্ড তুলিয়া আমাদের দলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অবাধ্যবিক আন্দোলনের বিফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও-পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি-লাকালাকির কর্ম নহে, দীরবে দীরভাবে কাজ করিতে হইবে।...”

“রবিবাসু কেবল “কাজ করো” “কাজ করো” বলিয়া উপদেশ দিয়া চাৎকারের দ্বারা হাড়াইতেছেন না বরং কোন্ পথে কাজ করা বাইতে পারে, তাহার দুই-একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।”...

১৬ দ্বারাট কনগ্রেসে বিসংবাদে পরে লিখিত।

১৭ তুলনার, “বন্দোব সমাজ” প্রবন্ধে “সমাজপতি” নিরোধের প্রস্তাব, রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড

১৮ পৃ. ৪২২, ২০ম ছত্রের পর

১৯ পৃ. ৪২৩, ২৫ম ছত্রের পর

২০ পৃ. ৪২৬, ২য় ছত্রের পর

২১ পৃ. ৪৮৭, ১২ম ছত্রের পর

সংযোজন : অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড

মেঘনাদবধ কাব্যের যে-সমালোচনাটি অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে সমালোচনা গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রে (১২৮৪) মেঘনাদবধ কাব্যের একটি সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুইটি আলোচনার একটিও মেঘনাদবধ কাব্যের অসুফল নহে। গ্রন্থপরিচয়ে জীবনমুখি হইতে উদ্ধৃত অংশ মেঘনাদবধ সঘকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলোচনাটির বিষয়েই বিশেষ ভাবে লিখিত হইলেও, মেঘনাদবধের প্রতি পূর্বতন বিরূপতা সঘকে পরে রবীন্দ্রনাথ-এক সত পোষণ করিতেন, তাহারই নিদর্শনস্বরূপে সেটি উদ্ধৃত হইয়াছিল, বস্তুত ঐ উদ্ধৃতি-ভাষ্যের বস্তুত্ব দুইটি লেখা সঘকেই প্রযোজ্য।

কিন্তু ১২৮৪ সালে প্রকাশিত লেখাটি অধিকতর আলোচিত বলিয়া, বস্তুত উল্লেখ না থাকিলে পাঠকগণ সমালোচনার মুদ্রিত লেখাটির সহিত সেটিকে ভুল করিতে পারেন; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে যে অনুবাদ-চর্চা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিপূরক গ্রন্থ *Selected Passages for Bengali Translation* মূল ইংরেজি বাক্যসমষ্টির সংকলন; ছাত্রেরা প্রথমে সেইগুলির বাংলা অনুবাদ করিবে ও অনুবাদ-চর্চার আদর্শ-বাংলার সহিত মিলাইয়া নিজেদের অনুবাদ যাচাই করিবে, এবং সেই বাংলায় ইংরেজি অনুবাদ করিয়া *Selected Passages*-এর ইংরেজি বাক্যাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিবে—এই বই দুইটির ব্যবহার-রীতি এইরূপ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে	...	৮৭
অত চুপি চুপি কেন কণা কণ	...	৭১
অনাবশ্যক	...	১১০
অনাহত	...	১১৫
অনুমান	...	১৭৬
অঙ্ককারের মাঝে আমার ধরেছ দুই হাতে	...	২৬২
অপমানের প্রতিকার	...	৪১০
অপর পক্ষের কথা	...	৫৮৩
অব্যাহত	...	১২০
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে	...	১৬২
আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই	...	৩০
আগমন	...	১০৩
আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী	...	৩৮
আজ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে	...	১৪৭
আজ বিকালে কোকিল ডাকে	...	১৫৮
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে	...	১৪৪
আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে	...	২৪
আজি কমলমুকুলদল খুলিল	...	২১৭
আজিকে গহন কালিমা লোগেছে	...	৪৬
আজি দ্বিধা দুয়ার গোলা	...	২০৩
আজি বসন্ত আগ্রহ হারে	...	২৬০
আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমালয়	...	৪২
আদি অস্ত হারিয়ে ফেলে	...	১২৬
আনিলাম অপরিচিতের নাম	...	২৭২
আপনারে ভূমি করিবে গোপন	...	১৩
আমরা বাব বেখানে কোনো	...	৩২৭

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই	২০৬
আমাদের এই পলিখানি পাছাড দিয়ে ঘেরা	৬৯
আমায় অমনি খুশি করে রাখে।	১৭৯
আমার এ গান শুনবে তুমি যদি	১৬৬
আমার খোলা জানালাতে	৫৫
আমার গোখুলি-লগন এল বুঝি কাছে	১২৩
আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন তাধিন	২২৯
আমার নাই বা হল পারের যাওয়া	১০১
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে	২০৯
আমার মাঝারে যে আছে	১৯
আমার সকল নিয়ে বসে আছি	২২৯
আমি এগন সময় করেছি	১৬৪
আমি কেবল তোমার দাসী	২৪৪
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার	১৪১
আমি চকল হে	১৭
আমি তোমার প্রেমে হব সবার	২৪০
আমি বিকাব না কিছুতে আর	১৮৪
আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম	১৬০
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গায়ে	৫১
আমি রূপে তোমায় ভালোব না	২৩৬
আমি শরৎশেষের মেঘের মতো	১২৫
আলটো কনসার্ভেটিভ	৫৮৭
আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়	৫৭
আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে	৬৫
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা	২২৮
ইংরেজ ও ভারতবাসী	৩৭৯
ইংরেজের আতঙ্ক	৫৩৭
ইম্পীরিয়লিজম	৪৩১
উৎসর্গ, খেয়া	৯৫
এ অঙ্ককার ডুবাও তোমার	২৫১

এক রজনীর বরবনে শুধু	১০৮
এ কী রহস্য এ কী আনন্দরাশি	৩২৮
এ যে মোর আবরণ	১২৭
ঐ তোমার ঐ বাঁধিখানি	১১৭
ওগো এমন সোনার মায়াখানি	১৭৭
ওগো তোরা বল তো, এরে	১২০
ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি	১০৭
ওগো বর, ওগো বধু	১১২
ওগো মা, রাজার ঢুলাল গেল চলি মোর	১০২
ওগো মা, রাজার ঢুলাল যাবে আজি মোর	১০১
ওরা চলেছে দিঘির ধারে	২৮
ওরে আমার কর্মহারী	৫২
ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেরসী	৮৬
কণ্ঠরোধ	৪২৭
কত দিবা কত বিভাবরী	৮২
কত দৈর্ঘ্য ধরি	৩৪২
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বহুসভাতলে	৮৪
কালের যাত্রার ধনি শুনিতে কি পাও	৩৭২
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে	১১৩
কৌ কথা বলিব বলে	৮১
কুঁড়ির ভিতরে কান্দিছে গন্ধ	১৮
কুয়ার ধারে	১৩২
কুলগ	১৩০
কুকপক্ষে আধখানা চাঁদ	১৩৮
কেবল তব মুখের পানে	১০
কোকিল	১৫৮
কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি	১৭৪
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে	২০১
ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে	৪২
খেয়া	১৮৬

খোলো খোলো ঘাব	১৩৬
গান শোনা	১৩৬
গোধূলিলয়	১২৩
ঘাটে	১০১
ঘাটের পথ	২৮
ঘূষাঘূষি	৬০৫
চাঞ্চল্য	১৭২
চিরকাল এ কাঁ নীলা গো	৫৮
চুমিয়া যেয়ো তুমি	৩৩২
ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে	৩৩৪
জাগরণ	১৩৪
জাগরণ	১৬৮
জুড়াল রে দিনের দাহ	১৬০
ঝড়	১৬২
ঝরনা তোমার স্বটিক জলের	৩১৫
টিকা	১৭৭
তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে	১২৭
তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা	১৮৩
তখন রাত্রি আধার হল	১০৩
তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ	১৪৮
তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব	৩৭১
তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসংকিত	৪৩
তুমি এপার-ওপার কর কে গো	১৮৬
তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার	১৪৫
তোমায় চিনি বলে আমি	১৪
তোমার কাছে চাই নি কিছু	১৩২
তোমার বীণায় কত তার কাছে	৩৩
তোমার বীণার সাথে আমি	১৪২
তোমাতে ছাড়িয়া যেতে হবে	৩৪৬
তোমাতে দিই নি স্থখ	৩০৬

তোমারে পাছে সহজে বুঝি	১২
তোরা কেউ পারবি নে গো	১৩৫
তোরা যে যা বলিস ভাই	২১৩
ত্যাগ	১০২
দাড়িয়ে আছ আধেক খোলা	১১৫
দাম	১১০
দিঘি	১৬০
দিনশেষ	১৫৬
দিনের শেষে ঘুমের দেশে	২৭
দিয়েছ প্রাণের মোরে, করুণানিলয়	৮৫
দুঃখমুর্তি	১০৬
দুঃখের বেশে এসেছ বলে	১০৬
দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে	৩৫
দেপো চেয়ে গিরির শিরে	৪৮
দেশনায়ক	৪৮৭
দেশহিত	৬৩২
দেশের কথা	৬১২
ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে	৩৩
নব বৎসরে করিলাম পণ	২০
না জানি কারে দেখিয়াছি	২২
নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়	৮৫
নিরুদ্ভম	১২৭
নিশ্বাস রুধে দু-চক্ষু মুদে	১৭২
নীড় ও আকাশ	১৫৩
নীড়ে বসে গেয়েছিলেন	১৫৩
পথ ও পাথের	৪৪৫
পথ চেয়ে তো কাটল নিশি	১৩৪
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রামি	২৮৭
পথিক	১৩২
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি	১৩২

পথের নেশা আমার লেগেছিল	১৫১
পথের পথিক করেছ আমার	৩৪
পথের শেষ	১৫১
পাগল হইয়া বনে বনে কিরি	১৬
পাছে বেশি ছুমি আস নি, তাই	১৭৬
পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে	২৩০
পূর্ণ প্রাণে চাবার ঘাঘা	৩২৬
প্রচ্ছন্ন	১৭৪
প্রতীক্ষা	১৬৪
প্রভাতে	১০৮
প্রসঙ্গ-কথা ১-৫	...	৫৫২, ৫৫৫, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৭২	
প্রার্থনা	১৮৪
ফুল কোটানো	১৩৫
বঙ্গবিভাগ	৬১০
বন্দী	১৩৮
বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে	১৩৮
বন্ধ হয়ে এল শ্রোতের ধারা	১৫৭
বন্ধু, এ যে আমার সজ্জাবতী সত্য	২৫
বর্ষাপ্রভাত	১৭৭
বর্ষাসন্ধ্যা	১৭২
বসন্তে কি শুধু কেবল	২২২
বহুস্বাক্ষরতা	৪৪২
বাঁশি	১১৭
বালিকা বধু	১১২
বাহির হইতে দেখো না এমন করে	৩৬
বিকাশ	১৪৪
বিচ্ছেদ	১৪২
বিদায়	১৫০
বিদায় দেহ ক্ষম আমার ভাই	১১০
বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন	১৭১

বিরহ-বৎসর পরে মিলনের বীণা	৮৬
বিরহ মধুর হল আজি	২২৪
বিরোধমূলক আদর্শ	৫২২
বৈশাখে	১৪৮
ব্যাধি ও প্রতিকার	৬২৩
ভয়েই মোর আঘাত করে।	২৩৮
ভাঙা অতিথিশালা	১৫৬
ভার	১৪৫
ভারতসমুদ্র তার বাশ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বাসে গগনে	৪৪
ভারতের কোন্ বুদ্ধি স্ববির তরুণ মূর্তি তুমি	৪৫
ভেবেছিলাম চেয়ে নেব	১১০
ভোর হল বিভাবরী	২৬৩
ভোরের পাপি ডাকে কোথায়	৭
মস্ত্রে সে যে পূত	৬২
মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে	২২০
মিছে কথার বাধুনি	৪৮৮
মিলন	১৪১
মুক্তিপাশ	১০৭
মুখুজ্যো বনাম বাঁজুজ্যো	৫৭৬
মেঘ	১২৬
মোদের কিছু নাই রে নাই	২১৮
মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে	১৩৭
মোর কিছু খন আছে সংসারে	১১
যজ্ঞভঙ্গ	৬৩৫
যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী	৪৭
যা ছিল কালো ধলো	২২৭
যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা	২০৫
রাজকুটুম্ব	৫২২
রাজনীতির বিধা	৪০৪
রাজভক্তি	৪৩৫

রাজা ও প্রজা	৫৪২
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	৫৩৭
রে অচেনা, মোর মুষ্টি	৩০৫
রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিহু জাগি	৮৪
লীলা	১২৫
স্বভক্ষণ	১০১
শূন্ত ছিল যন	৩৮
শেষ বেয়া	৩৭
সকালবেলায় ঘাটে যেদিন	১৫৪
সদুপায়	৫২২
সব ঠাই মোর ঘর আছে	২৬
“সব-পেয়েছি”র দেশ	১৮১
সব-পেয়েছির দেশে কারো	১৮১
সভাপতির অভিভাষণ	৭২৬
সমস্তা	৪৬৮
সমাপ্তি	১৫৭
সমুদ্রে	১৫৪
সাক্ষ হয়েছে রণ	৬৭
সার লেপেল গ্রিফিন	৫৩৫
সার্থক নৈরাশ্র	১৮৩
সীমা	১৪৪
সুন্দর ভূমি চক্ষু ভরিয়া	৩৩৭
সুন্দরী ভূমি গুণতারা	৩৩২
সুবিচারের অধিকার	৪১৮
সেটুকু তোর অনেক আছে	১৪৪
সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে	৭৪
সেদিন কি ভূমি এসেছিলে, গুণা	৩০
হার গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা	২৩
হার	১৩৭
হারাধন	১৭১

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৬৭৫

হে জনসমূহ, আমি ভাবিতেছি মনে	৮৭
হে নিতরু গিরিরাজ, অশ্রুভেদী তোমার সংগীত	৮১
হে পথিক কোন্‌খানে	৭২
হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি	৩১
হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে	৮৮
হে রাজন, তুমি আমারে	৩৪
হে হিমালি, দেবতাবা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার	৪৩
